দি ডুমস ডে কনসপিরেসি

সিডনি সেলডন

BENGALIEBOOK.COM
বেঙ্গলিইবুক.কম
bengaliebook.com
★2022★

সূচিপত্র

গল্প শুরুর আগে..........2

তিন নম্বর দিন..........70

জুরিখের রাস্তাঘাট..........149

গ্রাম্য রমণীর মতো..........217

রবার্ট বেলামির মুখটা..........329

রবার্টের জীবন..........406

গল্প শুরুর আগে

কমান্ডার রবার্ট বেলামি মার্কিন দেশের গোয়েন্দা সংস্থার এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তাঁকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে পাঠানো হয়েছে। সুইজারল্যান্ডে একটি আবহাওয়া বেলুন ধ্বংস হয়ে গেছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্য ছিল। বেলামির দায়িত্ব হল দশজন প্রত্যক্ষদর্শীকে খুঁজে বের করা, তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, তারা যাতে সব বিবরণ গোপনীয়তার মধ্যে জানাতে পারে, তা দেখা।

এই অনুসন্ধান করতে গিয়ে বেলামির একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাকেও চক্রান্তের শিকার হতে হচ্ছে। একটা অনিয়ন্ত্রিত শক্তি তার ওপর কঠিন কঠোর নজর রেখেছে। এই বেলুন ধ্বংস হওয়াটা মারাত্মক ষড়যন্ত্রের অংশবিশেষ, যে ষড়যন্ত্রটা অবিশ্বাস্য এবং ভয়ঙ্কর।

ওয়াশিংটন থেকে জুরিখ, রোম থেকে প্যারিস, এই গল্প বেলামির জীবনের অতীতকে প্রকাশ করেছে। যে রমণীকে তিনি ভালোবাসতেন, সেই রমণী কেন ভালোবাসার প্রতিদান দিতে পারেননি? বন্ধুরা কেন তার ভয়ঙ্কর শত্রুতে পরিণত হয়েছেন? শুধু তাই নয়, সুইজারল্যান্ডের আল্পস পাহাড় চূড়ায় সত্যি সত্যি কী ঘটনা ঘটেছিল, বেচারী রবার্ট বেলামি তা কোনোদিন জানতেই পারবেন না।

জীবন কাটাও উত্তেজনাকর মুহূর্তের মধ্যে একটি প্রাচীন চিনা প্রবাদ।

অবতরণিকা

উটেনডরফ সুইজারল্যান্ড, রোববার, ১৪ই অক্টোবর, তিনটে বেজে পঞ্চাশ মিনিট। এখানে বিরাজ করছে ভয়ঙ্কর নীরবতা। কথা বলা যাচ্ছে না। দুঃস্বপ্নের আভাস। প্রত্যেক প্রত্যক্ষদর্শীর মনে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া। একজন অজ্ঞান হয়ে গেছে, একজন বমি করছে, এক ভদ্রমহিলা কাঁপছে। অন্য একজন ভাবছে, আমার বোধহয় হার্ট অ্যাটাক হবে। বয়স্ক ধর্মযাজক মালা জপছেন। বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকছেন। পিতা-পিতা, আমাকে রক্ষা করুন। সকলকে রক্ষা করুন। এই ভয়ঙ্কর ঘটনার হাত থেকে। আমরা শেষ পর্যন্ত শয়তানকে দেখতে পেয়েছি। পৃথিবীর শেষের সেদিন ঘনিয়ে এসেছে। বিচারের দিন।

.

আমরা সেডন এভানে, রোরবার, ১৪ অক্টোবর, রাত নটা।

.

একটা খবর এসেছে, অত্যন্ত গোপনীয়। এন এস থেকে পাঠানো হয়েছে কমসেকের ডেপুটি ডাইরেক্টরের কাছে। কী বিষয়ে? অপারেশন ডুমস ডে।

রোববার, অক্টোবর ১৪, নটা বেজে পনেরো মিনিট। একটা ফ্ল্যাশ মেসেজ, বলা হয়েছে চরম গোপনীয়। এন এস-র কাছ কাছ থেকে ডেপুটি ডিরেক্টর। লেখা আছে নেভাল ইনটেলিজেন্স, ১৭ ডিস্ট্রিক্ট, বিষয় কমান্ডার রবার্ট বেলামি।

এখনই কাজ শুরু করতে হবে।

সংবাদটা শেষ হয়ে গেছে।

.

প্রথম পর্ব

শিকার

০১.

সোমবার, ১৫ই অক্টোবর

.

হাসপাতালটা লোকে পরিপূর্ণ। ভিয়েতনাম। সুশান বিছানাতে ঝুঁকেছেন। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। সাদা নার্সের পোশাক। বলছেন- ঘুম ভাঙুক নাবিক, আমি আপনাকে মরতে দেব না।

সুশানের কণ্ঠস্বর, নাবিক যন্ত্রণা ভুলে গেছেন। টেলিফোনের শব্দ। রবার্ট বেলামি জেগে উঠেছেন। ঘুমটা ভাঙাতে চাইছেন না। সকাল চারটে। টেলিফোন ধরছেন– এখন কি ডাকার সময়?

-কমান্ডার বেলামি?

পুরুষ কণ্ঠ।

-হ্যাঁ।

–আপনার জন্য একটা জরুরি খবর আছে। আপনি এক্ষুনি ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির হেড কোয়াটারে চলে যান। জেনারেল হিলিয়াড আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। ঠিক ছটার সময়।

কমান্ডার রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। অবাক হলেন। কী ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছেন না।

সুশান আগের সন্ধ্যাবেলা ফোন করেছিলেন রবার্ট?

সুশানের কণ্ঠস্বর- হ্যালো সুশান।

তুমি ভালো আছে তো, রবার্ট?

দারুণ আছি।

তারপর? এখন বেলামিকে তৈরি হতেই হবে। সময় দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, সুশানের কথা মনে পড়ছে কেন?

তিনি বিছানা থেকে উঠলেন। লিভিংরুমের দিকে চলে গেলেন। খালি পায়ে। সুশান নেই, কেমন অগোছালো পরিবেশ। সুশানের ছবি চারদিকে ছড়ানো আছে। স্মৃতির অনুবর্তন-

তারা স্কটল্যান্ডে গিয়ে মাছ ধরছেন। থাইল্যান্ডের একটি বুদ্ধ মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। রোমে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রত্যেকটা ছবি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

উনি কিচেনে গেলেন, কফি তৈরি করলেন। ভোর চারটে বেজে পনেরো মিনিট, কিচেন ক্লকঘোষণা করছে। একটি নাম্বারে ফোন করলেন। কণ্ঠস্বর শোনা গেল।–অ্যাডমিরাল হুইট্যাকার?

-হ্যালো?

—অ্যাডমিরাল?

ইয়েস।

-আপনার ঘুম ভাঙানোর জন্য দুঃখিত স্যার। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির কাছ থেকে একটা ফোন এসেছে।

-কেন?

–আমি জানি না, ছটার মধ্যে জেনারেল হিলিয়াডের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

–তোমাকে বোধহয় ট্রান্সফার করা হবে।

–কিছুই বুঝতে পারছি না।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার রবার্ট, তুমি মিটিং-এর পর আমাকে ফোন করো, কেমন?

নিশ্চয়ই করব, স্যার।

কানেকশনটা কেটে গেল। রবার্ট ভাবলেন, এই বৃদ্ধ লোককে চিন্তা করিয়ে কী লাভ? উনি নেভাল ইনটেলিজেন্সের প্রধান ছিলেন, দু-বছর আগে। ওনাকে জোর করে অবসর দেওয়া হয়েছে। একটা গুজব আছে, নেভি তাকে বাজে জায়গায় ফেলে দিয়েছিল। উনি যেতে রাজী হননি।

কফির কাপটা বাথরুমে ঢেলে দিলেন তিনি। আয়নায় নিজের ছবি দেখলেন। বছর চল্লিশ বয়স হয়েছে। সুঠাম চেহারা, পাতলা শরীর চোখে মুখে আভিজাত্য। ঘন কালো চুল। কালো চোখ। বুকে একটা দাগ আছে। একবার বিমান দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন, তারই স্মৃতিচিহ্ন।

সুশান? সেটা তো অতীত। এখন বর্তমান। উনি চান করলেন, দাড়ি কামালেন। ক্লোসেট থেকে পোশাক বার করলেন। তারপর? নতুন অভিযান।

.

০২.

ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি, বিশাল জায়গা জুড়ে অবস্থিত। সি আই এ-র অফিসের থেকেও দ্বিগুণ।

তখনও অন্ধকার, কমান্ডার বেলামি প্রথম গেটে ঢুকলেন।

রিসেপশনিস্ট এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল আপনাকে কীভাবে সাহায্য করব?

–আমি কমান্ডার বেলামি। জেনারেল হিলিয়াডের সঙ্গে দেখা করব।

–আপনার পরিচয়পত্র দেখাবেন কি?

রবার্ট বেলামি ওয়ালেট বার করলেন। আই ডি কার্ডটা তুলে নিলেন।

ধন্যবাদ, কমান্ডার।

এবার এগিয়ে যাওয়ার পালা।

এক মিনিট কেটে গেছে। রবার্ট বেলামি একটা বৈদ্যুতিক গেটের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সশস্ত্র প্রহরী এগিয়ে এল কমান্ডার বেলামি?

-হ্যাঁ।

আপনার পরিচয়পত্র?

একই ঘটনা। এটা কি চিড়িয়াখানা নাকি? ওনাকে ওয়ালেট খুলতে হল। কী আর করা যাবে।

আর এক ইউনিফর্ম পরা সশস্ত্র প্রহরী এগিয়ে এসেছে। বেলামি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারছেন না। সে গাড়ির লাইসেন্স প্লেটের দিকে তাকাল। তারপর বলল- আপনি সোজা এগিয়ে যান। সামনেই প্রশাসক ভবন। সেখানে কেউ একজন থাকবেন।

দরজাটা খুলে গেল। রবার্ট গাড়িটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন। বিরাট সাদা বাড়ি। সাধারণ পোশাক পরা এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন।

অক্টোবরের ঠাণ্ডা তাঁকে কাঁপিয়ে দি

য়েছে। –এখানে আপনার গাড়িটা রাখতে হবে, কমান্ডার। আমরা এর দেখাশোনা করব।

রবার্ট বেলামি গাড়িটা রাখলেন।

–আমি হ্যারিসন কেলার। আমি আপনাকে জেনারেল হিলিয়াডের অফিস পর্যন্ত নিয়ে যাব।

ওঁরা পাশাপাশি হেঁটে চলেছেন। কমান্ডার বেলামি?

ক্যামেরার শব্দ। ধন্যবাদ।

রবার্ট কেলারের দিকে তাকলেন– কী?

মাত্র এক মিনিট সময় লাগবে। এক মিনিট কেটে গেছে। রবার্ট বেলামির হাতে একটা পরিচয়পত্র তুলে দেওয়া হল। এর ওপর ছবি লাগানো আছে।

–এটা সবসময় পরে ঘুরবেন।

–ঠিক আছে।

বিরাট করিডর। বেলামি বুঝতে পারছেন, অনেকগুলো সিকিউরিটি ক্যামেরা তাক করা আছে হলের দুপাশে।

–কত বড়ো এই বাড়িটা?

–কুড়ি লক্ষ স্কোয়ার ফুট, কমান্ডার।

–কী বলছেন?

-হ্যাঁ, এটা হল পৃথিবীর সবথেকে লম্বা করিডর। ৯৮০ ফুট। এখানে শপিং সেন্টার আছে, কাফেটেরিয়া, পোস্টাফিস, স্ন্যাক্স বার, হাসপাতাল, দাঁতের ডাক্তারের চেম্বার, স্টেট ব্যাঙ্কের অফিস, ড্রাই ক্লিন শপ, জুতোর দোকান, নাপিতের দোকান। আরও কত কি?

তার মানে? বাড়ির বাইরে একটা বাড়ি, তাই তো? রবার্ট ভাবলেন।

কত জন কাজ করেন?

–অন্তত ষোলো হাজার।

রবার্ট কেলারের মনে হল, এখানে আমার কী দরকার?

অবশেষে দুজনের দেখা হল।

মনে হচ্ছে, এটা বোধহয় চায়ের আসরে নেমতন্ন। দুজনে হাতে হাত দিলেন।

বসুন, এক কাপ কফি খেতে খেতে কথা বলব।

ইয়েস, স্যার।

–হ্যারিসন?

ধন্যবাদ।

বাজারে শব্দ হল।

দরজাটা খুলে গেল। ট্রে-তে করে কফি। ড্যানসি পেস্ট্রি। রবার্টের বুকে প্রতীক চিহ্নটি নেই। কফি ঢালা হয়েছে। অসাধারণ গন্ধ।

জেনারেল জানতে চাইলেন- আপনি কী খাবেন?

ব্ল্যাক কফিটা দারুণ

–ডিরেক্টর বলেছেন, আমি যেন আপনার সঙ্গে দেখা করি।

–ডিরেক্টর? এডওয়ার্ড হ্যাঁন্ডারসন? বাইরের জগতের এক মহানায়ক। হৃদয়হীন বলা হয় তাকে। জনগণের সামনে কখনও দেখা যায় না।

–আপনি কতদিন নেভাল ইনটেলিজেন্স গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত আছেন?

রবার্ট বললেন- পনেরো বছর।

তার আগে আপনি ভিয়েতনামের এয়ার স্কোয়াড্রন ছিলেন। কী তাই তো?

–হ্যাঁ, স্যার।

–সেখানে আপনি কী করেছেন?

ডাক্তারের কথা মনে পড়ল হ্যাঁ, বিপদের হাত থেকে বেঁচে গেছেন রবার্ট। সুশানের কথাও মনে পড়ল। চোখ খোলো। আমি তোমাকে মরতে দেব না। আহা, কী সুন্দর মুখখানা, ঘন কালো চুল। বাদামী চোখের তারা। ঈশ্বরের আশীবাদের মতো হাসি। রবার্ট কথা বলার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু বলতে পারেননি।

জেনারেল হিলিয়াড কিছু বলার চেষ্টা করছেন।

রবার্ট অতীতে হারিয়ে গিয়েছিলেন। এবার ফিরে এলেন বর্তমানে।

আমাদের একটা সমস্যা হয়েছে, কমান্ডার আপনার সাহায্য চাইছি। ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়। গতকাল সুইজ আলপসে আমাদের একটা বেলুন ধ্বংস হয়ে গেছে। এর মধ্যে

গুরুত্বপূর্ণ কিছু সামরিক বস্তু ছিল। বুঝতেই পারছেন, ব্যাপারটার মধ্যে কতখানি গুরুত্ব লুকিয়ে আছে।

রবার্ট ভাবতেই পারছেন না, কেন তাকে ডেকে এসব কথা বলা হচ্ছে।

-সুইস সরকার ওই বেলুন থেকে জিনিসগুলো সরিয়ে নিয়েছে। মনে হচ্ছে, দুর্ঘটনার কোনো প্রত্যক্ষদর্শী আছে। এটা খুব উল্লেখযোগ্য। তারা কী রেখেছেন, সেটা জানতে হবে। আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারছেন।

-হ্যাঁ, আমি ওদের সাথে কথা বলব। ওদের পেট থেকে কথা বার করতে হবে। তাই তো?

–ঠিক তা নয়, ওদের সাথে যোগাযোগ করুন।

–ওরা সকলেই কি সুইজারল্যান্ডের বাসিন্দা।

না, আমরা ঠিক জানি না। ওঁরা কোথা থেকে এসেছেন। অথবা ওঁরা আসলে কে? ওঁদের একটি মাত্র খবর আমাদের হাতে আছে। তা হল, ওঁরা সকলেই টুরিস্ট। তারা ওই অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছিলেন। পাশেই একটা গ্রাম, সেখানে বেলুনটা ধ্বংস হয়।

উনি হ্যারিসন কেলারের দিকে তাকালেন- উটেনডরফ।

জেনারেল আবার রবার্টের দিকে তাকালেন, ভ্রমণার্থীরা বাস থেকে নেমে পড়েছিলেন। তারা ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর তারা যে যার জায়গায় ফিরে গেছেন।

-জেনারেল হিলিয়াড, তাদের কোনো রেকর্ড নেই, তাহলে কীভাবে বের করব?

–আপনি ঠিকই ধরেছেন। আপনাকে আরও তৎপর হতে হবে আমি জানি, আপনার পটভূমি চমৎকার। আপনাকে এন এস-তে ট্রান্সফার করা হল।

–আমি ভাবছিলাম, সুইজ সরকারের সঙ্গে কাজ করব।

না, আপনাকে একাই করতে হবে। আমি অন্য কাউকে এই ব্যাপারে জড়াতে চাইছি না। ব্যাপারটার গুরুত্ব আছে বলে বুঝতে পারছেন।

জেনারেল একটি চিরকুট লিখে রবার্টের হাতে দিয়ে বললেন- যখনই প্রয়োজন হবে এখানে এসে যোগাযোগ করবেন, আপনার জন্য একটা প্লেন অপেক্ষা করছে। ওই প্লেন আপনাকে জুরিখে নিয়ে যাবে। এখন থেকে আপনার ওপর নিরাপত্তা থাকবে। আপনাকে আমাদের লোক অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যাবে। যা দরকার, সঙ্গে সঙ্গে প্যাক করুন। এখনই এয়ারপোর্টে চলে যান।

–ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করে দেখছি।

তারপর? কেলারের হাতে ফাইল ক্যাবিনেট। উনি একটা মস্ত বড়ো ম্যানিলা এনভেলপ রবার্টের হাতে তুলে দিলেন।

বিভিন্ন ইউরোপিয়ান মুদ্রায় ৫০ হাজার ডলার আছে। এছাড়া আর ২০ হাজার ইউ এস ডলার দেওয়া হল। আপনাকে আরও কিছু স্মারকপত্র দেওয়া হবে, লুকিয়ে থাকার আদর্শ মুখোশ।

জেনারেল হিলিয়াডের মুখে শয়তানি হাসির টুকরো। একটা ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হল।

-ওটা হয়তো লাগবে না। জেনারেল যে পরিমাণ ক্যাশ দিয়েছেন, তাতে যথেষ্ট হবে। আমার হাতে একটা ক্রেডিট কার্ড আছে।

সেটাও নিতে হবে।

–ঠিক আছে, রবার্ট কার্ডটা পরীক্ষা করলেন। এমন একটা ব্যাঙ্কের নাম লেখা আছে, যার নাম রবার্ট কখনও শোনেননি।

এটা ব্ল্যাঙ্ক চেক-এর সমান। এর জন্য কোনো তথ্য বা নথির দরকার হয় না। এই কার্ডের ওপর যে টেলিফোন নম্বর দেওয়া আছে সেটা করলেই হবে। সব সময় কার্ডটা রাখবেন। ওই প্রত্যক্ষদর্শীদের খুঁজে বের করতেই হবে– সকলকে। এখন থেকেই কাজটা শুরু হল।

মিটিং শেষ হয়ে গেছে। হ্যারিসন কেলার রবার্টকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

ইনি ক্যাপটেন ডগারথি, উনি আপনাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবেন। ওঁরা হাতে হাত দিলেন।

কমান্ডার, আপনি তৈরি? ক্যাপটেন ডগারথি জানতে চাইলেন।

কীসের জন্য তৈরি? রবার্ট ভাবলেন। তিনি আবার বললেন আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আপনি সোজা অ্যাপার্টমেন্টে যাবেন, সেখান থেকে অ্যানড্রুজ এয়ারফোর্স বেসে। ওখানে একটা প্লেন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

রবার্ট বললেন- আমি প্রথমে আমার অফিসে যাব।

-ঠিক আছে, আমি সেখানে আপনার সঙ্গে যাব। গাড়িতে অপেক্ষা করব।

তার মানে? রবার্টকে এখন চোখের আড়াল করা সম্ভব নয়।

ক্যাপ্টেন ডগারথি বললেন–আপনার গাড়ির ব্যবস্থা আমরা করছি। এখন থেকে আপনি সরকারী গাড়িতে যাবেন।

জীবনের একটা নতুন অভিজ্ঞতা শুরু হল রবার্ট ভাবলেন।

.

০৩.

অটোয়া, কানাডা, রাত বারোটা।

তার কোড নাম জানুস। বারোজন লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। মিলিটারি কমপাউন্ডের মধ্যে একটা ঘর।

–আপনারা সকলেই জানেন, অপারেশন ডুমস ডে আবার শুরু হয়েছে। অনেক প্রত্যক্ষদর্শী আছেন। তাদের সকলকে খুঁজে বের করতে হবে।

রাশিয়ান ভদ্রলোক বললেন- আমরা কী করে করব?

–ওনার নাম কমান্ডার রবার্ট বেলামি।

তাকে কীভাবে নির্বাচন করা হয়েছে? জার্মান ভদ্রলোকের প্রশ্ন।

উনি নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কম্পিউটার সার্চ করে ওনার নাম পাওয়া গেছে।

জাপানি ভদ্রলোক জানতে চাইলেন– ওনার যোগ্যতা?

উনি একজন পরিণত ফিল্ড অফিসার। ছটা ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। অসাধারণ রেকর্ড আছে। বারবার উনি নিজের অপরাজেয়তা প্রমাণ করেছেন। ওনার কোনো আত্মীয় পরিজন নেই।

-উনি এই ব্যাপারটার গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল?

–নিশ্চয়ই, আমরা বুঝতে পারছি, উনি হয়তো সবকটা প্রত্যক্ষদর্শীকে জোগাড় করে ফেলবেন।

-উনি কি জানেন, এই অভিযানের উদ্দেশ্য কী?

প্রশ্নটা করেছেন এক ফরাসি ভদ্রলোক।

-না।

–তাহলে এই প্রত্যক্ষদর্শীদের জোগাড় করে কী লাভ?

চিনা ভদ্রলোকের প্রশ্ন।

–ওনাকে যথেষ্ট অর্থ দেওয়া হবে।

.

০৪.

নেভাল ইনটেলিজেন্স-এর হেড কোয়ার্টার। মস্ত বড়ো। পেন্টাগনের পঞ্চমতলা জুড়ে অবস্থিত। পৃথিবীর সবথেকে বড় অফিস বিল্ডিং।

অফিসের মধ্যে সমুদ্র-সচেতন আবহাওয়া। ডেস্ক এবং ফাইল ক্যাবিনেটগুলোর রং অলিভ সবুজ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এমনটি করা হয়েছে।

ডেস্কের ভদ্রলোক বললেন- কমান্ডার, শুভ প্রভাত। আপনার পাশ দেখাবেন কি? কমান্ডার এখানে সাত বছর ধরে কাজ করছেন। নিয়মটা একই রকম আছে। উনি পাশ দেখালেন।

ধন্যবাদ, কমান্ডার।

ক্যাপ্টেন ডগারথির কথা মনে পড়ে গেল রবার্টের। এক মহান ব্যক্তি, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

রবার্ট অফিসে গেলেন। সেক্রেটারি বারবারা ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে।

শুভ প্রভাত কমান্ডার, অ্যাকটিং ডিরেক্টর আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন।

ওনাকে একটু অপেক্ষা করতে বলল। অ্যাডমিরাল হুইট্যাকারকে দাও, প্লিজ।

এক মিনিট বাদে রবার্টের সাথে অ্যাডমিরালের কথা হল।

রবার্ট, তোমার কথা বলা শেষ হয়ে গেছে?

কয়েক মিনিট আগে।

কীরকম মনে হল?

ব্যাপারাটা গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কি আমার সঙ্গে ব্রেকফাস্টে আসবেন?

–হ্যাঁ, আমরা কোথায় যাব?

–আমি আপনার জন্য একটা পাশ রেখে যাচ্ছি।

এক ঘন্টার মধ্যে আসছি।

রবার্ট রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ভাবলেন, আজ আমি অ্যাডমিরালের জন্য ভিজিটারস পাশ রাখছি। কয়েক বছর আগে আমি ছিলাম এক অনভিজ্ঞ তরুণ, ব্যাপারটা ভাবতে অদ্ভুত লাগছে।

ইন্টারকমটা বেজে উঠল।

কমান্ডার?

—অ্যাডমিরাল হুইট্যাকার কখন আসবেন?

–এখনই আসবেন। ওনার জন্য একটা পাশের ব্যবস্থা করো।

এবার, অ্যাকটিং ডিরেক্টরের কাছে রিপোর্ট দিতে হবে।

.

০৫.

ডাসটিন ফরনটন, নেভাল ইনটেলিজেন্সের অ্যাকটিং ডিরেক্টর। তাকে এক বিখ্যাত অ্যাথলেট বলা হয়ে থাকে। একসময়ে ফুটবল খেলায় যথেষ্ট নাম করেছিলেন। শক্তপোক্ত মানুষ। অ্যানাকোলিসের গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন। ভাগ্য আজ তাকে এখানে এনে দিয়েছে।

পুরোনো দিনের কথা তিনি আর মনে রাখতে চান না। এখন কাজে খুবই ব্যস্ত হয়েছেন।

তবুও মাঝে মধ্যে মনে পড়ে যায়, বিশেষ করে ইলিনরকে তিনি ভুলতে পারেন না। অসম্ভব যৌবনবতী চেহারা, কাম দ্বারা আচ্ছন্না। ডাসটিন ফরনটনের প্রেমে পড়েছিলেন ফুটবল খেলার আসরে। ভেবেছিলেন যে ছেলেটি এইভাবে বল খেলতে পারেন, না জানি তিনি শরীরের খেলায় কত ওস্তাদ হয়ে উঠবেন। যদি শরীরের মতোই পুংদণ্ডটা উদ্ধত হয়, তাহলে কী হবে?

ছমাস কেটে গেছে। ইলিনর এবং ডাসটিন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। এটাই হল শুরু, ডাসটিন তার শ্বশুরের হয়ে কাজ করতে শুরু করলেন। তিনি এমন এক স্বপ্ন জগতের বাসিন্দা হয়ে গেলেন, যা আগে কখনও ভাবেননি।

উইলার্ড স্টোন, ফরনটনের শ্বশুরমশাই, এক রহস্যে ঢাকা মানুষ। অনেক অর্থের মালিক। রাজনৈতিক যোগাযোগ আছে। কিন্তু সবকিছু গোপনীয়তার মধ্যে রাখতে ভালোবাসেন। সত্তর বছর বয়সে পা দিয়েছেন। সাবধানে চলাফেরা করেন। ঝকঝকে চেহারা, ধূর্ততার ছাপ।

ওনার সম্পর্কে অনেক গুজব আছে। তিনি নাকি মালয়েশিয়াতে তার এক প্রতিদ্বন্দ্বীকে খুন করেছিলেন। এক আমীরের প্রিয় পত্নীর সঙ্গে গোপন সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। নাইজেরিয়াতে একটি সফল বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে ওই দেশের সরকার অনেক অভিযোগ এনেছিল। শেষ পর্যন্ত অভিযোগগুলো তুলে নেওয়া হল। এখানে অর্থের কথা বলা হয়, ঘুষ এবং উপঢৌকন। উনি নাকি গুরুত্বপূর্ণ নথি হাফিস করতে পারেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের হাওয়া করে দেন। স্টোন একাধিক রাষ্ট্রপতি এবং রাজার উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন। তাকে আমরা নগ্ন ক্ষমতার প্রতীক বলতে পারি। কলোরাডো পাহাড়ে তার বিরাট সম্পত্তি পড়ে আছে। প্রতি বছর সেখানে বিখ্যাত বিজ্ঞানী, শিল্পপতি এবং রাজনৈতিক নেতারা আসনে। তারা আলোচনায় যোগ দেন। অবাঞ্ছিত অতিথিদের আটকাবার জন্য সশস্ত্র পাহারা থাকে।

উনি মেয়ের বিয়েতে সম্মতি দিয়েছেন, বিয়েটা যাতে ভালোভাবে হয়, তা দেখেছেন। নতুন জামাইকে পেয়ে খুবই খুশি হয়েছেন। জামাইয়ের মধ্যে অনেকগুলো গুণ আছে।

বিয়ের পর বারো বছর কেটে গেছে। স্টোন ডাসটিনকে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত করে পাঠালেন। কয়েক বছর বাদে প্রেসিডেন্ট তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রপুঞ্জের দূত করে পাঠালেন। এবার অ্যাডমিরাল হুইট্যাকার ও এন আই এ-র ডিরেক্টর থেকে অপসারিত হলেন। ফরনটন সেই জায়গাটা নিলেন।

একদিন উইলার্ড স্টোন তার জামাইকে বললেন- এটাই হল শুরু। তোমার জন্য অনেক বড়ো পরিকল্পনা আছে। তুমি ভাবতেই পারবে না।

দু বছর কেটে গেছে, রবার্টের সাথে ও এ আই এ-র অ্যাকটিং ডিরেক্টরের দেখা হল।

কমান্ডার, বসুন। আপনার রেকর্ড তো খুবই ভালো।

উনি কী বোঝাতে চাইছেন?

ফরনটন বললেন- অ্যাডমিরাল হুইট্যাকারের খবর কী? ভাবতেই পারছি না, উনি কীভাবে অফিস চালিয়ে গেছেন। আমি আমার কাজগুলো তাড়াতাড়ি করতে চাই। আশা করি আপনি আমার বক্তব্য বুঝতে পেরেছেন।

-হ্যাঁ, আমি চেষ্টা করব।

একমাস কেটে গেছে। রবার্টকে পূর্ব জার্মানিতে পাঠানো হল। এক বিজ্ঞানীকে ধরে আনতে হবে। অভিযানটা খুবই কঠিন। পূর্ব জার্মানিতে বিরুদ্ধ পক্ষিরা সক্রিয়। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রবার্ট ওই মানুষটিকে ছিনিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাকে একটা নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসা হয়। ওয়াশিংটনের সাথে গোপন যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ডাসটিন ফরনটনের কাছ থেকে একটি খবর গেল রবার্টের কানে। বলা হয়, অবস্থা পাল্টে গেছে। এখন আর এই কাজে মন দিয়ে লাভ নেই।

রবার্ট জানতে চেয়েছিলেন এই বিজ্ঞানীর কী হবে?

ফরনটন জবাব দিয়েছিলেন- এটা ওনার নিজস্ব সমস্যা, আপনি নিরাপদে এখানে ফিরে আসুন।

রবার্ট ভেবেছিল, মানুষ এত নীচ এবং নির্মম হয় কী ভাবে? রবার্ট ভেবেছিলেন, উনি যদি পূর্ব জার্মানিতে ফিরে যান, তাহলে জনগণ ওনাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

একটা ব্যবস্থা করুনরি, ওনাকে সঙ্গে ঘ হয়েছিল

–দেখা যাক কী করতে পারি, ওনাকে সঙ্গে নিয়ে আসুন।

শেষ অব্দি ভদ্রলোককে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ডাসটিন ফরনটন সেই থেকেই রবার্টের ওপর রেগে আছেন। রবার্ট অবাধ্য হবার চেষ্টা করেছিলেন।

ডাসটিন ফরনটনের অফিস, রবার্ট ভাবলেন, এবার কী ঘটতে চলেছে। এমন একটা কাজ? না, ডাসটিন ফরনটনকে তিনি বিশ্বাস করেন না।

ফরনটন ডেস্কের ওপাশে বসেছিলেন।

–আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন কেন?

হ্যাঁ, আমি কমান্ডারের সাথে কথা বলতে উৎসুক। বসুন।

–আপনাকে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সিতে বদলি করা হয়েছে? কেন বলুন তো?

কেন আমি জানি না। তাছাড়া এখান থেকে আমি তো আর ফিরব না। এটাই আমার শেষতম কাজ।

-কেন?

–আমি চাকরিটা ছেড়ে দেব।

রবার্ট ভাবছিলেন, এই কথা শুনে ওনার মুখের কী প্রতিক্রিয়া হবে। ফরনটন যে অবাক হয়েছেন তা বোঝা গেল না। রাগ করেছেন, তাও নয়। শান্তি পেয়েছেন? বোধহয় না। শেষ পর্যন্ত রবার্টের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন- কেন? কোনো গোপন কারণ?

রবার্ট তার অফিসে ফিরে গেলেন। সেক্রেটারিকে বললেন- বারবারা, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, এক ঘণ্টা পর বেরোব।

–এমন একটা জায়গা, যেখানে ওরা আপনাকে খুঁজে পাবে না।

জেনারেল হিলিয়াডের কথাগুলো রবার্টের মনে পড়েছিল। তিনি বললেন না।

–আপনি কার সঙ্গে কথা বলবেন বলেছিলেন?

-সেটা বাতিল করো, রবার্ট ঘড়ির দিকে তাকালেন। এখন অ্যাডমিরাল হুইট্যাকারের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

.

পেন্টাগনে ব্রেকফাস্ট, গ্রাউন্ড জিরো কাফেতে। এমন নাম কেন দেওয়া হয়েছে? ভাবা হয়েছিল, হয়তো এক সময় এখানে আণবিক বোমার আঘাত হবে। রবার্ট কোণের

টেবিলের ব্যবস্থা করেছিলেন। এখানে কিছুটা গোপনীয়তা আছে। অ্যাডমিরাল হুইট্যাকার সময় সম্পর্কে খুবই সচেতন। তাঁকে আজ বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। আজ মনে হচ্ছে, বয়সটা বোধহয় কমে গেছে।

অ্যাডমিরাল বসে জিজ্ঞাসা করলেন রবার্ট, এন এস-এতে কেমন লাগছে?

রবার্ট বললেন- জানি না, ভবিষ্যতে কী হবে। অ্যাডমিরাল, জেনারেল হিলিয়াড আমাকে তিন হাজার মাইল দূরে পাঠাতে চাইছেন। দশজন প্রত্যক্ষদর্শীকে বের করতে হবে। একটা আবহাওয়া বেলুন ফেটে গেছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে। কিছু কিছু ঘটনা আমি বুঝতে পারছি না।

অ্যাডমিরাল হুইট্যাকার অবাক হয়ে বললেন- জেনারেল কেন এই কাজ করেছেন? অবশ্য তার পরিকল্পনা আমি বুঝব কেমন করে?

অ্যাডমিরাল হুইট্যাকার রবার্টের দিকে তাকালেন। কমান্ডার বেলামি তার অধীনে কাজ করেছেন ভিয়েতনামে। ওই স্কোয়াড্রনে তিনি ছিলেন সব থেকে সেরা পাইলট। অ্যাডমিরালের পুত্র, এডওয়ার্ড রবার্টের সাথে কাজ করেছেন। একদিন প্লেনটাকে গুলি করে নামানো হয়েছে। এডওয়ার্ড মারা যায়। রবার্ট কোনো মতো বেঁচে যান। অ্যাডমিরাল হাসপাতালে গিয়ে মৃত পুত্রের মুখ দেখেছিলেন। ডাক্তাররা বলেছিলেন, দুঃখ করে কী করবেন? উনি তো দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। সমস্ত শরীর তখন যন্ত্রণায় ছটফট করছে রবার্টের। তাও তিনি ফিসফিসানি কণ্ঠস্বরে বললেন- এডওয়ার্ডের কথা চিন্তা করলে খুবই খারাপ লাগছে।

অ্যাডমিরাল হুইট্যাকার রবার্টের হাতে হাত রেখে বললেন- যতটা সম্ভব তুমি তা করেছ। তুমি কবে সেরে উঠবে?

অ্যাডমিরালের মনে তখন রবার্ট ছেলের মতো, যে ছেলে এডওয়ার্ডের জায়গা গ্রহণ করতে পারে।

রবার্ট

–অ্যাডমিরাল

–তোমার কাজটা সফল হবে তো?

কারণ এটা আমার শেষ কাজ।

–সত্যি চাকরি ছেড়ে দেবে?

–হ্যাঁ।

-ফরনটন?

–ওর সাথে আলোচনা করব না।

–এর পর কী করবে কিছু ভেবে দেখেছ?

–অন্য কিছু করব, এমন কিছু, যা আমার করতে ভালো লাগবে।

যদি ওরা তোমাকে ছাড়তে না চায়?

–ওদের হাতে আর কোনো বিকল্প আছে কি? মনকে একবার প্রশ্ন করুন তো?

.

০৬.

রিভার এনট্রান্সের কাছে লিমুজিনটা দাঁড়িয়েছিল।

-আপনি কি তৈরি কমান্ডার? ক্যাপটেন ডগারথি জানতে চাইলেন।

রবার্ট বললেন- হা।

ক্যাপ্টেন ডগারথি রবার্টকে নিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে চলে গেলেন। রবার্ট জানেন না, তিনি কোথায় চলেছেন। তিনি কিছু জিনিসপত্র প্যাকেটে ঢুকিয়ে নিলেন। অন্তত এক সপ্তাহ যাতে থাকা যেতে পারে। শেষ অব্দি সুশানের একটা বাঁধানো ছবি নিলেন। ওই ছবিটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। আহা, ব্রাজিলে ওই মেয়েটি এখন কেমন আছে? উনি ভাবলেন। আমার মনে হয়, সময়টা সুশানের ভালো যাচ্ছে না।

এসব কথা ভেবে ভীষণ লজ্জা করল।

.

লিমুজিন এয়ারফোর্স বেসে এসে গেছে। একটা প্লেন দাঁড়িয়েছিল এয়ারপোর্টে।

ক্যাপ্টেন ডগারথি হাতে হাত রেখে বললেন- তোমার ভাগ্য যেন সদয় হয়, কমান্ডার।

রবার্ট কেবিনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ক্রুরা ভেতরে বসেছিলেন। ফ্লাইটের আগে ভালো করে দেখছেন সব কিছু।

পাইলট, কোপাইলটকে দেখা গেল। নেভিগেটর এবং স্টুয়ার্ট। সকলেই এয়ার ফোর্সের ইউনিফর্ম পরেছেন। রবার্ট এই জাতীয় বিমানের সাথে খুবই পরিচিত। এর মধ্যে ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি থাকে। বাইরের দিকে লেজের কাছে থাকে অতি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যানটেনা। সব মিলিয়ে বিমানটাকে মস্ত বড়ো মাছের মতো দেখাচ্ছে। যে মাছ নদীতে আনন্দে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। এই বিমানের ভেতর দিকের রং হল নীল, তাই কেবিনটাকেও নীল রঙে রঙিন করা হয়েছে।

রবার্ট বুঝতে পারলেন, তিনিই এই বিমানের একমাত্র যাত্রী। পাইলট তাকে দেখে মাথা নীচু করলেন। বললেন– কমান্ডার, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনি সিটবেল্ট পরে নিন। এবার আমরা উড়ান শুরু করব।

রবার্ট সিট বেল্ট পরে নিলেন। প্লেনটা উড়তে শুরু করেছে। তারপর? সীমাহীন শূন্যতা।

.

ভিয়েতনাম, সেখানে উনি ছিলেন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার। ওনাকে রোজার নামে একটি এয়ার ক্রাফট কেরিয়ারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। উনি পাইলটদের শিক্ষা দিতেন। কীভাবে নতুন আক্রমণ করা যায়, সে বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতেন, ওনার অধীনে একটা বম্বব্লাস্ট স্কোয়াড্রন ছিল। ব্যাংককে বেশ কয়েক সপ্তাহ ওনাকে থাকতে হয়েছিল। তখন চোখ থেকে ঘুম চলে গিয়েছিল। এই শহরটা একটা ডিজনিল্যান্ডের মতো। পুরুষ জন্তুদের আনন্দ দেওয়ার অনেক উপকরণ ছড়ানো আছে। সেখানেই এক অসাধারণ রূপবতী থাই সুন্দরীর সঙ্গে তার দেখা হয়। পরবর্তীকালে এই মহিলা তার জীবনের সবকিছু হয়ে ওঠে। তার কাছ থেকে বেশ কয়েকটি থাই শব্দ শিখেছিলেন তিনি।

রবার্টের সব কথাই মনে পড়ে যায়। পরে ব্যাংকককে মনে হয়েছিল একটা দূরবর্তী স্বপ্ন। যুদ্ধটা ছিল চরম বাস্তব। এটা ছিল আতঙ্ক। ভিয়েতনাম সম্পর্কে মার্কিন দেশের মানুষের মন তখন বিষিয়ে উঠেছে।

আজ কত কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে।

তবে সেখানে কিন্তু তিনি কর্তব্যে অবহেলা করেননি। প্রতিটি দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছেন।

নতুন একটা দল তৈরি হল। নাম দেওয়া হল টপগান। এই দলের ওপর নতুন দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। তারা কমান্ডার বেলামিকে সব ব্যাপারে সাহায্য করবে। অ্যাডমিরাল হুইট্যাকার বেলামিকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন- কমান্ডার, এটা খুব সুন্দর চাকরি, তাই নয় কি?

–অনেক ধন্যবাদ, অ্যাডমিরাল। চলুন, আমরা কাজটা শুরু করি।

–আমি তো তৈরি আছি।

রবার্টকে চৌত্রিশ ঘণ্টার অভিযানে পাঠানো হল। অবিরাম বোমাবর্ষণ করতে হবে। এটা ছিল ব্যাকের সিক্সের জন্য তাঁর পঁয়ত্রিশতম অভিযান।

.

তারা হ্যানয়ের ওপর দিয়ে উড়ে গেলেন। চলেছেন ফুঁ থো এবং ইয়েন বে-র দিকে। এডওয়ার্ড হুইট্যাকার রবার্টের পাশে বসে আছেন র‍্যাডার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে। শত্রুপক্ষের তরফ থেকে কোনো আঘাত আসতে পারে কি না তা দেখছেন।

আকাশের বুকে স্বাধীনতার আস্বাদন। নীচে লাইটগান থেকে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। অন্ধকারের বুকে একটুকরো আলোর রেখা। পঞ্চান্ন মিলিমিটারের সেল ছুটে আসছে। কালো আকাশের অন্ধকার।

এডওয়ার্ড বললেন– আমরা কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।

রজার?

–এ-৬৪ ইনট্রুডার এগিয়ে চলেছে। রবার্ট সবদিকে নজর রেখেছেন।

রেডিওতে একটা গলা শোনা গেল- রোমিও, চারটের সময় কাজটা শুরু হবে।

রবার্ট তাকিয়ে দেখলেন একটা মিক ছুটে আসছে। তিনি বিমানটাকে অন্য দিকে নিয়ে গেলেন। মিকটা তখনও তাড়া করছে। রবার্টের মুখ সাদা হয়ে গেছে। এক হাজার ফুট, দুশো ফুট, চারশো ফুট–

এডওয়ার্ড চিৎকার করলেন– আমরা কেন অপেক্ষা করছি?

রবার্ট শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। তারপর গুলিবর্ষণ শুরু হল।

এডওয়ার্ড বললেন- শেষ অব্দি আমরা বেঁচে গেছি।

রবার্ট তখনও কাজ করে চলেছেন।

ইন্টারকমে একটা সুন্দর শব্দ ভেসে উঠল। রোমিও, কাজটা ভালো হয়েছে।

এবার প্লেনটা তার লক্ষ্য বস্তুর কাছাকাছি এসে গেছে।

এডওয়ার্ড বললেন- এখান থেকেই কাজ শুরু হোক। তিনি একটা লাল বোতাম টিপলেন। বোমাগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হল। সেগুলো ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামছে। মিশন

সফল হয়েছে। রবার্ট এবার বিমানটাকে চালিয়ে ক্যারিয়ারের দিকে নিয়ে গেলেন।

হঠাৎ সামনে আর একটা বম্বারের আগমন।

এডওয়ার্ড বললেন– আক্রমণ করুন এখনই।

দুজনেই লাল আলো জ্বেলে দিলেন। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

রেডিওতে একটা কথা শোনা গেল রোমিও ফ্রম এটা হল টাইগার। সাংঘাতিক বিমান।

রবার্ট সেকেন্ডের ক্ষণ ভগ্নাংশে সিদ্ধান্ত নিয়ে বললেন- এখনই ঝাঁপিয়ে পড়ছি।

আবার লড়াই শুরু হয়ে গেল। এডওয়ার্ড বললেন তাড়াতাড়ি, আরও তাড়াতাড়ি না হলে দেরি হয়ে যাবে।

রবার্ট অলটোমিটারের দিকে তাকালেন। কাঁটাটা ক্রমশ ঝুলে যাচ্ছে। তিনি রেডিও মাইক হাতে নিয়ে বললেন- রোমিও, কোন বেসে যাবে। আমরা কি আক্রমণ করব?

-হ্যাঁ, এখনই।

–নাকি আমরা ফিরে যাব।

না, কিছুক্ষণ বাদে শোনা গেল, চার্লি এসে গেছে। এসবই সঙ্কেতে কথাবার্তা হচ্ছে। এডওয়ার্ড তার চার্টের দিকে তাকিয়ে বললেন– সাত মিনিট সময় আছে। তার মধ্যে সব কিছু করতে হবে।

অবশেষে এই অভিযানটা সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল।

তারপর? রবার্টের মনে হল বুকের ভেতর অসম্ভব যন্ত্রণা। রক্ত শুধু রক্ত। কিন্তু কেন? বুলেট ঢুকতে শুরু করেছে? বেঁচে থাকার কোনো আশা নেই।

শেষ অব্দি রবার্ট সব শক্তি কেন্দ্র করে লড়াই করার চেষ্টা করলেন। তাকালেন এডওয়ার্ডের দিকে। বললেন- আমি দুঃখিত।

আবার এক নতুন যুদ্ধের উন্মাদনা শুরু হবে।

রবার্টের আঘাতটা সাংঘাতিক। হাসপাতালে ভর্তি হতে হল। সেখানে তাঁকে মরফিন দেওয়া হল। বুকের ওপর ব্র্যান্ডেজ করে দেওয়া হয়েছে।

এখন কতদিন এখানে থাকতে হবে কে জানে?

শান্ত পরিবেশ। রণক্ষেত্রের উন্মাদনা এখানে আসতে পারে না।

রবার্ট শুয়ে শুয়ে অনেক কিছু ভাবতে থাকেন। তখনই সাদা ইউনিফর্ম পরা এক মহিলার মুখ ভেসে উঠে। তিনি কিছু কথা বলার চেষ্টা করছেন। এখানে অনেকে মিলে কথা বলছেন। রোগিদের যন্ত্রণা, ডাক্তাররা আদেশ দিচ্ছেন। নার্সরা ছুটোছুটি করছে।

এখানে কোনো কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। মনে আছে পরবর্তী আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে তাকে এক অদ্ভুত যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাতে হয়েছে। পরে তিনি জানতে

পেরেছিলেন, ওই নার্সের নাম সুশান ওয়ার্ড। তিনি অপারেশনে সাহায্য করেছিলেন। এমন কি তিনি তাঁর নিজের রক্ত দিয়ে রবার্টের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন।

যখন অপারেশনটা হয়ে গেল, সার্জেন বললেন- আমরা বৃথা সময় নষ্ট করলাম। পেশেন্ট বাঁচবে না, দশ শতাংশ সম্ভাবনা নেই।

ডক্টর জানতেন না, রবার্ট বেলামি কে? সুশান ওয়ার্ড কে, তাও তিনি জানতেন কি? রবার্ট যখন চোখ খুললেন, সুশান দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাতে হাত রেখে। অদ্ভুত একটা পরিস্থিতি।

শেষ অব্দি রবার্ট বেঁচে গেলেন। শুধু বেঁচে যাওয়া নয়, আবার জীবন প্রবাহ। প্রতি মুহূর্তে সুশান পাশে থেকেছেন। সারা শরীরে ঘাম, সুশান মুছে দিয়েছেন। সুশান বলেছেন আমি কথা দিচ্ছি, ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন। এখন শুতে চলে যান।

.

সুশান, অপারেটিং রুমের প্রধান নার্স, তাকে ওই হাসপাতালের সেরা সেবিকা বলা হয়ে থাকে। ছোট্ট একটা শহরে তাঁর জন্ম হয়েছিল। ভালোবাসত ফ্রাঙ্ক প্রেসকত নামে একটি ছেলেকে। মেয়রের ছেলে। সকলে জানত, একদিন তাদের মধ্যে বিয়ে হবে।

সুশানের একটি ছোটো ভাই ছিল, মাইকেল। তাকেও সে খুব যত্ন করত। মাইকেলের আঠারো নম্বর জন্মদিনে তাকে ভিয়েতনামে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সুশান তাকে রোজ চিঠি লিখতেন। তিন মাস কেটে গেছে। সুশানের পরিবার একটা টেলিগ্রাম পেল। টেলিগ্রামটা। খোলার আগেই তারা হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন, কী লেখা আছে।

ফ্রাঙ্ক প্রেসকত এই খবরটা শুনতে পেলেন। তিনি বললেন-সুশান, আমি খুবই দুঃখিত। মাইকেলকে আমি খুবই ভালোবাসতাম। এসো, বিয়ের কাজটা সেরে ফেলা যাক।

সুশান তার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন- না, আমাকে অন্য একটা কাজ করতে হবে। সেটা অনেক বড়ো কাজ।

–আমাকে বিয়ে করবে না?

না, আমি এখন ভিয়েতনামে যাব।

সুশান ওয়ার্ড নার্সিং স্কুলে ভর্তি হলেন। সে ভিয়েতনামে এগারো মাস ছিলেন। অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেছে। শুধু কমান্ডার রবার্ট বেলামিকেও নয়, তার হাতের পরশে অনেক সৈন্য মৃত্যুর মুখ থেকে জীবনের উন্মাদনায় ফিরে আসতে পেরেছে। সুশানের এই কার্যকারিতা দেখে অনেকে অবাক হয়ে গেছে। কীভাবে সে মৃতের দেহে প্রাণ সঞ্চার করেন?

তিনি প্রথমেই একজন পেশেন্টের রেকর্ডের দিকে তাকিয়ে থাকেন। যেমন, বেলামি তিনি জন্মেছেন শিকাগোর কাছে একটি ছোট্ট শহরে। শহরটির নাম হারবে। কলেজে পড়তে পড়তেই নেভির ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। পেনসাগোলাতে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। বিয়ে হয়নি।

প্রত্যেকদিন রবার্টের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। রবার্ট একটু করে সেরে উঠছেন। তখনও হেঁটে যাচ্ছেন মৃত্যু ও জীবনের এক সংকীর্ণ উপত্যাকা দিয়ে। ছ-ছটি দিন কেটে গেছে। রবার্ট তখনও ভুল বকছেন। একদিন বিছানায় বসে শূন্য দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে সুশানকে বললেন– আমি কি স্বপ্ন দেখছি? আপনি স্বপ্ন না সত্যি?

সুশান বলেছিলেন- হ্যাঁ, আমি সত্যি।

না, সব কথা স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। ঈশ্বর আপনাকে পাঠিয়েছেন আমাকে সেবা করার জন্য।

সুশান রবার্টের চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন- যদি আপনার মৃত্যু হত, আমি নিজেকে মেরে ফেলতাম।

রবার্টের চোখ খুলে গেল– আমি কোথায় আছি?

আমরা একটা আর্মি হাসপাতালে আছি।

কবে আমি এসেছি?

ছদিন আগে।

–এডি কোথায়?

–আমি দুঃখিত, এ ব্যাপারটা বলতে পারব না।

–অ্যাডমিরালকে সব বলতে হবে।

সুশান রবার্টের হাতে হাত রেখে বললেন– উনি সব জানেন। উনি এখানেই আছেন।

ধীরে ধীরে রবার্টের উন্নতি হতে থাকল। ডাক্তাররা অবাক হয়ে গেলেন।

.

রবার্ট কি সুশানকে ভালোবেসেছেন? হয়তো তাই, যখন সুশান ক্ষতচিহ্ন পরিষ্কার করেন, তখন রবার্টের শুধুই মনে পড়ে বোমা বর্ণের শব্দ। সুশান বলেন- না, ওখানে আমাদের গান গাওয়া হচ্ছে।

রবার্টকে অন্য একটা ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সুশান বললেন– এবার আমার কাজের ছুটি। হয়তো অন্য কেউ আপনার দায়িত্ব নেবে। না, আমার শুভেচ্ছা সর্বদা আপনার সঙ্গেই থাকবে।

দু সপ্তাহ কেটে গেল। তারা বিয়ে করলেন। এক বছর পর রবার্টের ক্ষতটা সম্পূর্ণ সেরে গেল। সুশান সব সময় পাশে পাশে থেকেছেন। ছায়ার মতো। ভালোবাসার সাথে গভীর মমত্ববোধ। অসম্ভব প্রাণশক্তি। রবার্ট ভালোবেসে ছিলেন সুশানের সৌন্দর্যকে। শুধু তাই নয়, তার মধ্যে একটা স্বাভাবিক কৌতুকপ্রিয়তা আছে।

বিয়ের প্রথম বার্ষিকী। রবার্ট বললেন- তুমি বিশ্বের সব থেকে সুন্দরী রমণী, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, তোমার এই করুণা এবং মমতা আমার খুবই ভালো লাগে। এ ব্যাপারে কেউ তোমার সাথে লড়াইতে পেরে উঠবে না।

সুশান রবার্টকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন- হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ।

ভালোবাসা, তার অন্তর্নিহিত অর্থ আরও পরিস্ফুটিত হল। তারা একে অন্যকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। বন্ধু-বান্ধবরা ঈর্ষার চোখে তাকিয়ে থাকতেন। যখনই কেউ এক পবিত্র সুন্দর আলোচনা করতেন তাঁরা রবার্ট এবং সুশানের উদাহরণ দিতেন। একে অন্যের সম্পূর্ণ পরিপূরক। সুশানকে আমরা এক আবেদনি মহিলা বলতে পারি। মনে হয় তিনি যেন আগুন ধরা উন্মাদনা নিয়ে বসে আছেন। একদিন বিকেলবেলা, তারা ডিনার পার্টিতে যাবেন, রবার্টের দেরি হয়েছে। রবার্ট শাওয়ারে ছিলেন। সুশান বাথরুমে এলেন। সুন্দর পোশাক পরলেন। স্ট্র্যাপ ছাড়া ইভনিং গাউন।

রবার্ট বললেন- তোমাকে ভারী সেকসি দেখাচ্ছে। এসো, আমরা সেই খেলাটা শুরু করি।

সুশান বলেছিলেন– না, দেরী হয়ে যাবে?

এক মুহূর্ত বাদে রবার্ট তাকে সম্পূর্ণ নগ্না করলেন। দুজনে একসঙ্গে শাওয়ারের তলায় স্নান করলেন।

তারা আর পার্টিতে যাননি।

সুশান জানতেন রবার্টের কখন কী দরকার হবে। কীভাবে তাকে আরও বেশি সাহায্য করা যাবে। ড্রেসিং রুমের টেবিলে মাঝে মধ্যেই সুশান ভালোবাসার চিরকূট পেতেন। অথবা জুতোর তলায় কাগজের টুকরো গোঁজা থাকত। মাঝে মধ্যে ফুল উপহার হিসেবে আসত তার হাতে।

তারপর? অসাধারণ হাসি আর আনন্দময়তা। দুজনে অনুভব করতেন।

ইন্টারকমে পাইলটের কণ্ঠস্বরআমরা জুরিখে নামতে চলেছি। দশ মিনিট সময় আছে কমান্ডার।

রবার্ট বেলামির চিন্তাধারা ছিন্ন হয়ে গেল। আবার তিনি চরম বাস্তবে ফিরে এলেন। হ্যাঁ, এখন চোখের সামনে শুধুই আলপস পাহাড়। সুইজারল্যান্ড, আর কিছু নেই।

–সিটবেল্ট ভালো করে বেঁধে নিন, প্লিজ।

বিমানটা অন্ধকার অরণ্যের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে। রানওয়ে দেখা গেল। জুরিখ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট।

নোয়েলের অ্যাডিয়েশন বিল্ডিং। এটাই প্রধান টার্মিনাল। আকাশটা পরিষ্কার।

পাইলট বললেন– এটা সুন্দর একটা রবিবারের সকল। কিন্তু বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে। এখানে আপনার কোনো ঘড়ি লাগবে না। শুধু একটা ব্যারোমিটার লাগবে কমান্ডার, আমি কি আপনার জন্য একটা গাড়ির ব্যবস্থা করব?

না, ধন্যবাদ, রবার্টের মনে হল, এখন তাকে একলাই চলতে হবে। তিনি একটা মিনিবাসে উঠে বসলেন। তাকে এয়ারপোর্ট হোটেলে যেতে হবে। শুরু হবে স্বপ্নবিহীন পথ চলা।

.

০৭.

দ্বিতীয় দিন, সকাল আটটা

পরের দিন সকালে রবার্ট ডেস্কের পাশে বসে থাকা ক্লার্কের সঙ্গে কথা বললেন। স্থানীয় ভাষায় কথা বললেন। জার্মান টান ছিল।

জানতে চাওয়া হল, রবার্ট এখানে কতদিন থাকবেন?

রবার্ট কি জানেন? হয়তো এক ঘণ্টা, একমাস অথবা একবছর কিংবা দুবছর।

আরও কিছু কথা হয়েছিল।

ক্লার্ক অবাক হয়ে রবার্টের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন- ঠিক আছে, এই কাগজগুলো ভরতি করে দিন।

রবার্ট গাড়ির ভাড়ার দাম দিয়ে দিলেন। তার কালো ক্রেডিট কার্ড বের করলেন। জেনারেল হিলিয়াড এই কার্ডটা তাকে দিয়েছিলেন। ক্লার্ক এটা দেখলেন। তারপর বললেন কোনো সমস্যা?

না, কোনো সমস্যা নেই।

একটা গাড়ি ভাড়া করা হল, ধূসর বর্ণের ওপেল ওমেগা। রবার্ট এয়ারপোর্ট হাইওয়ে দিয়ে চলেছেন ডাউনটাউন জুরিখের দিকে। সুইজারল্যান্ড তার খুবই ভালো লাগে। সারা বিশ্বের অন্যতম সুন্দর এক রাষ্ট্র। এখানে অনেকবার তিনি এসেছেন। কিন্তু এইভাবে স্পাইগিরি করতে এই প্রথম। তিনি সুইস ইনটেলিজেন্স এজেন্সি সম্পর্কে অনেক খবর নিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তারা অসাধারণ কাজ করেছিল। এই সংস্থার প্রধান কাজ হচ্ছে, গুপ্তচরদের বিরুদ্ধে কঠিন হয়ে ওঠা। তারা রাষ্ট্রপুঞ্জের অন্যতম সংস্থা। জেনেভাতে মাঝে মাঝেই বিভিন্ন অধিবেশন হয়। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসেন। তখন তাদের কাজের চাপ আরও বেড়ে যায়।

পঁচিশ মিনিট কেটে গেছে। গাড়িটা ব্যস্ত শহরে চলে এসেছে। সেটা গ্রান্ড হোটেলের দিকে এগিয়ে চলেছে। চারপাশে সুইজ সভ্যতার ছাপ। লেক জুরিখকে চোখে পড়ল। গাড়িটা হোটেলের বাইরে রাখা হল। রবার্টের এবার আসল কাজ শুরু হবে। রবার্ট সুইজারল্যান্ডের একটা ম্যাপ ইতিমধ্যে কিনে ফেলেছিলেন। সেই ম্যাপের ওপর চোখ রেখে বুঝতে পারছেন, এবার কোনদিকে যাবেন।

সুন্দর শরৎ সকাল। সামনের কাজটার কথা ভাবছেন। কীভাবে শুরু করা যায় ভাবতে ভাবতে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

এখনও পর্যন্ত তার হাতে কী তথ্য আছে? রবিবার, ১৪ অক্টোবর, উটেনডরফ। এছাড়া আর কোনো তথ্য নেই।

কিছু মনে করার চেষ্টা করলেন। যাঁরা এই দেশে ট্যুরিস্ট হিসেবে আসেন, তারা দুটি প্রধান শহর থেকে যাত্রা শুরু করেন। হয় জুরিখ, অথবা জেনেভা। রবার্ট ভালোভাবে চিন্তা করলেন। কোথায় শুরু করা যায়? অনেকগুলো কোম্পানির নাম আছে, সানসাইন টুর, সুইজ ট্যুর, ট্যুর সার্ভিস। আরও কত কি? প্রত্যেকটা অফিসে যেতে হবে। খুঁটিয়ে সব দেখতে হবে। তিনি সব কটা ঠিকানা লিখে নিলেন। টুর সার্ভিস থেকেই তার অভিযান শুরু হল।

ক্লার্কের সাথে কথা শুরু হল।

রবার্ট জানতে চাইলেন–আমার বউ গত রোববার ট্যুরে অংশ নিয়েছিল। সে তার টাকার ব্যাগটা বাসে ফেলে যায়। আসলে উটেনডরফের কাছে যে বেলুনটা ফেটে গিয়েছিল, সেটা দেখতে গিয়ে সে খুব উৎসাহিত হয়ে ওঠে। তাই ভুলে গেছে।

ক্লার্ক বলল- আপনার ভুল হচ্ছে মশাই, আমাদের ট্যুর কখনও উটেনডরফে যায় না।

–ও, দুঃখিত।

পরবর্তী অভিযানটা মোটামুটি ভালো হল।

–আপনারা কি উটেনডরফে যান?

ক্লার্কের মুখে হাসি। আমাদের ট্যুর সব জায়গায় যায়। আমরাই সবথেকে নামী সংস্থা। আপনি কোথায় যাবেন?

–গত রোববার আপনারা কি সেখানে গিয়েছিলেন? একটা বেলুন ফেটে গিয়েছিল?

ক্লার্ক কিছু ভাববার চেষ্টা করলেন না, আমরা তো সেখানে যাইনি।

–তাহলে ওই ঘটনাটার কথা আপনারা জানেন না?

না।

ধন্যবাদ।

.

তৃতীয় অফিসটা শহরের এককোণে অবস্থিত। বাইরের আলোয় লেখা আছে সানসাইন টুর।

রবার্ট কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেলেন– শুভ দ্বিপ্রহর। আমি আপনাদের ট্যুর বাস সম্বন্ধে কয়েকটা কথা জানতে চাইছি। আমি শুনেছি একটা বেলুন উটেনডরফের কাছে ভেঙে গিয়েছিল। আপনাদের ড্রাইভার আধঘণ্টা দাঁড়িয়েছিল।

-না-না, মাত্র পনেরো মিনিট, আমাদের খুব পরিষ্কার নির্দেশ আছে।

অবশেষে সফলতা এল।

–আপনি কেন এ ব্যাপারে এত আগ্রহী, জানতে পারি কি?

রবার্ট তাঁর নির্দেশ পত্রটা বের করলেন। বললেন– আমি একজন রিপোর্টার। আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে একটা প্রতিবেদন লিখতে চলেছি। এটা ট্রাভল অ্যান্ড লেজার পত্রিকাতে প্রকাশিত হবে। বলা হবে, সুইজারল্যান্ডের বাসগুলো কত ভালোভাবে কাজ করে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করা হবে। আমি কি ওই ড্রাইভারের সাথে কথা বলতে পারি?

-হ্যাঁ, আপনার ওই লেখাটা খুবই ভালো হবে। খুবই ভালো। আমরা এ ব্যাপারে গৌরব বোধ করি।

-হ্যাঁ, গৌরব বোধ করাই উচিত।

—আমাদের কোম্পানির নাম থাকবে তো?

নিশ্চয়ই। বড়ো বড়ো করে থাকবে।

–আমি তো কোনো অসুবিধা দেখছি না।

ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলা যাবে?

–আজ তো ওর ছুটি।

উনি কাগজে কিছু একটা লিখলেন।

রিপোর্টার বেলামি ঠিকানা পেয়ে গেছেন। নামটাও পেয়ে গেছেন।

সে কাপেলে থাকে, ছোট্ট একটা গ্রাম। এখান থেকে ৪০ কিলোমিটার। এখন গেলে হয়তো তাকে পেয়ে যাবেন।

–অনেক ধন্যবাদ। আর একটা ব্যাপারও জানতে চাইছি। সেদিন কতগুলো টিকিট বিক্রি হয়েছিল বলুন তো? বলতে পারবেন?

-হ্যাঁ, আমাদের কাছে সব রেকর্ড থাকে। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন... রবিবার, সাতজন প্যাসেঞ্জার ছিলেন।

সাতজন? সম্পূর্ণ অচেনা অজানা যাত্রী এবং ড্রাইভার।

রবার্ট অন্ধকারে হেঁটে যাবেন কী করে?

–ওই প্যাসেঞ্জারদের নাম দেওয়া যাবে কি?

–এতে কী লাভ? ওরা তো টিকিট কাটেন, জায়গা দেখেন, আবার চলে যান। ওদের সম্পর্কে আমরা বেশি কিছু লিখতে পারি না।

আপনাকে আবার ধন্যবাদ।

ক্লার্ক বলল- ওই প্রতিবেদনের একটা কপি আমাদের দেবেন কিন্তু।

–অবশ্যই দেব, রবার্ট জবাব দিলেন।

যেখান থেকে বাসগুলো ছাড়ে, রবার্ট সেখানে গেলেন। হয়তো এখানেই হারানো সূত্রের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। বাসটার রঙ বাদামি এবং রূপোলির সংমিশ্রণ। আলপাইন রাস্তার ওপর দিয়ে সহজে যেতে পারে।

রবার্ট গাড়িতে ফিরে এলেন। ম্যাপের দিকে তাকালেন। কোন দিক দিয়ে যাওয়া যায়? আলপসের দিকে যাত্রা করতে হবে। তার আগে ওই কাপেল গ্রামে যেতে হবে।

উনি দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চললেন। ছোট্ট একটা পাহাড়কে অতিক্রম করলেন। আহা, পাহাড়ের পাদদেশে গাড়িটা উঠে চলেছে। একটার পর একটা ছোটো গ্রাম পেছনে পড়ে রইল। শেষ অব্দি উনি কাপেলে এসে পৌঁছোলেন। গাড়িটা রেস্টুরেন্টের পাশে দাঁড় করালেন।

ওয়েট্রেস, একটা টেবিল পরিষ্কার করছিল। ঝকঝকে জার্মান ভাষায় তিনি নিজের পরিচয় দিলেন। রিপোর্টার শুনে ওয়েটার অবাক হয়ে গেছে। এবার আসল জায়গায় যাত্রা শুরু হবে।

হ্যাঁ, এই তো সেই বাড়িটা, ঠিকানা মিলে যাচ্ছে।

মোটাসোটা এক ভদ্রমহিলা, মুখে গোঁফের আভাস, বেরিয়ে এলেন। আপনি কে?

–মি. বেকারম্যান বাড়িতে আছেন?

–কেন? কী দরকার? ভদ্রমহিলার আচরণে সন্দেহ।

রবার্ট বিশ্বজয়ী হাসি হেসে বললেন আপনি বোধহয় শ্রীমতী বেকারম্যান? তিনি তার রিপোর্টারের পরিচয়পত্র দেখিয়ে বললেন, আমি সুইজারল্যান্ডের বাস ড্রাইভারদের সম্বন্ধে একটা আর্টিকেল লিখতে চাইছি। আপনার স্বামীকে আমরা অন্যতম সেরা বাস ড্রাইভার হিসেবে নির্বাচিত করছি।

ভদ্রমহিলার মুখের রঙ উজ্জ্বল হয়ে উঠল– হ্যাঁ, আমার হানস এ ব্যাপারে সত্যিই অতুলনীয়।

-মিসেস বেকারম্যান, ওনার সাথে এক্ষুনি কথা বলতে হবে।

-হানসের ইন্টারভিউ? পত্রিকাতে প্রকাশিত হবে? ভদ্রমহিলা গদগদ, ভেতরে আসুন, ভেতরে আসুন, প্লিজ।

রবার্ট ভেতরে গিয়ে বসলেন। ছোটো সাজানো একটা লিভিংরুম। সেখানেই তাকে বসতে হল।

এই বাড়িটার সর্বত্র একটা সুন্দর নীরবতার ছাপ আছে। সাধারণ কাঠের ফার্নিচার। এককোণে একটা ফায়ার প্লেস। লেসের পর্দা ঝুলছে। রবার্ট ভাবতে থাকলেন, এখান থেকেই আমাকে শুরু করতে হবে। এটাই আমার একমাত্র সূত্র। কিন্তু কীভাবে?

একটু বাদে টাক মাথার পাতলা চেহারার এক মানুষ সামনে এসে দাঁড়াল। তার গায়ের রং বিবর্ণ। লম্বা মোটা গোঁফ আছে। সে বলল, গুড আফটারনুন, হেড?

স্মিথ, গুড আফটারনুন। রবার্টের কণ্ঠস্বর আন্তরিক। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য খুবই আগ্রহী, মি. বেকারম্যান।

–আমার বউ সব বলেছে। আপনি নাকি ড্রাইভারদের নিয়ে একটা গল্প লিখছেন। আমাকে নির্বাচন করেছেন।

কথার মধ্যে জার্মান ছাপ সুস্পষ্ট।

রবার্ট হাসলেন ঠিকই বলেছেন। আমার এই পত্রিকাতে আপনার ছবি প্রকাশিত হবে। আপনি তো খুব ভালোভাবেই বাস চালিয়েছেন।

-হ্যাঁ, আপনি কি রোববার দুপুরবেলার সেই দুর্ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইছেন?

–হ্যাঁ, আমাকে সব কিছু জানতে হবে।

বসুন। আমি বলছি।

রবার্ট বসলেন।

বেকারম্যান বললেন– আমি কিন্তু আপনাকে ড্রিঙ্ক দিতে পারছি না। বাড়িতে খাওয়া ছেড়েই দিয়েছি। পেটে হাত দিয়ে বললেন, আলসার হয়েছে। ডাক্তাররা খাওয়া কমাতে বলেছেন।

তারপর রবার্টের দিকে তাকিয়ে বললেন- হ্যাঁ, বলুন কী জানতে চান?

–আপনি ওই যাত্রীদের কথা বলুন, ওরা রবিবার ওই বাসে ছিলেন। আপনারা তো উটেনডরফের কাছে থামলেন, সেখানে বেলুনটা ফেটে গিয়েছিল। তাই তো?

হানস বেকারম্যান বললেন– কী বলছেন আপনি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কী বেলুন!

–যে বেলুনটা ফেটে গিয়েছিল।

তার মানে রকেট? মহাকাশযান?

রবার্টের অবাক হবার পালা– না-না, আমি ওই বেলুনটার কথা বলেছি।

–তার মানে উড়ন্ত চাকি?

রবার্টের তখন অবস্থা খুবই শোচনীয়। মেরুদণ্ড দিয়ে ঠাণ্ডা শিহরণ।

আপনি কি একটা ফ্লাইং সসার দেখেছেন?

–হ্যাঁ, তার মধ্যে মৃতদেহ ছিল।

–গতকাল সুইজ আলপসে ন্যাটোর একটা আবহাওয়া বেলুন ধ্বংস হয়ে গেছে। তার মধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্য ছিল। ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়।

রবার্ট শান্ত হয়ে বসার চেষ্টা করে বললেন মি. বেকারম্যান, সত্যি বলুন তো আপনি কী ধরনের ফ্লাইং সসার দেখেছেন?

–হ্যাঁ, আমি স্পষ্ট দেখেছি। আকাশ দিয়ে ভাসতে ভাসতে উড়ে যাচ্ছিল।

তার মধ্যে মৃত মানুষ ছিল কী করে জানলেন?

ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য! কী ছিল আমি কী করে বলব? অদ্ভুত তাদের চোখের গড়ন। তারা সিলভার মেটালিক রঙের স্যুট পরেছিল। ব্যাপারটা দেখে আমি খুবই ভয় পেয়েছিলাম।

রবার্টের মনে চিন্তা। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন আপনার যাত্রীরা সকলে দেখেছিল।

-হ্যাঁ, তারা সকলেই দেখেছিলেন। আমরা সেখানে পনেরো মিনিট দাঁড়িয়ে ছিলাম। যাত্রীরা বলেছিলেন, আরও বেশিক্ষণ দাঁড়াতে, কিন্তু কোম্পানির নির্দেশ আছে, সময় নষ্ট করা চলবে না।

রবার্ট জানেন, এই প্রশ্নটা করা উচিত নয়। তবুও জানতে চেষ্টা করলেন মি. বেকারম্যান, কোনো যাত্রীর নাম বলতে পারবেন কি?

–মিস্টার, আমি তো বাস চালিয়ে থাকি। প্যাসেঞ্জাররা জুরিখ থেকে টিকিট কেনেন। তারা নানা দিকে ঘুরতে চলে যান। কেউ তাদের নাম বলেন কি?

রবার্ট শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে বললেন– আপনি তাদের কাউকে চিনতে পারবেন না?

একটা কথা বলতে পারি, এই দলে কোনো শিশু ছিল না, শুধু পুরুষরা।

–শুধু পুরুষরা?

না-না, একজন মহিলা ছিলেন।

না, এভাবে খড়ের গাদায় সঁচ খোঁজা সম্ভব নয়। রবার্ট ভাবলেন, কী করে আমি আসল জায়গায় পৌঁছোব।

–মি. বেকারম্যান, ওই ট্যুরিস্টরা দুদিক থেকে বাসে উঠেছিলেন, তাই তো? ট্যুর শেষ হয়ে গেল, তারা নানা দিকে ছিটকে গেলেন?

মি. স্মিথ, আপনি ঠিকই বলেছেন।

–প্যাসেঞ্জারদের সম্পর্কে কোনো তথ্য? তারা কী কথা বলেছিলেন? কোনো বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন?

–মিস্টার, আপনি কেন এই ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছেন? ওঁরা কি কোনো সমস্যার সৃষ্টি করেছেন? করেননি তো। তাহলে আমি কেন এ ব্যাপারে মত দেব? জার্মানরাই ঝামেলা করে থাকে।

রবার্টের সমস্ত শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তিনি বললেন–কী ধরনের? কোন্ জার্মানরা?

-সবাই আকাশের ওই উড়ন্ত বস্তুটা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বারবার বকবক করতে থাকেন। তাকে ইউনিভারসিটিতে লেকচার দিতে হবে পরের দিন সকালবেলা, দেরী হলে তিনি ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারবেন না।

এভাবেই শুরু হতে পারে গল্পটা।

–তার চেহারা সম্পর্কে কিছু মনে আছে?

–না।

–কিছুই না।

–তিনি একটা কালো ওভারকোট পরেছিলেন।

মি. বেকারম্যান, আপনি কি বলবেন যে, কীভাবে উটেনডরফে যাওয়া যায়? আপনি কি আমাকে নিয়ে যাবেন?

–আজ আমার ছুটির দিন, আমি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকব।

–আমি যদি আপনাকে টাকা দিই? দুশো মার্ক? চারশো মার্ক?

বেকারম্যানের মুখে হাসি–ঠিক আছে, চলুন। দিনটা আজ ভারী সুন্দর।

তারা দক্ষিণদিকে এগিয়ে গেলেন। গ্রাম্যপথ পার হলেন। লুজেনের দিকে, আহা, চোখ জুড়ানো দৃশ্যপট। রবার্ট তখন অন্য কথা ভাবছেন।

এবার সারেন অতিক্রম করার পালা। পথ চলে গেছে ইন্টারলাকেনের দিকে।

–আর কতদূর?

হানস বললে- আমরা এবার এসে গেছি।

এক ঘণ্টা ধরে গাড়ি চালানো হল।

হানস বলল- ওই পাশেই আমরা দেখতে পাব।

রবার্টের হৃদস্পন্দন দ্রুত হচ্ছে। তিনি এমন কিছু দেখতে চলেছেন, যা তার চেতনাকে অবাক করে দেবে।

গাড়িটা থানে চলে এল।

হানস বলল- ওইখানে।

রবার্ট নামলেন, হাইওয়ের ধারে।

–এই গাছেদের তলায়।

রবার্টের শরীরে উত্তেজনা চলুন, আমরা দেখে আসি। একটা ট্রাক এগিয়ে চলেছে। ট্রাকটা চলে গেল। রবার্ট এবং হানস রাস্তা পার হলেন। রবার্ট ওই বাস ড্রাইভারকে অনুসরণ করছেন। ঘন গাছের আচ্ছাদিত জায়গা। এখান থেকে হাইওয়ে দেখা যাচ্ছে না। তারা আরও ভেতর দিকে এগিয়ে গেলেন।

বেকারম্যান বলল- ওই তো, ওটা আছে।

না, ওই আবহাওয়ায় বেলুনটাকে দেখা গেল না, তার অবশেষ খণ্ডগুলিকে চোখে পড়ল।

.

০৮.

রবার্ট ভাবলেন, নাঃ, আমি বোধহয় সফলতা পাব না। হানস ওই ধাতব বস্তুর দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু, তার মুখে একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি। না-না, ঈশ্বরের দোহাই, এগুলো ছিল না।

-কোনগুলো?

বেকারম্যান মাথা নেড়ে বলল– এগুলোকে গতকাল আনা হয়েছে।

হয়তো ওই সবুজ পোশাক পরা লোকেরা এগুলো ফেলে দিয়েছে।

না, অরা কেউ বেঁচে ছিল না। তারা মরে গেছে।

–মরে গেছে?

কাজটা ভালোভাবে এগিয়ে চলেছে।

রবার্ট বেলুনের কাছে এগিয়ে গেলেন। ভালোভাবে পরীক্ষা করলেন। রিবাট অ্যালুমিনিয়াম এনভেলাপ। চোদ্দো ফুট ব্যাসযুক্ত। ঘন জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছে। সব কিছুকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, জেনারেল হিলিয়াড বলেছিলেন। তাহলে এগুলো কোথা থেকে এল?

রবার্ট চারদিকে ঘুরে বেড়াতে থাকলেন। ভিজে ঘাসের ওপর তার জুতোর চিহ্ন আঁকা হল। সামান্যতম সূত্র পাওয়া যায় কী? না, এই ধরনের বেলুন মাঝে মধ্যেই উড়িয়ে দেওয়া হয়। আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য। বছরের পর বছর এমন কাজ করা হচ্ছে এর মধ্যে অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।

ড্রাইভার তখনও বলে চলেছে- না, এগুলো পরে এসেছে, আমি বলতে পারি।

রবার্ট ঠিক করলেন, ভালোভাবে দেখতে হবে। আরও কাছে এগিয়ে গেলেন। ওপরে ওঠার চেষ্টা করলেন। একটা বস্তুকে হাতের ওপর নিলেন। হ্যাঁ, এর মধ্যে কী আছে?

–ভিজে হয়ে গেছে। রবার্ট বললেন। গতকাল বৃষ্টি হয়েছে, মাটি এখনও ভিজে।

রবার্ট হামাগুড়ি দিলেন। বেলুনের তলায় পৌঁছে গেলেন। এটা তো শুকনো থাকা উচিত।

পাইলট বলেছিলেন- গত রোববার এখানটা খুবই শুকনো ছিল। যেদিন বেলুনটা ধ্বংস হয় সারাদিন বৃষ্টি হয়, তারপর?

কী?

যখন আপনি ওই উড়ন্ত চাকিটাকে দেখতে পান, তখন বৃষ্টি ছিল কি?

বেকারম্যান বলল- না, একটা সুন্দর বিকেলবেলা।

সূর্য ছিল?

–হ্যাঁ, সূর্যের তাপ ছিল।

গতকাল বৃষ্টি হয়েছে?

–হুঁ।

তার মানে যদি বেলুনটা এখানে সারা রাত্রি থাকত, তার তলার মাটিটা শুকনো থাকত। অথবা সামান্য সাঁতসেঁতে থাকত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এটা একেবারে ভিজে গেছে। বাকি অঞ্চলের মতো।

–তার মানে আপনি কী বলতে চাইছেন?

–আমি বলতে চাইছি, কেউ এই বেলুনটাকে এখানে এনে রেখেছে। বৃষ্টি শুরু হবার পর। নাঃ, এই সম্ভাবনার অন্তরালে কী তথ্য লুকিয়ে রয়েছে।

–আপনি এ ব্যপারে এত উৎসাহী কেন বলুন তো?

রবার্ট ভাবলেন, হ্যাঁ, সত্যিই তো। তার মানে? সুইজারল্যান্ডের সরকার কি চাইছেন জায়গাটাকে সকলের চোখের আড়ালে রাখতে তাই এই প্রস্তুতি?

রবার্ট ভিজে ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলেন। চারপাশে ঘোরাঘুরি করলেন বোকার মতো।

হানস রবার্টের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল আপনি কোন পত্রিকার রিপোর্টার মশাই।

–ট্রাভেল অ্যান্ড লেজার।

বাঃ, আপনি আমার একটা ছবি নেবেন তো? অন্যেরা যেমন নিয়েছেন।

কী বললেন?

ফটোগ্রাফার আমার ছবি নিয়েছে।

রবার্টের মুখে বিস্ময় আপনি কার কথা বলছেন?

ফটোগ্রাফার। একজন ছবি নিয়েছে। তিনি বলেছেন, ছবির কপি পাঠিয়ে দেবেন। কোনো কোনো প্যাসেঞ্জারের হাতেও ক্যামেরা ছিল।

রবার্ট বললেন– দাঁড়ান-দাঁড়ান। ওই উড়ন্ত চাকির সামনে ছবি নেওয়া হয়েছে।

–আমি তো তাই বোঝাতে চাইছি।

ফটোগ্রাফার আপনাকে প্রিন্ট দেবেন বলেছেন?

–হ্যাঁ।

তার মানে ওনার কাছে নিশ্চয়ই আপনার নাম-ঠিকানা আছে?

–হ্যাঁ, না হলে উনি কী করে পাঠাবেন।

রবার্টের মনে হল, তার শরীরের ভেতর শীতল শিহরণ। এবার ব্যাপারটা অনেক সহজ হবে। সাতজন অচেনা অজানা পর্যটকের সন্ধানে ছুটে বেড়াতে হবে না। একজন ফটোগ্রাফার পাওয়া গেল।

–মি. বেকারম্যান, আপনি কেন তার কথা আগে বলেননি?

–আপনি তো খালি টুরিস্টদের সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন।

–তার মানে উনি ট্যুরিস্ট নন?

হানস মাথা নেড়ে বলল– না, তার গাড়িটা হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে ছিল। আকাশের ওই বস্তুটা দেখে ভদ্রলোক অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। উনি ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে শুরু করেন। তারপর ওই উড়ন্ত চাকির তলায় আমাদের সকলকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেন।

উনি ওনার নাম বলেছেন?

–না।

–ওনার সম্পর্কে কিছু মনে পড়ছে?

–হ্যাঁ, উনি আমেরিকার বাসিন্দা। কিংবা ইংলিশম্যান।

উনি গাড়িতে ছিলেন?

–হ্যাঁ।

উনি কোন্ দিকে গেলেন?

উদিকে, উনি বোধহয় বার্নে যাবেন। ওনার গাড়িতে কিছু সমস্যা ছিল।

রবার্ট বললেন–অনেক ধন্যবাদ, আপনার সাহায্য আমি মনে রাখব।

-ওই পত্রিকার প্রবন্ধটা আমাকে পাঠাবেন কিন্তু।

-হ্যাঁ, এই নিন আপনার টাকা। আপনার সাহায্যের জন্য আরও একশো মার্ক দিলাম। আমি কি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব?

তারা গাড়ির কাছে এলেন। বেকারম্যান দরজাটা খুলতে যাবে, সে রবার্টের দিকে তাকিয়ে বলল আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। পকেট থেকে এক টুকরো ধাতব বস্তু বের করল। সিগারেট লাইটারের মতো দেখতে। তার ভেতর একটা সাদা স্ফটিক রয়েছে।

–এটা কী?

–এটা আমি রোববার পেয়েছি।

রবার্ট জিনিসটার দিকে তাকালেন। কাগজের মতো হালকা, বালির মতো রং। এক দিকটা তীক্ষ্ণ। তার মানে ভেঙে ফেলা হয়েছে। এর একটা অংশ নিশ্চয়ই আছে। এটা কি ওই আবহাওয়া বেলুনের কোনো অংশ? নাকি উড়ন্ত চাকির?

–এটা হয়তো আপনার ভাগ্য পরিবর্তনে সাহায্য করবে।

বেকারম্যান টাকাটা তার ওয়ালেটে ভরে ফেলল। তারপর বলল- হ্যাঁ, এটা নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করবে।

.

কোথা থেকে কাজটা শুরু হবে? অজানা উড়ন্ত বস্তু সম্পর্কে রবার্ট অনেক প্রতিবেদন পড়েছেন। বেশির ভাগ বিশ্বাস করেননি। তাঁর কেবলই মনে হয়েছে, দুর্বল মানুষেরাই এর অস্তিত্বকে বিশ্বাস করে। কিন্তু এখন? ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হবে। হ্যাঁ, ধারাবাহিক গল্পের উন্মাদন। সত্যি সত্যি এমন অজানা কিছু বস্তু কি মহাকাশ থেকে আসে? না সবটাই আমাদের দুর্বল মনের কল্পনা?

.

০৯.

জেনেভাতে একটা সাংবাদিক সম্মেলন। সুইস সরকার এই সম্মেলন ডেকেছে। পঞ্চাশ জন সাংবাদিক হাজির আছেন। বাইরে উৎসাহী মানুষের ভিড়। টেলিভিশন থেকে অনেকে এসেছেন। রেডিও এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে। অন্তত বারোটি বিদেশী রাষ্ট্রের সংবাদ সংগ্রাহকেরা এসেছেন। তারা সকলে একসঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।

–আমরা জানতে পেরেছি, এটা নাকি আবহাওয়া বেলুন ছিল না।

–এটা কি ফ্লাইং সসার?

–এখানে কিছু অজানা অচেনা মানুষকে দেখা গেছে।

তারা কি বেঁচে আছে? সরকার কেন জনগণের কাছ থেকে সত্যটা গোপন করতে চাইছে।

প্রেস অফিসার তার গলা চড়িয়ে বললেন- ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়রা, আমাদের মধ্যে গোলমাল হচ্ছে। আমরা এই গোলমাল মেটানোর জন্য প্রেস কনফারেন্স ডেকেছি। আমরা অনেক সময় আকাশে উপগ্রহ দেখে থাকি, তারা ফুটতে দেখি। কিন্তু এই বিষয়ে যা বলা হয়, সেটা গুজবে ভরা। অনেকে বিশ্বাস করে, সত্যি সত্যি উড়ন্ত চাকি আছে। আমি জোরের সঙ্গে বলছি, সেদিন যে বস্তুটা আকাশ থেকে ভেঙে পড়ে সেটা ছিল একটা আবহাওয়া বেলুন। যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে যেতে পারেন।

পনেরো মিনিট কেটে গেছে। দুটো বাস ভরতি রিপোর্টার আর টেলিভিশন ক্যামেরাম্যানরা এগিয়ে চলেছেন উটেনডরফের দিকে। তারা ওই আবহাওয়া বেলুনের অবশিষ্ট অংশ দেখবেন। তারা নামলেন, ভিজে ঘাসের ওপর দিয়ে এগিয়ে গেলেন। চারপাশে ছড়ানো ছেটানো কত কিছু।

প্রেস অফিসার বললেন- এই হল আপনাদের সেই রহস্যাবৃত ফ্লাইং সসার। এটাকে ভেভি এয়ারবেস থেকে ছাড়া হয়েছে। আমি জোরের সঙ্গে বলছি, এমন কোনো উড়ন্ত চাকির সন্ধান পাওয়া যায়নি। আমাদের সরকার তাই এই বিষয় নিয়ে আর কোনো

আলোচনা করতে রাজী নয়। আমাদের সরকারের প্রধান এবং প্রথম সিদ্ধান্ত হল সত্য এবং তথ্যের ওপর আস্থা রাখা। যদি এই ব্যাপারে আমাদের হাতে নতুন কোনো তথ্য আসে, তাহলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে তা সকলের কাছে জানাব। যদি আর কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে...

তিনি তার কথা শেষ করলেন না।

.

১০.

ভার্জিনিয়া, এয়ারফোর্স বেস, নিরাপত্তার আবরণে মোড়া। বাইরে চারজন সশস্ত্র মানুষের প্রহরা। তারা সবদিকে তাকিয়ে আছেন।

অফিসাররা জানেন, এখন সময়টা বড়োই খারাপ। বিজ্ঞানী এবং ডাক্তারদের ওপর কাজের চাপ বাড়বে।

এ পর্যন্ত মাত্র তিনজন আগন্তুককে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ আগন্তুক সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাকে ব্রিগেডিয়ার ট্যাক্সটন অভিবাদন করলেন। এই ভদ্রলোকের হাতে নিরাপত্তার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

-আমিও ব্যাপারটা দেখার জন্য আগ্রহ বোধ করছি।

ভেতরের ঘরে যাত্রা শুরু হল। জেনারেল দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। বললেন এখানে আসুন।

জানুস চেম্বারের ভেতর ঢুকে পড়লেন। এই ঘরের একেবারে মধ্যিখানে ওই মহাকাশ যানটা রয়েছে। টেবিলের ওপর দুজন অচেনা মানুষের মৃতদেহ। একজন প্যাথোলজিস্ট শব্দ ব্যবচ্ছেদ করছেন।

জেনারেল ট্যাক্সটন তাকালেন। আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। এটা বোধহয় মূল মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ট্যাক্সটন বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

দুজন এসে ভালোভাবে মহাকাশ যানটা পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। আনুমানিক ৩৫ ফুট বাসযুক্ত। ভেতর দিকটা মুক্তোর মতো আকৃতির। বড়ো ছোটো হতে পারে এমন একটা সিলিং রয়েছে। তিনটে কৌচ আছে, চেয়ার আছে।

এখানে এমন কিছু আছে যা আমরা এখনও পর্যন্ত বুঝতে পারিনি। খুব আধুনিক কার্যপদ্ধতি। অপটিক্যাল পদ্ধতি আছে, লাইফস্ক্যান পদ্ধতি আছে। যোগাযোগের ব্যবস্থা, শব্দ বিশ্লেষণের ক্ষমতা। এই যন্ত্রগুলো দেখে আমরা অবাক হয়ে গেছি। কীভাবে এগুলো সম্ভব হচ্ছে, আমরা বুঝতে পারছি না।

জানুস প্রশ্ন করলেন- এখানকার অস্ত্রগুলো সম্পর্কে কিছু বলুন।

সবেমাত্র গবেষণা শুরু হয়েছে।

–কীভাবে শক্তি সরবরাহ হয়েছে?

–এখানে বোধহয় হাইড্রোজেন ভরে দেওয়া হয়েছে। হাইড্রোজেন থেকেই শক্তির উৎসটা পাওয়া গেছে। যে দুজন মানুষকে পেয়েছি আমরা, তাদের ওপর পরীক্ষা চলছে। তৃতীয় কৌচের ওপর আর একজন ছিল।

জানুস প্রশ্ন করলেন একজনকে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই তো?

–হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।

–দেখি,ওই আগন্তুকের চেহারা কেমন?

টেবিলের ওপর দুজনের শরীর, জানুস তাকিয়ে থাকলেন। অদ্ভুত রকমের দেখতে। মানুষের মতো, অথচ মানুষ নয়। মাথায় এতটুকু চুল নেই। চোখের পাতা নেই, চোখ দুটো পিংপং বলের মতো।

যে ডাক্তার শব ব্যবচ্ছেদ করেছেন, তিনি বললেন- একজনের হাত কেটে নেওয়া হয়েছে। রক্তের কোনো চিহ্ন নেই। একটা অদ্ভুত সবুজ পদার্থ আছে শিরার মধ্যে, বেশির ভাগটাই বের করা হয়েছে।

জানুস প্রশ্ন করলেন- সবুজ তরল পদার্থ?

ডাক্তার বললেন- এটা বোধহয় গাছপালা থেকে পাওয়া গেছে

। দুজন পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন।

–জানুস, এরা কি মৃত, না বেঁচে আছে, ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। হঠাৎ দেখা গেল কিছুটা সবুজ পদার্থ বেরিয়ে আসছে, হাতের মতো আকৃতি ধারণ করেছে।

–আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গিতে এরা মৃত, কিন্তু ওখানে মৃত্যুর সংজ্ঞা কী, আমরা এখনও জানি না। হয়তো এরা সুপ্ত অবস্থায় আছে।

জানুস অবাক হয়ে এই নতুন তৈরি হওয়া হাতটার দিকে তাকিয়ে আছে।

–তার মানে? এটা কি সুপ্ত অবস্থায় আছে? এখন প্রাণের স্পন্দন জেগেছে।

–হ্যাঁ, আরও কিছুক্ষণ দেখতে হবে।

.

গ্রিনহাউস ল্যাবোরেটরিতে নানা বিষয়ে গবেষণা চলছে। ওয়াশিংটন ডি সির বাইরে। তার দেওয়ালের ওপর লেখা আছে– এখানে এমন কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় যে, বাইরের কেউ জানতে পারবে না।

প্রফেসার র‍্যাকম্যান এই বিষয়টির দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি বললেন– চালর্স ডারউইন প্রথম প্রমাণ করেছিলেন যে, গাছেরাও চিন্তা করতে পারে। পরে বারব্যাঙ্ক এই ব্যাপারটা নিয়ে আরও আলোচনা করেন।

এটা কি সত্যি বলে মনে হয়।

-হ্যাঁ, অনেক বিজ্ঞানী এ বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তারা বলেছেন যে, মানুষের আবির্ভাবের অনেক বছর আগেও ফুলেরা এই পৃথিবীতে ছিল। তাদের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে।

অধ্যাপক র‍্যাকম্যান আরও বললেন- এই ঘরে যা কিছু আছে, সবই জীবন্ত। গাছেরা ভালোবাসতে পারে, ঘৃণা জাগাতে পারে, তাদের যন্ত্রণা আছে, উত্তেজনা আছে, ঠিক প্রাণীদের মতো। এমন কি জগদীশচন্দ্র বসু প্রমাণ করেছেন, তারা শব্দ শুনে চিনতে পারে। শব্দের দিকে আকর্ষিত হয়।

কীভাবে এই প্রমাণটা করা হয়েছে?

–আমি দেখাতে পারি। র‍্যাকম্যান টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে একটা পলিগ্রাফ মেশিন ছিল। র‍্যাকম্যান তাকে গাছের সঙ্গে যুক্ত করলেন। ওই পলিগ্রাফ মেশিনের সূচকটা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল। উনি বললেন, একটু দেখুন।

গাছের কানে কানে তিনি বললেন–মনে হচ্ছে, তুমি খুব সুন্দর, অন্য গাছেরা তোমার মতো নয়।

জানুস অবাক হয়ে দেখলেন– ওই সূচকটা একটু সরে গেছে।

প্রফেসার বললেন-তুমি নোংরা, তুমি কুৎসিত, তোমাকে মরতে হবে। তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?

সূচকটা কাঁপতে শুরু করল। সেটা ক্রমশ ওপর দিকে উঠছে।

জানুস বললেন- হায় ঈশ্বর, আমি তো বিশ্বাস করতে পারছি না।

র‍্যাকম্যান বললেন–হ্যাঁ, এই ব্যাপারগুলো আমাদের ভাবিয়ে তোলে। শেষ অব্দি আমরা বুঝতেই পারি না, মানুষ এবং উদ্ভিদের মধ্যে সত্যি কোনো তফাত আছে কিনা।

জানুস অবাক হয়ে সব কথা শুনতে থাকলেন। তিনি ভাবলেন- এখন ওই হারিয়ে যাওয়া মানুষটিকে নিয়ে ভাবতে হবে। পরক্ষণেই তার মনে হল, মানুষ অথবা অজানা কোনো জীবন্ত বস্তু কে তার খবর রাখে!

তিন নম্বর দিন

১১.

তিন নম্বর দিন, বার্ন, বুধবার, অক্টোবরের ১৭ তারিখ।

বার্ন হল রবার্টের অন্যতম প্রিয় শহর। শহরটা মস্ত বড়ো। অনেকগুলো সুন্দর মনুমেন্ট আছে। আছে পুরোনো পাথরের তৈরি বাড়ি। অষ্টাদশ শতাব্দীর স্মৃতিরেখা। সুইজারল্যান্ডের রাজধানী। বিশ্বের অন্যতম স্মরণযোগ্য শহর। বার্নে যারা বসবাস করে, তাদের স্বভাব চরিত্র একেবারে আলাদা। তাদের কথার মধ্যে একটা আভিজাত্য আছে। শান্ত প্রকৃতির। এর আগে রবার্ট বেশ কয়েকবার বার্নে এসেছিলেন। সুইজ সিক্রেট সার্ভিসের হয়ে কাজ করেছেন। তাদের হেডকোয়ার্টারে গেছেন।

রবার্ট এসে পনেরোটা ফোন করলেন। কোথায় ফটোগ্রাফারের গাড়িটা আছে সেটা বের করতে হবে। সেই গ্যারাজের সামনে পৌঁছে গেলেন। মেকানিকের সঙ্গে কথা হল। ভদ্রলোকের নাম ম্যানডেল। চল্লিশ বছর বয়স। চেহারাটা রোগা। বুঝতে পারা যাচ্ছে, যথেষ্ট বিয়ার গেলেন।

রবার্ট বললেন– শুভ সন্ধ্যা।

–আমি কী করতে পারি?

–আপনার সঙ্গে কথা আছে।

দশ মিনিট কেটে গেছে।

সকালে আপনি ফোন করেছিলেন? কী হয়েছে বলুন তো? কোনো সমস্যা?

রবার্ট বললেন– না, আমি একটা সার্ভে করছি। আমি একজন ড্রাইভারের সন্ধান করছি।

–তাহলে অফিসে আসনু। গত রোববারের গাড়িটার কথা বলছেন তো?

ম্যানডেল ফাইল ক্যাবিনেট থেকে একটা ফাইল বের করলেনহ্যাঁ, ঠিকই বলছি।

ম্যানডেল একটা কার্ড নিয়ে বললেন, যে ড্রাইভার উড়ন্ত বস্তুর ছবি তুলেছিল?

–হ্যাঁ, আপনি কি ওটা দেখেছেন?

–হ্যাঁ।

–কেমন দেখতে বলতে পারেন?

ম্যানডেল বললেন– জীবন্ত বলে মনে হচ্ছিল। ওখান থেকে আলো বেরোচ্ছিল। প্রথমে নীল, তারপর হলুদ, তারপর সবুজ। অপূর্ব, কথায় বর্ণনা করা যাবে না। ভেতরে ছোটো ছোটো প্রাণীরা বসেছিল। মানুষ নয় কিন্তু।

কজন?

দুজন।

জীবন্ত?

মৃত বলে মনে হচ্ছিল। আমি বন্ধুদের বলেছি, তারা হাসাহাসি করেছে। আমার বউ ভেবেছে, আমি বোধহয় মাতাল হয়ে পড়েছিলাম। আমি কী দেখেছি, তা বোঝাতে পারব না।

–গাড়িটার কথা এবার বলুন।

–গাড়িটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বিয়ারিং পুড়ে গিয়েছিল।

ড্রাইভারকে টাকা দিয়েছিলেন কীভাবে?

–আমি ক্যাশ টাকা দিয়েছি।

সুইস ফ্রাঙ্কে।

না, স্যার, পাউন্ডে।

–আপনি কি ঠিক বলছেন?

–হ্যাঁ। আমি বলছি।

মি. ম্যানডেল, ওই গাড়িটার লাইসেন্স নাম্বার দেখা যাবে?

ম্যানডেল বললেন–হ্যাঁ, ওটা ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। জেনেভা থেকে নেওয়া হয়েছিল।

লাইসেন্স নাম্বারটা দেবেন?

–কেন বলুন তো?

নাম্বারটা লিখে উনি রবার্টের হাতে তুলে দিলেন।

–এটার সঙ্গে উড়ন্ত চাকির কী সম্পর্ক?

রবার্ট বললেন- না, আমি ইন্টারন্যাশনাল অটো ক্লাব থেকে এসেছি। আমাদের ক্লাব নতুন ট্রাকের ওপর একটা গবেষণা করছে।

রবার্ট গ্যারাজ থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তার মানে? দুজন মৃত বিদেশীকে পাওয়া গেল। জেনারেল হিলিয়াড কি মিথ্যে কথা বলেছেন? রবার্টকে আবিষ্কার করতে হবে, কেন একটা উড়ন্ত চাকি ধ্বংস হয়ে গেছে।

তার মানে? একটাই সম্ভাবনা হতে পারে, সেই ভয়ঙ্কর সম্ভাবনাটার কথা ভেবে রবার্টের রক্ত হিম হয়ে গেল।

.

১২.

বিশাল ওই বড়ো উড়োজাহাজটা। মনে হচ্ছে, সেটা বোধহয় এখন একেবারে নিস্পন্দ। বাইশ হাজার মাইল ঘণ্টায় উড়তে পারে পৃথিবীর গতির সাথে পাল্লা রেখে। দুজন সেখানে বসে আছে। মনিটরের ভেতর একটা গ্রহের ছবি দেখা যাচ্ছে। গ্রহটার নাম বসুন্ধরা। তারা অনেকগুলো ছবি তুলেছে।

এইসব অদ্ভুত দর্শন প্রাণীদের দেখতে অবাক লাগে। তারা নীচের দিকে তাকাল। ধু ধু জলরাশি। বেইট বেলিয়ারির চোখে দেখা গেল। আমাজন বৃষ্টি-অরণ্য। একটির পর একটি অঞ্চল।

তারা টেলিপ্যাথির মাধ্যমে কথা বলে থাকে।

অনেক নীচে এই পৃথিবীর প্রান্তর। রবার্ট জেনারেল হিলিয়াডকে ফোন করলেন।

–আফটারনুন কমান্ডার, রিপোর্ট করার মতো কিছু আছে কি?

–ওই আবহাওয়া বেলুন সম্পর্কে, মনে হচ্ছে, ওটা বোধহয় একটা উড়ন চাকি।

–হ্যাঁ, আমি জানি। আমি সব কথা আগে বলতে পারিনি, অসুবিধা ছিল।

কিছুক্ষণের নীরবতা।

জেনারেল হিলিয়াড আবার বললেন– আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি কমান্ডার, তিন বছর আগে আমাদের সরকারের সাথে একটা লড়াই হয়েছিল। ওই উড়ন চাকিগুলো ন্যাটো এয়ার বেসে এসেছিল। তখন থেকে আমরা যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করছি।

রবার্টের রক্ত জমাট হয়েছে ওরা কী বলেছে?

–ওরা আমাদের ধ্বংস করতে চাইছে।

–কেন?

জানি না, ওরা বোধহয় আমাদের ওপর প্রতিশোধ নেবে। ওরা এখানে এসে আমাদের দখল করবে। আমরা সকলেই ওদের দাস হয়ে যাব। এই ব্যাপারটা থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে হবে।

রবার্ট অবাক হয়ে জানতে চাইলেন– সব মানুষের কাছে এই ভয়ংকর খবরটা পৌঁছে দেওয়া তোতা উচিত।

কিছুক্ষণ নীরবতা– ব্যাপারটা ওভাবে ভাববেন না কমান্ডার, ১৯৩৮ সালে অর্সান নামে এক তরুণ অভিনেতা একটা রেডিও ব্রডকাস্ট করেছিল। নাম দিয়েছিল বিশ্বের যুদ্ধ। অন্য জায়গা থেকে কিছু মানুষ এসে পৃথিবী দখল করেছে এমন কথা বলা হয়। কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। আমেরিকার সর্বত্র মানুষ ভীষণ ভয় পেয়েছে। তারা বাড়ি থেকে পালাবার চেষ্টা করছে। টেলিফোনে একটার পর একটা শব্দ ভেসে আসছে। হাইওয়েগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। অনেকে মরে গেছে। সম্পূর্ণ বিশৃংঙ্খলা

অবস্থা। তাই আমাদের শক্তিশালী হয়ে উঠতে হবে। সবশেষে আমরা মানুষকে জানাব সবকিছু। তাই আপনি দেখুন ওই প্রত্যক্ষদর্শীদের পাওয়া যায় কিনা। তাদের নিরাপত্তা দিতে হবে। তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

রবার্ট, বুঝতে পারলেন।

–হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি।

–শুনলাম আপনি নাকি একজনের সঙ্গে কথা বলেছেন।

–হ্যাঁ দুজনকে পেয়েছি।

–নাম?

–হানস বেকারম্যান, তিনি হলেন ট্যুর বাসের ড্রাইভার। উনি কাপেলে থাকেন।

–দ্বিতীয় জন?

–ম্যানডেল, বার্নে তার একটা গ্যারেজ আছে। তিনিও দেখেছেন।

–আর কারো নাম পাওয়া গেছে?

–এখনও পাইনি, চেষ্টা করছি। আশা করি কয়েকদিনের মধ্যেই সফল হব।

রবার্ট রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। তার মন এখন চঞ্চল। উড়ন চাকির ব্যাপারটা সত্যি? মহাকাশের অতিথিরা সত্যি? সাংঘাতিক।

রবার্টের মনে একটা অদ্ভুত চিন্তা। জেনারেল হিলিয়াড তাকে এই কাজটা করতে দিয়েছেন, কিন্তু সবকিছু বলেননি কেন? ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে হবে।

.

অ্যাভিসেন্ট্রাল কার কোম্পানীর অফিস। জেনেভা শহরের বুকে অবস্থিত। রবার্ট অফিসে ঢুকে পড়লেন। ডেস্কের ওধারে এক মহিলা বসেছিলেন। বলুন কী করব?

রবার্ট একটুকরো কাগজ দেখালেন, তাতে লাইসেন্স নম্বরটা দেওয়া আছে।

–এই গাড়িটা আপনারা গত সপ্তাহে ভাড়া দিয়েছিলেন, কে ভাড়া নিয়েছিল, জানতে পারি কি?

কণ্ঠস্বরে রাগ এবং অসহিষ্ণুতা।

ক্লার্ক বললেন আমি দুঃখিত, এই খবর আমি দেব না।

-কেন? আমি একটা মস্ত বড়ো ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।

–আমি বুঝতে পারছি না কী সমস্যা হয়েছে?

–আমি সমস্যাটা বুঝিয়ে বলছি। গত রোববার এই গাড়িটা হাইওয়ের ওপর দিয়ে ছুটে গিয়েছিল। অনেক ক্ষতি হয়েছে। কোনো রকমে লাইসেন্স নম্বরটা আমি পেয়েছি। লোকটা পালিয়ে গেছে।

ক্লার্ক রবার্টের দিকে তাকিয়ে বললেন- ঠিক আছে, আমি দেখছি।

উনি ঘরের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত বাদে ফিরে এলেন। উনি বললেন- ইঞ্জিনে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টের কথা তো লেখা নেই।

আমি এটা রিপোর্ট করে দিচ্ছি। আপনার কোম্পানীকে আমি এইজন্য দায়বদ্ধ করব। আমার গাড়িটার ক্ষতি হয়েছে, আপনারা কিন্তু তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন। আমারটা একেবারে নতুন পর্সে গাড়ি, দেখা যাক আমি শেষ পর্যন্ত কী করতে পারি।

–আমি দুঃখিত, কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টের কথা বলা হয়নি। আমরা তার দায়িত্ব নেব কেন?

-দেখুন, আমি আপোসে ব্যবস্থা করতে চলেছি। আমি আপনার কোম্পানীকে দায়বদ্ধ করব না, ওই মানুষটা যদি ড্যামেজের টাকা দিয়ে দেয়, তাহলেই আমি সন্তুষ্ট। আমার গাড়িটা একেবারে তুবড়ে গেছে। আমি পুলিশকে ডাকতে পারতাম। ওই লোকটির নাম আর ঠিকানা আমাকে দিন। আমি ওর সঙ্গে সরাসরি কথা বলব। এটা আমাদের ব্যাপার, আপনি কেন নাক গলাতে আসছেন?

ক্লার্ক কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন। তারপর বললেন– আচ্ছা, আমি নাম দিচ্ছি। ওর নাম লেসলি।

.

–ঠিকানা?

–২১৩, ক্লোক রোড, লন্ডন।

উনি তাকালেন– আপনি ঠিক বলছেন আমাদের কোম্পানীকে কোনো ঝামেলায় জড়ানো হবে না?

-না, আমি এক কথার মানুষ। এটা আমার আর লেসলির মধ্যে ব্যক্তিগত সংঘাতের ব্যাপার।

কমান্ডার রবার্ট বেলামি এবার সুইস এয়ার ফ্লাইটে চলেছেন লন্ডনের দিকে।

.

অন্ধকারের উনি একা বসে আছেন। সবকিছু ভাবার চেষ্টা করছেন।

টেলিফোনের শব্দ। –ডেনস কথা বলছি।

–ডেনস, জেনারেল ইলিয়াট।

বলে যান।

কমান্ডার বেলামি দুজন প্রত্যক্ষদর্শীকে সনাক্ত করেছেন।

বাঃ, কাজটা ভালোভাবেই এগোচ্ছে।

–হ্যাঁ।

কমান্ডার এখন কোথায়?

–উনি লন্ডনে আছেন। উনি তিন নম্বর প্রত্যক্ষদর্শীকে সনাক্ত করতে চলেছেন।

আমি কি সবকথা বলে দেব? খবর দিতে থাকলেন। নোভাবেড নিশ্চয়ই এই ঘটনাটার কথা জানে।

–আমি সব বুঝতে পারছি স্যার। এবার ফ্ল্যাশ আলো জ্বলে উঠল, কেবল খালি সংবাদ পাঠাচ্ছে।

.

১৩.

মধ্যরাত, ইটেনডক থেকে পনেরো মাইল দূরবর্তী ছোট্ট একটা ফার্ম হাউস। সেখানে ন্যাগিন্সের পরিবারের সকলে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যা তারা ভাবতেও পারেনি। বড় ছেলেটি আকাশে একটা হলুদ আলোর বিচ্ছুরণ দেখতে পেয়েছে। তাড়াতাড়ি সে ছুটে এসেছে, আলোটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

উঠোনের ওপর জার্মান কুকুরটা বিকট স্বরে ডাকতে আরম্ভ করেছে। বয়স্ক ভদ্রলোক সেখানে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির সব আলো নিভে গেল। টেলিফোনে কথা বলার চেষ্টা করলেন, লাইনটা ডেড হয়ে গেছে।

বেশ কিছুক্ষণ আলোগুলো নেভানো ছিল। তার মনে হল, এক সুন্দরী মহিলা বোধহয় সামনে দিয়ে হেঁটে চলেছে।

.

১৪.

জেনেভা, একটা বেজেছে।

সরকারী মন্ত্রী হেড কোয়ার্টারে বসে আছেন। সুইস ইনটেলিজেন্স এজেন্সির অফিসে। কেবল ডিরেক্টর নানা কাজে ব্যস্ত আছেন।

হানস বেকারম্যান এবং ফিচ ম্যানডেল, একটা খবর ভেসে এল। এখনও কোনো সমস্যা হয়নি, গ্রেট মিনিস্টার, আমি দেখছি।

–হ্যাঁ, এখনই চেষ্টা করো।

.

পরের দিন সকালবেলা, হানস বেকারম্যানের পেটে যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। নাঃ, ওই রিপোর্টারের নিকুচি করেছে। টাকাটা না দিলে আমি বোধহয় এমনভাবে খেতাম না। ওই ম্যাগজিনগুলো নিয়ে কী হবে?

উনি কী করবেন বুঝতে পারছেন না। হানস গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবছে। পথে এক মহিলার সাথে দেখা হল। মহিলা বোধহয় গাড়িতে লিফট চাইছে। বয়েস কম, দেখতে সুন্দরী। হানস রাস্তার ধারে গাড়িটা থামাল। মহিলা ক্রমশ এগিয়ে আসছে।

হানস বলল– আমি কি করে সাহায্য কবব? কাছে আসতে বুঝতে পারল, ও আরও সুন্দরী।

–আমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে লড়াই হয়েছে। সে আমাকে এখানে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে।

ব্যাপারটা খুবই খারাপ।

–আপনি কি আমাকে জুরিখ পর্যন্ত নিয়ে যাবেন?

–উঠে আসুন, উঠে আসুন।

ফিচ গাড়ির দরজা খুলে দিল। মহিলা উঠে পাশে বসল।

–অনেক ধন্যবাদ। আমার নাম কাবেজ।

—আমি হানস।

–হানস, আপনি না থাকলে কী হত বলুন তো?

–আমার তো সব কিছু স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। আপনার মতো এক সুন্দরী মহিলা আমার পাশে বসে আছে।

কিন্তু, আমি তো ভালো লোকের হাতেই এসে পড়েছি।

হানস অবাক হয়ে চোখের দিকে তাকাল।

–আমার মনে হয় সত্যিই আপনি খুবই সুন্দর।

মুখে হাসি এই কথাটা কখনও আমার বউকে বলবেন না যেন।

—ও আপনি বিবাহিত, একটু হতাশার ছাপ। কেন সুন্দর পুরুষরা সকলে বিবাহিত হয়। আপনাকে খুব বুদ্ধিমান বলে মনে হচ্ছে।

মেয়েটি আবার বলল, বয়ফ্রেন্ডের কথা মনে হচ্ছে। তার স্কার্ট বেশ খানিকটা উঠে গেছে। উরুর অনেকটা প্রকাশিত। হানস সে দিকে তাকাল।

মেয়েটি বলে চলল–আমি তো বয়স্ক লোককেই বেশি পছন্দ করি। আমি জানি বয়স্ক লোকেরা তরুণদের থেকে আরও বেশি যৌন আবেদনময় হয়ে ওঠে। মেয়েটির মুখে হাসি। –হানস, সেক্সের খেলা খেলতে আপনার কেমন লাগে?

গলা খাঁকারি দিয়ে হানস বলল- হ্যাঁ, এতো স্বাভাবিক ব্যাপার।

-হ্যাঁ, তাই তো দেখছি। আমি কিছু কথা কি আপনাকে বলব? আমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে ঝগড়া হয়েছে। ওকে আমি সহ্য করতে পারছি না। আমি কি আপনাকে ভালোবাসা দেব?

হানস বুঝতে পারছে না ভাগ্য তার এত সহায়ক হবে। মেয়েটি তার উরুতে থাপ্পড় মেরে বলল- সত্যিই আমি এমন ভালোবাসব আপনি কোনো দিন ভুলবেন না।

আঃ, ভারী সুন্দর শরীর আর স্বাস্থ্য।

হানস বলল- আমাকে তো কাজ করতে হবে। অনেক কাজ আছে।

মাত্র কয়েক মিনিট লাগবে। এই রাস্তাটা অরণ্যের ভেতর চলে গেছে। চলুন না সেখানে আমরা চলে যাই।

হানস ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। নিঃশ্বাস গরম হচ্ছে।

–আচ্ছা, আমি এখনই যাচ্ছি।

হানস গাড়িটাকে ঘুরিয়ে নিল, হাইওয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। ছোট্ট একটা রাস্তা চলে, গেছে ঘন বনের মধ্যে। এই দিকে কোনো লোকের নজর পড়ে না।

মেয়েটি হানসের উরুতে হাত দিয়ে বলল আপনার পা দুটো খুবই শক্তিশালী।

বেকারম্যান বক্তব্য রাখল- আমি একসময় দৌড়বীর ছিলাম।

-দেখি আপনার ট্রাউজার খুলুন তো।

সে সঙ্গে সঙ্গে বেল্টে হাত দিল। প্যান্টটা খুলে ফেলল।

–কী বিরাট! হানসের গলায় গোঙানি।

–আমি কি এখানে একটা চুমু খাব?

–হ্যাঁ, হানসের মনে হল, বউ কিন্তু এভাবে ওই পুংদন্ডটাকে কখনও আদর করেনি। বেকারম্যান দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চোখ বন্ধ করল। সুন্দর হাল্কা হাত তার পুংদন্ডে খেলা করছে। তার কেবলই মনে হচ্ছে, কী যেন ঘটে যাচ্ছে। সুখ, আর সুখ। কিন্তু হঠাৎ, সূঁচের পরশ। সামান্য বেদনা।

সমস্ত শরীরটা শক্ত হয়ে গেছে। চোখ উল্টে গেছে। সে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। মেয়েটি দেখল, হা, বেকারম্যান বোধহয় কথা বলতে পারছে না। মেয়েটি গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। ওই শরীরটা প্যাসেঞ্জার সীটে ফেলে দিল। তারপর গাড়িটাকে চালিয়ে হাইওয়ের একধারে নিয়ে এল। এখান থেকেই পাহাড়ের পথটা শুরু হয়ে গেছে। রাস্তাটা ফাঁকা হওয়া অবধি সে অপেক্ষা করল। গাড়ির দরজাটা খুলল। গ্যাস ফেডালে চাপ দিল। গাড়িটা চলতে শুরু করেছে। সে বাইরে চলে এল। দাঁড়িয়ে থাকল, গাড়িটা ধীরে ধীরে

উপত্যকা থেকে গড়িয়ে পড়ছে। পাঁচ মিনিট কেটে গেছে, একটা কালো লিমুজিন এসে থেমেছে। প্রশ্ন করছে- কোনো সমস্যা?

না, কোনো সমস্যা নেই।

.

ফিচ ম্যানডেল তার অফিসে বসে ছিল, এবার গ্যারেজটা বন্ধ করতে হবে। দুজন লোক এসেছে।

সে রেগে গিয়ে বলল– এখন বন্ধের সময়। এখন আর হবে না।

একজন বলল- আমাদের গাড়িটা হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে। একটা লোক পাওয়া যাবে?

–আমার বউ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আজ একটা নেমতন্ন আছে। আপনি বরং অন্য কোনো গ্যারেজ দেখুন।

আগন্তুকদের একজন বলল- আমি দুশো ডলার দিতে পারি। গাড়িটা এক্ষুনি সারিয়ে তুলতে হবে।

অন্যজন বলল- না, ওকে একেবারে তিনশো করে দাও।

ওরা ভেতরে ঢুকে গেল। বলল- হ্যাঁ, আপনার যন্ত্রপাতিগুলো চমৎকার।

ম্যানডেলের মুখে হাসি তা যা বলতে, আমি অনেক কষ্টে গ্যারেজটা তৈরি করেছি।

–তাহলে? একটু চলুন না, কতক্ষণ আর লাগবে, আধ ঘন্টার মধ্যে হয়ে যাবে।

ম্যানডেল ভাবতেই পারছে না, তিনশো ডলার! এত টাকার হাতছানি? সে যাবার জন্য তৈরি হল, সঙ্গে সঙ্গে একজন আগন্তুক তাকে ধাক্কা দিল। পাশেই হাইড্রোলিক মেশিনটা রয়েছে। ধাক্কা সামলাতে না পেরে ম্যানডেল মেশিনের তলায় পড়ে গেল। অবাক হয়ে সে দেখল, মেশিনটা ধীরে ধীরে তার ওপর নেমে আসছে। শেষ পর্যন্ত বাধা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল সে, কিন্তু সফল হয়নি। একটু বাদে একটা আর্তনাদ বাতাসে মিলিয়ে গেল। শরীরটা রক্তাক্ত হয়ে গেছে।

দুই আগন্তুক সঙ্গে সঙ্গে গ্যারেজ থেকে চলে গেল।

দুটি কেবল গ্রাম সঠিক জায়গায় পৌঁছে গেল। তার মানে? দুজনকেই খতম করা সম্ভব হয়েছে।

.

অটোয়া, কানাডা। রাত বারোটা। ড্যানসে বারোজনের সঙ্গে কথা বলছেন।

ভালোই এগিয়েছি আমরা। দুজন প্রত্যক্ষদর্শীর কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেছে। কমান্ডার এখন তৃতীয় জনের সন্ধানে মগ্ন আছেন।

–আর কোনো খবর আছে? ওই ইটালীয় সম্পর্কে?

–না, খবর থাকলে সঙ্গে সঙ্গে দেব।

–আরও তাড়াতাড়ি করতে হবে, বিপদের গন্ধ পাচ্ছি যেন।

অচেনা কণ্ঠস্বর।

না একসপ্তাহ সময় দিন, আটচল্লিশ ঘণ্টা বাদে আবার দেখা হবে কেমন?

.

১৫.

চতুর্থ দিন, লন্ডন, বৃহস্পতিবার, ১৮ অক্টোবর।

লেসলির রোল মডেল হল রবীন রিক। এক বিখ্যাত মানুষ। লেসলি এই ভদ্রলোকের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানের ওপর নজর রাখে।

মা একদিন বলেছিল- তুমি তো পৃথিবীর সব কথা শুনে নিয়েছ।

এই ছোটো ছেলেটি যখন শুতে যায়, তখনও সেই কথাই ভাবতে থাকে। হ্যাঁ, সমস্যা, দেখা দিয়েছে। কী জন্য? সে তার খবর রাখে না। ধীরে ধীরে দিন কেটে যাচ্ছে, অনেকের কথা মনে পড়ছে। সে জানত, এইটুকু চেহারা নিয়ে অভিনয় করা সম্ভব না।

পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি, মনের ভেতর সব সময় একটা কষ্ট। ভাবল, ডাস্টির সুখ, ডাস্টিং হকম্যান, পিটার কক, সকলেই তো বেঁটে।

লেসলি কী কাজে দেবে? শেষ পর্যন্ত অনেক ভাবতে ভাবতে সে ঠিক করল, ক্যামেরাম্যান হয়েই জীবনটা কাটাতে হবে। ফটো তোলার ব্যাপারটা খুব সহজ। যে কোনো লোক তা করতে পারে। সত্যিকারের ফটো তুলতে গেলে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। অনেক বুদ্ধি দিতে হয়। শেষ অবধি লেসলি এই ব্যাপারটা আরও ভালো করে রপ্ত করেছিল। সে জানে, যে কোনো ভালো মুখের অন্তরালে ভালো ফটোগ্রাফার থাকে। মায়ের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে লেসলি তার ফটোগ্রাফি ব্যবসাটা শুরু করে দিল।

মা একদিন তাকে বলেছিল– কম করে শুরু করলে, স্বপ্নটা থাকবে বিরাট। লেসলি সেই আপ্ত বাক্য মেনে চলেছে। সে ছোটো ছোটো কাজ করতে থাকে। ফটোগ্রাফিতে তার কোনো বুদ্ধি ছিল না। প্রথম প্রথম সে যা পেত তারই ছবি তুলত। ছবিগুলো বিভিন্ন পত্রিকায় পাঠাত। বেশির ক্ষেত্রে সেগুলো ফিরে আসত। লেসলি নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিত। পৃথিবীর বিখ্যাত সব মানুষকেই এভাবে পরাজয়ের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। সে জানত, একদিন তার কথা সকলের মুখে মুখে ফিরবে।

হঠাৎ একদিন একটা সুযোগ এল। তার এক মাস ব্রিটিশ পাবলিশিং ফার্মের হয়ে কাজ করতেন। হাভার্ড কলিন্স। তিনি এসে একটা প্রস্তাব দিলেন। সুইজারল্যান্ডের ওপরে কপিটেবিল বই প্রকাশ করতে হবে।

-ওরা এখনও ফটোগ্রাফারের কথা চিন্তা করেনি। লেসলি, তুই যদি এখনই সুইজারল্যান্ড যেতে রাজি থাকিস, তাহলে একটা ভালো কাজ পাবি।

লেসলি ক্যামেরা নিয়ে চলল সুইজারল্যান্ডের দিকে। সে জানত, এই সুযোগটা হাত ছাড়া করা উচিত হবে না। শেষ পর্যন্ত বোকার আমার বুদ্ধির তারিফ করতে চলেছে। সে একটা গাড়ি ভাড়া করল জেনেভাতে, সমস্ত দেশটা ঘুরে বেড়াল। নানা দৃশ্যের ছবি তুলল। আহা, সুন্দর ঝরনা, তুষার ঢাকা এক একটা পাহাড়চূড়া। সূর্যাস্তের এবং সূর্যোদয়ের ছবি। চাষীরা চাষ করছে, তারপর সে তার জীবনধারা পাল্টে ফেলল। সে তখন পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। মোটরের গোলমাল দেখা দিল। হাইওয়ের ধারে দাঁড়িয়ে আছে, মনে ঘৃণা। সবসময় আমার বেলা এই ঘটনা ঘটে কেন? বসে আছে।

সে গ্যাসোলিন ট্রাকের দিকে তাকাল একটা লিফট পাওয়া যাবে? আমাকে কোনো গ্যারেজে নিয়ে যেতে পারবে?

ট্রাক ড্রাইভার মাথা নেড়ে বলল–না, আজ রোববার, আজ তো এখানে কোনো গ্যারেজ খোলা নেই। আপনাকে বারন পর্যন্ত যেতে হবে।

বারন? পঞ্চাশ কিলোমিটার?

ট্রাক ড্রাইভার বলল না, রোববার ওখানে ছাড়া কিছুই পাবেন না এখানে।

সে ট্রাক চালিয়ে দিল।

–ঠিক আছে, আমি বারন যেতে চাইছি। কিছু কি করা যাবে?

–দেখা যাক, কোনো ড্রাইভারকে পাই কিনা।

লেসলি তাকিয়ে আছে, না, কেউ আমাকে সাহায্য করছে না। অনেক টাকা খরচা হয়ে গেছে, ছবি তুলতে। এখন আমাকে গ্যারেজের পেছনে টাকা ঢালতে হবে। দু ঘণ্টা সময় লাগবে, তারপর হয়তো সাহায্যকারী হিসেবে কেউ আসবে।

গাড়িটাকে ট্রাকের সঙ্গে বাঁধা হল। হঠাৎ আকাশে আলোর শিখা। বিস্ফোরণের শব্দ। সে অবাক হয়ে তাকাল, আকাশ থেকে উজ্জ্বল বস্তু খসে পড়ছে। এখানে একটা টুর বাস দাঁড়িয়ে ছিল। কিছুক্ষণ আগে সেটা এসে থেমেছে। পর্যটকরা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। লেসলি একটু চিন্তা করল। একবার ভাবল ছবি তুলবে। তারপর ভাবল না চলেই যাওয়া ভালো। অবাক হয়ে গেছে সে। কী হচ্ছে বুঝতে পারছে না। অবাক বিস্ময়ে সে ওই উড়ন্ত চাকির দিকে তাকিয়ে থাকল। অনেক দিন থেকেই সে উড়ন্ত চাকির গল্প শুনেছে। এরা যে আছে তা বিশ্বাস করেনি। এখন বিশ্বাস করতে বাধ্য হল।

পর্যটকেরা তার চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। বিরাজ করছে নীরবতা। তার পাশের মানুষটি অজ্ঞান হয়ে গেল। আরেকজন বমি করতে শুরু করেছে। এক বৃদ্ধ যাজক ছিলেন। তিনি জপের মালা জপছেন। কেউ বলল– এটা তো উড়নচাকি।

লেসলি বর্তমানের বুকে ফিরে এসেছে। একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে চলেছে। আমি কি ছবি তুলব? এমন ছবি, শতাব্দীতে যা একবারও পাওয়া যায় না। পৃথিবীর কোনো পত্রিকা

কিংবা সংবাদপত্রে কি এই ছবি বাতিল বলে গণ্য হবে? সুইজারল্যান্ডের ওপর কপি টেবিল বুক? হ্যাঁ, এই ছবিটা সকলকে অবাক করে দেবে।

ভাগ্য খুলে গেল। সে ভাবল, এই ফটোগুলো আমি সবকাগজে কাছে। বেচাতে পারব। লন্ডন টাইমস, সান, মের, মিরার ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট কাগজ। বিদেশেও পাঠাতে পারব। প্যারিস অথবা অন্য কোথাও।

তার মন তখন আনন্দে লাফাচ্ছে। সে চিন্তা করতে গিয়ে বেশ কিছুটা সময় নষ্ট করল। তারপর ছবি তুলতে শুরু করল। কাউকে এই কথা বলল না।

এবার গাড়িটা যাত্রা করতে শুরু করবে।

লেসলি ক্যামেরার জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছে।

দুজন হাইওয়ের ওপর চলে গেল। লেসলি ট্যুরিস্টদের দিকে তাকিয়ে বলল– ক্ষমা করবেন।

সে তার ফোকাসটা ঠিক করল। উড়নচাকির ছবির সাথে ওই মানুষগুলোর ছবি? কেমন হবে ব্যাপারটা? সে কালো সাদায় ছবি নিল। রঙীন ছবিও তুলল। যতবার সাটারের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, লেসলি ভাবল, দশলক্ষ পাউন্ড, আরও দশলক্ষ পাউন্ড।

যাজক তার কাছে এসেছেন। তিনি বললেন- এটা কি শয়তানের মুখ?

শয়তান! ওর তো অন্তরুদ্ধ মুখ দেখতে পাচ্ছি। এই প্রথম উড়ন্তচাকির অস্তিত্ব প্রমাণিত হতে চলেছে। পরক্ষণেই লেসলির মনে হল, ওরা যদি আমার কথা বিশ্বাস না করে, তাহলে কী হবে?

ওখানে নজন প্রত্যক্ষদর্শী জুড়িয়ে আছে। সে তাদের দিকে তাকাল। বলল– ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়রা, আপনারা কি এখানে ছবি নেবেন, পাশাপাশি দাঁড়ান। আমি সকলকে একটা করে প্রিন্ট পাঠাব, পয়সা নেব না।

সাংঘাতিক উত্তেজনা। প্যাসেঞ্জাররা পাশাপাশি ছড়িয়ে পড়ল। ওই উড়নচাকির ধ্বংসাবশেষের সামনে।

পাদ্রী সাহেব দূরে চলে গেলেন। তিনি বললেন না, এটা শয়তানের হাত। আমি ওখানে যাব না।

কিন্তু লেসলির দরকার ছিল ওই যাজককে। উনি থাকলে ব্যাপারটা আরও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে।

লেসলি বলল– একবার এসে দাঁড়ান। তাহলে ভালোই হবে।

একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়াবেন। শেষ পর্যন্ত যাজক এসে গেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা ছড়িয়ে গেল, ভারী ভালো হয়েছে। দাঁড়িয়ে থাকুন।

সে গোটা ছয়েক ছবি তুলল, পেন্সিল এবং কাগজ নিয়ে বলল- আপনাদের নাম ঠিকানা দিয়ে দিন। সকলকে প্রিন্ট পাঠাব।

সে কাউকেই প্রিন্ট দেবে না। খালি লোকগুলোকে জানিয়ে রাখতে চাইছে। খবরের কাগজ বিশ্বাস না করলে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে।

হঠাৎ সে দেখল, কজনের হাতে ক্যামেরা আছে। কিন্তু সে আর কোনো ক্যামেরাম্যানকে এখানে অনুমতি দেবে না। তা কেমন করে সম্ভব?

সে বলল- যাদের হাতে ক্যামেরা আছে, আমার কাছে তুলে দিন। আমি আপনাদের হয়ে ছবি তুলে দেব। ব্যাপারটা আরও ভালো হবে।

ক্যামেরাগুলো অতি দ্রুত তার হাতে এসে গেল। সে নীচু হয়ে ক্যামেরার গর্তে হাত দিল। উজ্জ্বল সূর্যের আলো ঢুকে পড়ল। নেগেটিভগুলোর বারোটা বেজে গেল। আমি এক পেশাদার মানুষ। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটাকে নষ্ট করব কেমন করে?

দশমিনিট বাদে লেসলি সকলের নাম ঠিকানা পেয়ে গেছে। সে শেষবারের মতো উড়নচাকির ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকাল, তারপর বলল- হ্যাঁ, মা ঠিক কথাই বলেছিল, একদিন আমি মস্ত বড়ো হয়ে উঠব।

সে ইংল্যান্ডে ফেরার মতো সময় হাতে রাখতে চাইছে না। এই ফটোগ্রাফগুলো এখনই প্রিন্ট করতে হবে।

.

কে রিং বাজাচ্ছে? পুলিশ স্টেশন, ইউটানডাস অঞ্চল। সমস্ত সন্ধ্যে ধরে টেলিফোন রিং বাজছে। আমার বাড়ির পাশে কেউ ঘোরাঘুরি করছে।

সেখানে উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠেছে।

গোরুগুলো চীৎকার করছে। নেকড়ে এসেছে মনে হয়।

আমার জল কেউ শুষে নিচ্ছে।

তারপর? চীফ, হাইওয়েতে অনেকগুলো নতুন গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এটা কি দুঃস্বপ্ন? সমস্ত গাড়ি বন্ধ হয়ে গেছে।

-কেন কী জন্য?

–এমন একটা রাত এল, যার কথা সে কখনও ভুলতে পারবে না।

.

১৬.

রবার্ট ভাবতে থাকেন, কতদিন ধরে এই কাজ করতে হবে? তাদের গতিবিধি সম্পর্কে তিনি কিছুই ভাবতে পারছেন না। কয়েক বছর ধরে? না, মনে হচ্ছে এর থেকে মুক্তি নেই।

.

হিথরো বিমান বন্দর, রবার্ট বাইরে বেরিয়ে এলেন। ট্যাক্সি নিলেন, জনাকীর্ণ শহর, কত পরিচিত ল্যান্ডমার্ক। সুশানের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন বোধহয়। সেই সোনালী দিনগুলো কীভাবে কেটে গেছে। আমরা আমাদের নিজস্ব সুখকে কিনেছিলাম। আমাদের নিজস্ব উত্তেজনা ছিল। গল্পটা এক সুখী সম্পৃক্ত সমাপ্তির দিকে এগিয়ে গেছে।

হঠাৎ সমস্যা দেখা দিল, হঠাৎ একদিন অ্যাডমিরাল হুইট্যাকারের ফোন, রবার্ট এবং সুশান তখন থাইল্যান্ডে বেড়াচ্ছিলেন। নেভি থেকে রবার্টকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, ছমাস হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে তিনি আর কখনও অ্যাডমিরালের সঙ্গে কথা বলেননি। ওরিয়েন্টাল হোটেল ব্যাংকক, ফোনটা বেজে উঠল– রবার্ট, অ্যাডমিরাল হুইট্যাকার?

অ্যাডমিরাল! আপনার কণ্ঠস্বর শুনে ভালো লাগছে।

–আপনাকে অনুসন্ধান করা তো খুবই শক্ত। এখন কী করছেন?

বিরাট হনিমুন কাটাচ্ছি।

সুশান কেমন আছে? আপনার স্ত্রীর নাম তো সুশান তাই না?

–হ্যাঁ, ও ভালো আছে। আপনাকে ধন্যবাদ।

-কত তাড়াতাড়ি আপনি ওয়াশিংটনে আসতে পারবেন?

–আপনি কী বলছেন?

–এখনও ঘোষণা করা হয়নি। আপনাকে একটা নতুন কাজের দায়িত্ব দেব। আপনাকে আর্মি সতেরো নম্বর ডিস্ট্রিক্ট নাভাল ইনটেলিজেন্সির ডিরেক্টর করা হয়েছে। আপনি কি এখনই আসতে পারবেন?

রবার্টের মাথা ঘুরতে থাকে নাভাল ইনটেলিজেন্স? অ্যাডমিরাল, আমি তো এসবের কিছুই জানি না।

–আপনি জানতে পারবেন রবার্ট, দেশের জন্য আপনাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে। আপনি কখন আসতে পারবেন?

–ভেবে দেখছি।

–সোমবার সকাল নটায় চলে আসুন, সুশানের জন্য আমার ভালোবাসা রইল।

রবার্ট সুশানের কাছে সব কথা খুলে বললেন।

নাভাল ইনটেলিজেন্স? ব্যাপারটা শুনতে ভালোই লাগছে।

সন্দেহে আকুল কণ্ঠস্বরে রবার্ট বলেছিলেন- কী কাজ মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না।

–ওখানে গিয়েই একবার দেখো না।

রবার্ট সুশানের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন- তুমি কী চাইছ? এটায় আমি যোগ দেব?

সুশান গলা জড়িয়ে বলেছিলেন- আমি তোমাকে সব সময় আমার কাছে পেতে চাই। তবে কাজে থাকাটাই তো ভালো। কয়েক সপ্তাহ ধরে তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ।

–তুমি কি আমার থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইছ? তাহলে এই হনিমুনটা শেষ হয়ে গেল।

সুশান ঠোঁটে হাত দিয়ে বলেছিলেন- না, আমি সব সময় তোমাকে কাছে পেতে চাই, হে আমার প্রিয় নাবিক বন্ধু।

রবার্ট ভাবতেই পারেননি, এভাবে একটা মারাত্মক গল্প শুরু হতে পারে। তিনি ওয়াশিংটনে ফিরে এলেন। অ্যাডমিরাল হুইট্যাকারের সঙ্গে কথা বললেন।

ভদ্রলোক বলেছিলেন- এই কাজে যথেষ্ট সাহস দরকার। দরকার আত্মনিবেদনের আকাঙ্খা, না হলে কখনই আপনি এই কাজটা করতে পারবেন না। আপনি হয়তো জানেন যে, আমাদের দেশে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠন কত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এখন বিশ্বের অন্তত দুটি দেশ আণবিক বোমা নিয়ে কাজ করছে। তারা বিশ্বজোড়া সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে পারে। আমার ওপর একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমি

একটা গুপ্তচর সংস্থা তৈরি করতে চলেছি। এই সংস্থা সর্বত্র জাল বিছিয়ে রাখবে। আমরা সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করব। আপনি আমার সহায় হবেন?

শেষ পর্যন্ত রবার্ট ওই চাকরিটা নিতে রাজি হয়েছিলেন, অবাক হয়ে গেলেন এতে এত উত্তেজনা আছে জেনে। সুশানের জন্য ভার্জিনিয়াতে একটা সুন্দর অ্যাপার্টমেন্টের ব্যবস্থা করা হল, রবার্টকে বিভিন্ন জায়গাতে পাঠানো হল। প্রথমে তিনি গেলেন সি আই এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। সেটা ভার্জিনিয়ার গ্রাম অঞ্চলে অবস্থিত। বাইশ মাইল দূরে একটা মস্ত বড়ো ফার্ম, চারপাশে পাইন গাছের ঘন অরণ্য। দশ একর জমির ওপর মূল ভবনটা অবস্থিত। প্রধান গেট থেকে দু মাইল দূরে তার অবস্থান।

রবার্ট যত্ন করে সবকিছু শিখলেন। বুঝতে পারলেন, তাকে অনেক রকম কাজ করতে হবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আরও অনেক শিক্ষানবীশ এসেছেন সেখানে। রবার্ট থাকতেন ব্যাচেলার অফিসের এক কোয়াটার্সে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটা করে ঘর দেওয়া হয়েছে। বাথরুমটা অন্যের সাথে ভাগাভাগি করতে হত।

সে এক কঠিন কঠোর পরীক্ষা পদ্ধতি। অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হল।

সেখানকার প্রধান ছিলেন কর্নেল ফ্রাঙ্ক জনসন। তিনি স্বাগত জনিয়েছিলেন। তার কাছ থেকে ভাষণ শুনতে শুনতে রবার্টের মনে হয়েছিল, এই জীবনে অনেক কিছু করার আছে।

ক্লাশ শুরু হল, দিনগুলো হু হু করে কেটে গেল। রবার্ট মনে মনে উত্তেজনা অনুভব করলেন।

.

হ্যা, প্রতিটি মুহূর্তে জীবনকে নতুন করে বোঝার এক আশ্চর্য আনন্দ। কত গোপন সংকেত শিখতে হচ্ছে। চোখের দৃষ্টিতে, হাতের তালুতে, কথা না বলে মনের ভাব যেভাবে প্রকাশ করা যায়।

কর্নেল জনসনকে আরও ভালো লেগে গেল রবার্টের। শোনা গেল হোয়াইট হাউসের সঙ্গে তার নাকি ভালো সম্পর্ক আছে। একদিন হঠাৎ ফার্ম থেকে উনি চলে গেলেন। কদিন বাদে আবার এসে উপস্থিত হলেন।

.

রন নামে এক এজেন্ট একটি কাজ করছিলেন। তিনি ব্যবহারিক দিকগুলো দেখাশোনা করেন। কর্নেল জনসনও মাঝে মধ্যে ক্লাশে আসছেন। একদিন, একদল শিক্ষার্থী বসে আলোচনা করছেন, রবার্টের শিক্ষক বললেন এবার আমরা আসল কাছে নামব। এতদিন পর্যন্ত আপনারা যা শিখেছেন, সেটারই পরীক্ষা করা হবে।

.

রবার্ট বাসে চড়ে রিচমন্ডে এলেন। রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতে থাকলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনি ট্যাকারগুলোকে চিহ্নিত করলেন। সেখানে দুটো ছিল একটা রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল, আরেকটা অটোমোবাইল। রবার্ট রেস্টুরেন্ট এবং দোকানে ঘুরতে লাগলেন।

কিন্তু, আসল খবরটা পাওয়া যাচ্ছে না। রবার্ট একটা ডিপার্টমেন্ট স্টোরে গেলেন। সেখানে গিয়ে কিছু লোকের সঙ্গে কথা বললেন। ত্রিশ মিনিট কেটে গেছে, পোশাক পাল্টে ফেলেছেন। এক মহিলার সঙ্গে কথা বলছেন। কোলে একট শিশু। তাকে আর চেনাই যাচ্ছে না।

এই দিন তিনি বোধহয় সব কাজে জয়লাভ করেছিলেন।

.

আবার শুরু হল প্রশিক্ষণের পালা। ওয়াটার গেটের কথা বলা হল। সি আই এ-র কী কী কোড আছে তাও শেখানো হল। হ্যাঁ, সকলের ছদ্মবেশ খুবই সুন্দর হয়েছে। রবার্ট নিজেকে দেখে চিনতে পারছেন না।

এইভাবে ক্লাশ উতরে গেল। মাঝেমধ্যেই কর্নেল জনসন রবার্টকে ডেকে আলোচনা করতেন। একদিন কথায় কথায় তিনি বললেন– রবার্ট, আপনার বিবাহিত জীবন কেমন? সুখের তো?

হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন, স্যার।

আরেকদিন বললেন- অ্যাডমিরাল হুইট্যাকার আপনাকে নাকি সন্তানের মতো স্নেহ করেন? আপনি কি তা জানেন?

হ্যাঁ, রবার্টের মনে পড়ে গেল এডওয়ার্ডের মৃত্যুকাতর মুখখানি।

তারা আনুগত্য এবং দেশপ্রেম বিষয়ে আলোচনা করলেন। কর্তব্যবোধ এবং মৃত্যুর কথাও বললেন।

রবার্ট, একাধিকবার আপনার সঙ্গে মৃত্যুর দেখা হয়েছে। আপনি কি মরতে ভয় পান?

না, রবার্ট মুখে বললেন, মনে মনে ভাবলেন, ভালো কাজের জন্য মৃত্যুবরণ, কিন্তু বাজে ব্যাপারে নয়।

চার মাসের এই প্রশিক্ষণ শিবির। এই সময় কাউকে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অনুমতি দেওয়া হত না। মাঝে মধ্যে রবার্টের মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। কতদিন সুশানকে দেখেননি, সুশানের সাথে ফোনে কথাবার্তা বলতে পারছেন না। শেষ অবধি চারমাস কেটে গেল।

কর্নেল জনসন রবার্টকে তার অফিসে ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন কমান্ডার, আপনি সুন্দরভাবে সবকিছু শিখে নিয়েছেন। আমার মনে হচ্ছে আপনার ভবিষ্যৎটা খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। কর্নেল জনসন রবার্টের দিকে তাকালেন। পাঁচমিনিট বসে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছোলেন। তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন। টেলিফোন নিয়ে একটা ফোন করলেন।

.

সুশান রবার্টের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে দিলেন। পরনে ফিনফিনে রাত পোশাক, যৌবনের সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সুশান এগিয়ে এসে

রবার্টকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন- হাই নাবিক, তুমি কি একটা সুন্দর সময় পেতে চাইছ।

-হ্যাঁ, রবার্ট বললেন, তোমাকে জড়িয়ে ধরে আছি, এটাই তো আমার কাছে সুখীতম সময়।

–দেখো, কতদিন তোমাকে কাছে পাইনি বলো তো? যদি তোমার কিছু ঘটত তাহলে আমি মরে যেতাম।

আমার কিছু হত না।

শপথ করছ।

–হ্যাঁ, শপথ করছি।

রবার্টের মুখের দিকে তাকিয়ে সুশান বললেন- তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

ব্যাপারটা বিচ্ছিরি, কঠিন একটা কোর্স। রবার্ট স্বীকার করলেন। সত্যি, রাতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা ঘুম হত। কত কিছু বোঝার আছে।

সুশান বললেন–তুমি কি চাইছ আমি তা বুঝতে পারছি। পাঁচ মিনিট সময় দাও, সবকিছু খুলে ফেলল।

সুশান পাশের ঘরে চলে গেলেন।

আঃ, এমন সৌভাগ্য আমার। রবার্ট নিজেকে উন্মুক্ত করতে শুরু করলেন।

সুশান ফিরে এলেন, শান্তভাবে বললেন- হ্যাঁ, আমি এই অবস্থায় তোমাকে আরও ভালোবাসি।

প্রশিক্ষকের কণ্ঠস্বর মনে পড়ে গেল, অনেক সময় আপনাদের একেবারে উলঙ্গ হয়ে কাজ করতে হবে। অর্থাৎ আপনারা কোনো সহযোগী পাবেন না। কিন্তু এখন? এখন শব্দটার অন্য একটা মানে আছে।

সুশান তাঁকে নিয়ে বাথরুমে চলে গেলেন। টবে সুগন্ধী উষ্ম জল। ঘরটা অন্ধকার। বেসিনের ওপর চারটে মোমের আলো জ্বলছে।

সুশান তার রাত পোশাকটা খুলে দিয়ে বললেন– ডার্লিং, এই বাড়িতে তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, তিনি বাথটবে উঠে গেলেন। রবার্ট তাকে অনুসরণ করলেন।

-সুশান?

–কোনো কথা বলো না, আমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকো।

রবার্ট বুঝতে পারলেন, সুশানের দুষ্টু হাত দুটো তার শরীরের সর্ব অঙ্গ স্পর্শ করছে। আহা, এমন চড়াই উৎড়াই, রবার্ট কত ক্লান্ত তা ভুলে গেলেন। ওই ঈষদুষ্ণ জলে তারা অনেকক্ষণ পারস্পরিক ভালোবাসা নিবেদন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সুশান বলেছিলেন–

অনেক গল্প কথা হল, অনেক আনন্দ হল, এবার এসো, আমরা কিছু কঠিন বিষয়ের অবতারণা করি।

আবার ভালোবাসা, আবার উদ্দামতা, রবার্ট ঘুমিয়ে পড়লেন। সুশানকে জড়িয়ে ধরে। ভাবলেন, জীবনটা কেন এইরকম হয় না বরাবরের মতো!

.

১৭.

পরের সোমবার সকালবেলা। রবার্ট তার কাজে যোগ দিলেন। পেন্টাগনের অফিসে গিয়ে। অ্যাডমিরাল হুইট্যাকার বললেন– রবার্ট, আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। কর্নেল

জনসনের সঙ্গ আপনার কেমন লেগেছে?

রবাটের মুখে হাসি, উনি যথেষ্ট আকর্ষণীয় মানুষ। কফি খেতে খেতে অ্যাডমিরাল প্রশ্ন করলেন আপনি কাজ করবেন তো?

-হ্যাঁ।

–আপনাকে রোডেশিয়া যেতে হবে।

.

নাভাল ইনটেলিজেন্সের কাজ খুবই উত্তেজক, রবার্ট ভাবতেই পারেননি। নতুন নতুন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। যে সমস্ত কাজ অত্যন্ত স্পর্শ কাতর, সেই কাজের দায়িত্ব রবার্টের ওপর দিয়ে দেওয়া হয়। পানামাতে গিয়ে তাকে একটা গোপন ড্রাগচক্র ভাঙতে হল। যেতে হল ম্যানিলাতে, মার্কিন দূতাবাসের ওপর সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করতে। মরক্কো যেতে হয়েছিল, গেলেন দক্ষিণ আমেরিকা এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। সুশানের সাথে দীর্ঘদিন দেখা হয় না, এই ব্যাপারটাই তাঁকে ক্লান্ত এবং উদ্বিগ্ন করে রাখে। সুশানের কাছ থেকে দূরে যেতে মন চায় না, তবুও যেতে হয়।

রবার্ট যখন বাড়ি ফিরে আসেন, সুশান তাকে আদরে আদরে ভরিয়ে দেন। উন্মাদ বন্য ভালোবাসা। কিন্তু মাত্র কয়েক দিনের জন্য।

রবার্ট সুশানের সাথে কাজের গতি প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন না। এই ব্যাপারে তাকে শপথ করতে হয়েছে। মনে হয়, সুশান যেন তার জীবনের এক অজানা আগন্তুক। কিন্তু কী করবেন, কাজের সাথে তো আর বিশ্বাসঘাতকতা করা যায় না।

রবার্ট মধ্য আমেরিকা থেকে ফিরে এলেন। একসপ্তাহ বাদে।

সুশান বললেন– রবার্ট, একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

কী সমস্যা? রবার্ট জানতেন কোন্ সমস্যার কথা বলা হচ্ছে।

–আমার ভয় হচ্ছে, আমরা বোধহয় পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। আমি তোমাকে হারাতে চাইছি না। আবার এই বিরহ সহ্য করতে পারছি না।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

সুশান..

.–হা, আমার কথা শেষ করতে দাও। গত চারমাসে আমরা কতটুকু সময় একসঙ্গে কাটিয়েছি বলো তো? মাত্র দু সপ্তাহ। যখনই তুমি বাড়িতে আসো, মনে হয় তুমি যেন এক আগন্তুক, তুমি আর আমার স্বামী নও।

রবার্ট এগিয়ে এসে সুশানকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন- তুমি তো জানো সোনা, তোমাকে আমি কতটা ভালোবাসি।

সুশান বললেন– না, এমন করে কথা বলো না। তুমি কথা দাও ভবিষ্যতে কাজের চাপ কমিয়ে দেবে।

–আমি বলতে পারছি না, অ্যাডমিরাল হুইট্যাকারের সাথে কথা বলতে হবে।

কখন?

–এখনই।

.

কমান্ডার অ্যাডমিরাল এখনই আপনার সাথে কথা বলবেন।

অ্যাডমিরাল তার ডেস্কে বসেছিলেন। কাগজ পত্রে সই করছেন। রবার্টকে দেখে তিনি হাসলেন–রবার্ট ধন্যবাদ, এবং অনেক–অনেক শুভেচ্ছা। বেল সালভাডোরে আপনি দারুণ কাজ করেছেন।

–আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কফি খাবেন কি?

না, ধন্যবাদ অ্যাডমিরাল।

–আপনি আমার সঙ্গে কী বিষয়ে কথা বলতে চেয়েছেন? বলুন আমি কী করতে পারি?

শুরু করাটা সত্যিই কষ্টকর। স্যার, ব্যাপারটা খুবই ব্যক্তিগত। আমি মাত্র দুবছর আগে বিয়ে করেছি।

–হ্যাঁ, আমি শুনেছি সুশান খুব ভালো মেয়ে।

-হ্যাঁ, আমিও সেটা জানি, কিন্তু সমস্যা হল আমাকে বেশির ভাগ সময় বাড়ির বাইরে থাকতে হয়। আমার বউ তা নিয়ে খুবই দুঃখ প্রকাশ করে। এটাই তো হওয়া স্বাভাবিক, তাই নয় কি?

অ্যাডমিরাল হুইট্যাকার চেয়ারে ঝুঁকে বললেন- ঠিক আছে, আপনি যে পদে যুক্ত আছেন সেখানে এই ধরনের স্বার্থ ত্যাগ তো করতেই হবে।

রবার্ট বললেন আমি আমার বিয়েটাকে শহীদ করতে চাইছি না। ব্যাপারটা আমার কাছে বোঝার মতো হয়ে গেছে।

অ্যাডমিরাল বললেন- ঠিক আছে। আপনি কী বলতে এসেছেন?

–আমাকে এমন একটা কাজ দিন যাতে বাড়ি থেকে বেশি দিন দূরে থাকতে না হয়।

বাড়ির কাছাকাছি থাকতে চান?

–হ্যাঁ।

অ্যাডমিরাল বললেন কিন্তু আমি তো তা বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, দেখতে হবে।

-ঠিক আছে, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

–সুশানকে বলবেন আমি সমস্যাটা সমাধান করার চেষ্টা করছি।

–আমি কীভাবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব বুঝতে পারছি না।

অ্যাডমিরাল হুইট্যাকার হাত নেড়ে বললেন– আপনি আমার কাছে অত্যন্ত মহার্ঘ মানুষ। আপনাকে আমি হারাতে দেব না। এখন বাড়ি চলে যান, বিরহ কাতরা বউয়ের পাশে গিয়ে বসুন।

.

রবার্ট সুশানকে এই খবরটা দিলেন। সুশান আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছেন। তিনি এগিয়ে এসে রবার্টকে জড়িয়ে ধরে বললেন- ডার্লিং, সত্যিই একটা শুভ সংবাদ এনেছ আমার জন্য।

–আমি কয়েক সপ্তাহ ছুটি নেব। দ্বিতীয় মধুচন্দ্রিমাতে যাব।

–আমি জানি না, হনিমুন বলতে কি বোঝায়? তুমি আমাকে দেখাও।

রবার্ট কথা রেখেছিলেন।

অ্যাডমিরাল হুইট্যাকার পরের দিন সকালে রবার্টকে ডেকে আনলেন। বললেন গতকাল যেসব কথা বলেছিলাম সে নিয়ে আলোচনা আছে।

অ্যাডমিরাল আরও বলতে থাকলেন একটা জিনিস এসেছে। তার কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য। সি আই এ কে ধ্বংস করার চেষ্টা হচ্ছে। সিক্রেট ইনফরমেশনের ভেতর কিছু গুপ্তচর ঢুকে পড়েছে। তার মধ্যে একজন স্পাইকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। তার সংকেত নাম হল দি ফক্স অর্থাৎ খেকশিয়াল। সে এখন আর্জেন্টিনাতে আছে। এজেন্সির বাইরে কাউকে দরকার। সি আই–এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর আপনার কথা বলেছেন। আপনি বোধহয় এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন।

রবার্ট বললেন- না স্যার, আমি যেতে চাইছি না।

–কিন্তু রবার্ট, আপনি ছাড়া তো হবে না, আপনি এর আগে কখনও আমার কথার। অমান্য করেননি। আমি বুঝতে পারছি এতে আপনার কত ক্ষতি হবে।

স্যার, আমাকে ভাবতে সময় দিন।

রবার্ট, আপনি আগের মতোই থাকবেন আশা করি।

কী ব্যাপার অ্যাডমিরাল?

–ডেপুটি ডিরেক্টর বলেছেন আপনাকে একবার দেখা করতে। আপনি যাবেন তো?

–হ্যাঁ, আমি নিশ্চয়ই যাব।

.

পরের দিন সকাল বেলা, রবার্ট ল্যাংলের কাছে গেলেন এই ব্যাপারে দেখা করার জন্য।

ডেপুটি ডিরেক্টর বললেন- কমান্ডার বসুন, তিনি আরও বললেন আপনার সম্পর্কে অনেক কথা আমি শুনেছি। আপনার কর্তৃত্ব এবং কৃতকার্যতা আমাকে অবাক করেছে।

ডেপুটি ডিরেক্টরের বয়স বছর ষাটেক, চোয়ালটা সরু, সাদা চুল, পাকানো গোঁফ আছে। রিয়েল থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও এস এসিতে ছিলেন। তারপর সি আই এ-তে চলে আসেন।

উনি বললেন- কমান্ডার, আপনার সিদ্ধান্তকে আমি শ্রদ্ধা করছি। সত্যি কথা বলতে কী, একটা ব্যাপারে আমি আপনাকে ডেকে এনেছি। আমাদের দেশের প্রেসিডেন্ট এই ব্যাপারটায় যুক্ত আছেন। যে করেই হোক ফক্সের মুখোশ খুলতে হবে।

তিনি আরও বললেন– প্রেসিডেন্টের কাছে আপনার কথা বলছি। উনিও একজন দায়িত্ব সম্পন্ন স্বামী। উনি আপনার ওপর কোনো অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে দেবেন না। আশা করি কমান্ডার, আপনি এই ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন।

রবার্ট ভাবলেন, তাহলে? দ্বিতীয় হনিমুনটা পিছিয়ে দিতে হবে।

.

রবার্ট এই খবরটা সুশানের কাছে বললেন। আরও বললেন– এরপর কথা দিচ্ছি, আর কখনও দেশের বাইরে যাব না। হয়তো চাকরিটা ছেড়ে দেব, কিন্তু তোমাকে হারাতে পারব না।

সুশান বলেছিলেন আমার কাছে কি এত সময় তুমি দিতে পারবে? এমন একটা সুন্দর দিন যখন কেউ তোমার এবং আমার মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ রচনা করতে পারবে না?

.

ফক্সকে অনুসরণ করার ব্যাপারটা খুব একটা সহজ নয়। রবার্ট কখনও জীবনে হতাশ হন না, কিন্তু এবার তাকে হতাশ হতে হল। আর্জেন্টিনা, টোকিও, চীন, মালয়েশিয়া, যেখানে যেখানে ফক্সের থাকার সম্ভাবনা, সেখানেই রবার্ট হাজির হয়েছেন।

দিন গড়িয়ে গেল সপ্তাহে, সপ্তাহ গড়িয়ে গেল মাসে। রবার্ট ভেবেছেন, আজই বোধহয় কাজটা শেষ হয়ে যাবে। প্রত্যেক দিন নিয়ম করে সুশানের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। কথাটা শুরু হয় এইভাবে- ডার্লিং, কয়েক দিনের মধ্যেই বাড়ি ফিরব, তারপর... মনে হচ্ছে আসছে সপ্তাহে বাড়ি যাব, শেষ পর্যন্ত আমি জানি না কবে ছুটি পাব।

রবার্ট ফোনেতে আর আশা প্রকাশ করেন না। তিনি জানেন না ফক্সকে অনুসন্ধান করার কাজ সত্যিই শেষ হবে কিনা, হয়তো হবেই না, দুমাস কেটে গেল, আরও পনেরো দিন, মনে হচ্ছে, সফলতা বুঝি দূর আকাশের তারা!

.

সুশানের কাছে রবার্ট ফিরে এলেন, সুশানের মনোভাব অনেকখানি পাল্টে গেছে। শান্ত স্বভাবের হয়ে গেছেন তিনি। আগের মতো উচ্ছ্বাস নেই, অনুভবী শক্তি হারিয়ে গেছে।

রবার্ট বললেন- ডার্লিং, আমি দুঃখিত, আমি জানতাম না এই কাজটা শেষ করতে কতদিন লাগে।

রবার্ট, আমি জানি ওরা তোমাকে কখনও ছাড়বে না।

–তুমি কী বলছ?

সুশান মাথা নাড়লেন– আমি ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল হসপিটালে একটা কাজ করতে যাব।

রবার্ট অবাক হয়ে গেছেন, সত্যি কথা বলছ?

হা, আমি আবার নার্সের জীবিকা শুরু করব। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি তোমার অপেক্ষায় বাড়িতে বসে থাকতে পারব না। তুমি নিজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখো তো? তুমি জীবিত না মৃত সেটা ভাবলেও আমার অবাক লাগে।

সুশান? রবার্টের আর্তনাদ।

–প্রিয়তম, ব্যাপারটা এখানে মিটিয়ে ফেললাম। যখন তুমি থাকবে না, আমাকে দেশের জন্য কিছু একটা করতে দাও। তাহলে হয়তো আমার অপেক্ষা করার প্রহরটা আরও সহজ হবে।

রবার্টের কাছে এই প্রশ্নের কোনো উত্তর ছিল না।

তিনি অ্যাডমিরাল হুইট্যাকারের কাছে গিয়ে তার ব্যর্থতার কথা বললেন।

অ্যাডমিরাল খুবই সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি।

-হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, আমার খুবই খারাপ লাগছে রবার্ট, দেখি আপনাকে ভবিষ্যতে আর এমন দায়িত্ব দেব না।

রবার্ট বললেন- সুশান নার্সের চাকরিতে যোগ দিতে চলেছে।

অ্যাডমিরাল বললেন- বাহ! ব্যাপারটা ভালোই। এতে আপনার ওপর চাপ কিছুটা কমবে। এখন আপনি কাড়ে অনেক বেশি সময় দিতে পারবেন।

না, রবার্ট কিছু বলার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি বুঝতে পারলেন, বিয়েটা এবার ভাঙনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

.

সুশান ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল হসপিটালে কাজ করতে চলে গেলেন। তাকে অপারেটিং রুমের নার্স হিসেবে কাজ করতে হবে। যখন রবার্ট বাড়ি আসতেন, সুশান ছুটি নেবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু সেটাও বোধহয় আর সম্ভব ছিল না। তাকে আরও–আরও বেশি কাজে জড়িয়ে দেওয়া হল।

তিনি ফিরে এসে রবার্টকে তার রুগীদের সম্পর্কে গল্প বলতেন। আরও কত কথা হতো। রবার্ট এবার গেলেন তুরস্কতে, একটা দরকারী কাজ ছিল। ফিরে এসে সুশানকে নিয়ে একটা হোটেলে ডিনার করতে গেলেন।

সুশান অনর্গল বলেই চলেছেন রুগীদের গল্পকথা। রবার্ট শুনতে চাইছেন না, রবার্ট ভাবছেন এই কি সেই সুশান, যাকে আমি কত ভালোবাসতাম।

শেষ পর্যন্ত এক নতুন রুগীর কথা বলা হল। বিমান দুর্ঘটনায় সাংঘাতিকভাবে আহত। বাঁচার আশা ছিল না। সুশান নিজের হাতে তাকে শুশ্রূষা করেছেন। সুশান মারফত রবার্ট জানতে পারলেন, সমস্ত নার্স এই যুবকের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে।

রবার্ট অবাক হয়ে গেছেন, তার মানে? সুশানের মন কি পাল্টে গেল?

এই প্রথম মনের ভেতর সন্দেহ ঢুকল, তারপর ডিনার এসে গেল।

.

পরের শনিবার, রবার্ট পর্তুগালে চলে গেলেন। কয়েক সপ্তাহ বাদে ফিরে এলেন। সুশান আনন্দঘন মুখে অভিবাদন জানালেন।

অভিমানী চুম্বন বিতরণ, বলা হল, মন্টে আজ প্রথম হাঁটতে পারছে।

–মন্টে কে?

-মন্টে ব্যান্ডস, এটাই হল তার নাম। ডাক্তাররা বিশ্বাস করতে পারছেন না, কিন্তু আমরা। এই অসাধ্যকে সাধ্যাতীত করেছি।

–ওর সম্পর্কে আরও কিছু বল।

–ও সত্যিই অসাধারণ। আমাদের সব সময় উপহার দেয়। প্রচুর পয়সা আছে। নিজের প্লেন আছে, বিচ্ছিরিভাবে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছিল।

কী ধরনের উপহার?

ছোটো ছোটো জিনিস, ক্যানডি, ফুলের তোড়া, বই, রেকর্ড, ও সকলকে দামী ঘড়ি দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমরা নিতে চাইনি।

— ...ওর হাতে একটা প্রামোদ তরণী আছে, পোলো খেলার মাঠ আছে,

রবার্ট বুঝতে পারলেন, এবার বোধহয় তাকে হারতে হবে।

সুশান রোজই ওই পেশেন্টর গল্প বলতে থাকেন।

একদিন তিনি বললেন, হ্যাঁ, ওর আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য, রবার্ট। ও সব ব্যাপারে চিন্তা করতে ভালোবাসে। জকি ক্লাব থেকে আজ লাঞ্চও আনিয়েছিল, সকলকে খাওয়াল।

রবার্ট ভাবতে পারছেন না কী করবেন? শেষ পর্যন্ত তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তোমার ওই সুন্দর যুবকটি কি বিবাহিত?

-না, ডার্লিং। কেন এই প্রশ্ন করছ?

–আমার অবাক লাগছে।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ, তুমি কি হিংসুটে হয়ে উঠছ?

না, তা হব কেন?

রবার্ট যখন বাড়ি থাকে না, সুশান আর ওই রোগী সম্পর্কে কোনো কথা বলেন না। তিনি অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু রবার্ট বেশ বুঝতে পারেন, কোথায় যেন একটা পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

পরের দিন ছিল সুশানের জন্মদিন। রবার্ট উৎসাহের সঙ্গে বললেন- আমরা একসঙ্গে আজকের দিনটি পালন করব। বাইরে যাব, হোটেলে ডিনার খাব।

রাত্রি আটটা অবধি আমাকে হাসপাতালে থাকতে হবে।

–ঠিক আছে, আমি তোমাকে সেখান থেকে তুলে নেব।

–মন্টে তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য আগ্রহী। আমি মন্টেকে তোমার সব কথা বলেছি।

–আমিও তার সঙ্গে দেখা করতে যাব।

রবার্ট হাসপাতালে এলেন। রিসেপশনিস্ট বললেন সুশান এখন অর্থোপেডিক ওয়ার্ডে কাজ করছেন। তিনতলায়।

রবার্ট এলিভেটরে পা রাখলেন। সুশান তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আগেকার সেই পরিচিত সাদা পোশাক পরেছেন, ওঃ, এখনও কী অসাধারণ রূপসী।

সুশান হাসলেন, হ্যালো রৰার্ট, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমার কাজ শেষ হবে। এসো তোমার সাথে আমি মন্টের আলাপ করিয়ে দিই।

বিশাল একটা প্রাইভেট রুম, বই আর ফুলে পরিপূর্ণ। ফলের বাস্কেট রয়েছে। মন্টে, এ হল আমার স্বামী রবার্ট।

রবার্ট দাঁড়ালেন। বিছানায় শুয়ে থাকা মানুষটির মুখের দিকে তাকালেন। রবার্টের থেকে তিন-চার বছরের বড়ো হবেন হয়তো।

কমান্ডার, আপনার সঙ্গে দেখা করতে পেরে আমি নিজেকে আনন্দিত বলে মনে করছি। সুশান আপনার সব কথা আমাকে বলেছে।

কত কথা? বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

সুশান আপনার জন্য খুবই গর্বিত।

মনে হচ্ছে আপনি এবার ছাড়া পাবেন। রবার্ট জানতে চাইলেন।

–হ্যাঁ, এই অলৌকিক ঘটনাটা কিন্তু আপনার স্ত্রী ঘটিয়েছে।

–এটাই হল ওঁর বৈশিষ্ট্য।

মনে পড়ে গেল, অনেক দিন আগের একটা ছবি, মৃত্যুপথযাত্রী রবার্টকে এইভাবে সুশান জীবনের উপত্যকায় ফিরিয়ে এনেছিলেন।

.

জন্মদিনের ডিনার, সুশান তার ওই পেশেন্ট সম্পর্কে কথা বলতে উদগ্রীব।

–ডার্লিং, তুমি এ ধরনের ব্যবহার করলে কেন?

সুশান জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, কথাবার্তা আর এগোচ্ছে না। মনে হচ্ছে, ডিনারটা। এখন শেষ করতে পারলেই ভালো হয়, নীরবতার মধ্যে দিয়ে উৎসব পালিত হল।

পরের দিন সকালবেলা, রবার্ট তখন অফিস যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, সুশান বললেন রবার্ট, তোমার সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে।

রবার্ট অবাক হয়ে সুশানের দিকে তাকালেন। হ্যাঁ, বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, কোথায় যেন ভাঙনের গান বেজে উঠেছে।

সুশান কঠিন চোখে রবার্টের দিকে তাকিয়ে বললেন- শোনো রবার্ট, একথা অস্বীকার করার বিন্দুমাত্র উপায় নেই যে, তোমাকে আমি ভীষণভীষণ ভালোবাসি। পৃথিবীতে আর কখনও কোনো পুরুষকে বোধহয় এতটা ভালোবাসতে পারব না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, দাম্পত্য জীবন শুধু ভালোবাসার ওপর নির্ভর করে না।

একটুখানি থেমে সুশান আবার বললেন- দেখো রবার্ট, গত চার মাসে আমরা কঘণ্টা একসঙ্গে কাটিয়েছি বলো তো? এইভাবে চলতে দেওয়া উচিত নয়। শেষ পর্যন্ত আমি ঠিক করেছি, বিয়েটা ভেঙে দিতে হবে।

রবার্টের মনের মধ্যে বিদ্যুৎ চমক, অবিশ্বাস্য কিছু শব্দ দ্রুত বেরিয়ে আসছে, সুশানের মুখ থেকে। রবার্ট অবাক হয়ে বললেন- কী বলছ সুশান? তুমি কি সত্যি সত্যি আমাকে হারাতে চাইছ?

সুশান রবার্টকে জড়িয়ে ধরে বললেন–হ্যাঁ, আমি অন্য একজনকে বিয়ে করতে চলেছি।

কে?

সুশানের মুখে হাসি। –মন্টে, মন্টে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে।

সুশানের এই কথা শুনে রবার্টের মনে হল, তিনি বোধহয় পাগল হয়ে যাবেন।

তিনি বলার চেষ্টা করলেন সুশান, আবার সবকিছু নতুন করে শুরু করা যায় কি?

সুশানের মুখ-চোখ এখন অনেক শান্ত, নির্লিপ্তির ভঙ্গিতে তিনি বললেন- না রবার্ট, গল্পটা শেষ হয়ে গেছে।

সুশান রেনোতে চলে গেলেন, ডিভোর্স করার জন্য। কমান্ডার রবার্ট বেলামি, দু-সপ্তাহের ছুটি নিলেন, শুধু মদ খেয়ে এই ব্যথাটা ভুলবেন বলে।

.

পুরোনো স্মৃতি বারবার ফিরে আসে। পুরোনো কথার গুঞ্জন। রবার্ট এফ. বি. আই-এর এক বন্ধুকে ফোন করলেন। এর আগে ওই ভদ্রলোকের সাথে রবার্টের ভালো সম্পর্ক ছিল। উনি হলেন অ্যাল, উনি ফোন ধরলেন, রবার্ট ওঁকে বিশ্বাস করেন।

–ক্রে, আমায় একটা সাহায্য করতে পারবে?

কী সাহায্য? তোমার এক ডাক্তার দরকার। তুমি কী করে সুশানকে ছেড়ে দিলে? খবরটা সর্বত্র চাউর হয়ে গেছে।

–একটা মস্ত বড়ো গল্প, বলতে পারো বিষাদঘন অভিজ্ঞতা।

–রবার্ট, আমার খুবই খারাপ লাগছে, মেয়ে হিসেবে সুশান চমৎকার। ঠিক আছে বলো আমি তোমাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি।

তুমি কি কম্পিউটার চালনা করো? সবাইকার খবর সেখানে থাকে।

–হা কী করতে হবে? নামটা বলো।

মন্টি ব্যস, তার সম্পর্কে সব খবর জানতে চাইছি।

–ঠিক আছে, কী কী বলতে হবে বলো?

সবকিছু, তোমার ফাইলে আছে কি? বিশ্বাস করো, এটা আমার খুবই দরকার। কীভাবে উনি এত টাকা আয় করেছেন, সেটাই আমি জানতে চাইছি।

-ঠিক আছে আমি বলব।

ব্যাপারটা খুবই ব্যক্তিগত, পাঁচ কান করো না যেন।

–ঠিক আছে। কাল সকালে তোমাকে জানাচ্ছি। একটা লাঞ্চ কিন্তু পাওনা আছে।

–হ্যাঁ, খাওয়াব।

রবার্ট রিসিভারটা রেখে দিলেন। ভাবলেন, এভাবে কি আমি সুশানকে আর কোনো দিন ফিরে পাব? না, তাহলে কেন এ মিথ্যে অনুসন্ধান করছি।

.

সকালবেলা, ফরনটন রবার্টকে ডেকে পাঠালেন। জানতে চাইলেন কমান্ডার, আপনি কী বিষয়ে কাজ করছেন?

–আমি সিঙ্গাপুরের এক কূটনীতি বিশারদের ওপর ফাইল তৈরি করছি।

–এতে আপনার অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে, তাই তো? কমান্ডার, আপনি কি ভুলে গেছেন, আমরা মার্কিন দেশের কোনো নাগরিকের বিরুদ্ধে ফাইল তৈরি করতে পারি না?

রবার্ট অবাক আপনি কী বলতে চাইছেন?

–এফ বি আই-এর কাছ থেকে আমি খবর পেয়েছি, আপনি এমন কাজ করছেন, যা করা আপনার পক্ষে উচিত নয়।

রবার্ট খুবই রেগে গেলেন তিনি বলার চেষ্টা করলেন, এটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার।

–এফ বি আই-এর কম্পিউটারকে এ ব্যাপারের জন্য ব্যবহার করা যায় না। আমরা কোনো সাধারণ নাগরিককে বিরক্ত করতে পারি না। আশা করি, আমার বক্তব্য আপনি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন।

রবার্ট অফিসে ফিরে গেলেন, এফ বি আই-কে ফোন করলেন। অ্যালকে ডেকে পাঠানো হল। এক মিনিট বাদে অপারেটর বলল– অ্যালকে চাকরিতে আর রাখা হয়নি।

রবার্ট অবাক হয়ে গেছেন- কী বলছেন?

–এজেন্টকে অন্য কোথাও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

–কোথায়?

–সেটা আমরা জানি না, জানলেও বলতে পারব না।

তারপর? আরও কিছু খবর শোনা গেল। সব শুনে রবার্টের রক্ত হিম হয়ে গেছে। শোনা গেল, তার প্রিয় বন্ধু রাস্তার অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন। তখন তিনি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। তার শরীরটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

রবার্ট রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। মনে নানা চিন্তা।

চারপাশে কী ঘটছে, কিছুই বুঝতে পারা যচ্ছে না। মন্টে ব্যাঙ্ককে সব ব্যাপার থেকে রক্ষা করা হচ্ছে কেন? রবার্ট ভাবলেন, সুশান বোধহয় একটা ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়ল।

সুশানের সঙ্গে আজ বিকেলে একবার দেখা করতেই হবে।

.

সুশান তার নতুন অ্যাপার্টমেন্টে বসেছিলেন। এম স্ট্রিটে একটা সুন্দর সাজানো ডুপ্লেক। রবার্ট অবাক হয়ে গেছেন। এই ফ্ল্যাটটা নিশ্চয়ই তার নতুন স্বামী কিনে দিয়েছেন।

সুশান, তোমার সাথে এমন ব্যবহার করেছি বলে আমাকে ক্ষমা করে দিও।

কী ব্যাপার বলো তো? গুরুত্বপূর্ণ কিছু কি?

না, আমি কীভাবে শুরু করব। বুঝতে পারছি না।

রবার্ট ভাবলেন, আমি কি বলতে পারি, সুশান, তোমাকে বাঁচাবার জন্য আমি ছুটে এসেছি?

কী হয়েছে?

–মনটি সম্পর্কে কিছু খবর।

সুশানের ভ্রূকুটিতে বিরক্তি কী খবর?

এটাই সবথেকে শক্ত মুহূর্ত। মন্টে ব্যাঙ্কের সবকিছু এফ বি আই-এর কম্পিউটারে ছিল। সেই খবর রবার্ট জানতে পারেননি। এমন কী যে মানুষকে বলা হয়েছিল, খবর জানতে, তাকে হত্যা করা হয়েছে। রবার্ট আমতা আমতা করে বলতে থাকেন সুশান, সুশান, আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটার মধ্যে কোনো গোলমাল আছে।

–আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

সুশান, উনি এত টাকা কোথা থেকে পাচ্ছেন?

–মন্টে এক সফল ব্যবসায়ী। আমদানি রপ্তানির ব্যবসা করে।

সেই পুরোনো অজুহাত। রবার্ট ভাবলেন।

না, এখন আর কোনো গল্পকথা বলে সুশানকে বিভ্রান্ত করা যাবে না।

—তুমি কী বলতে চাইছ? বলো তো।

–আমি খালি ভাবছি, ওই যুবাপুরুষ কি তোমার ঠিক জীবনসঙ্গী?

–আঃ, রবার্ট। সুশানের কণ্ঠস্বরে অধৈর্য।

–আমার এখানে আসা উচিত হয়নি। আমি দুঃখিত।

সুশান এগিয়ে এলেন। রবার্টকে চুমু দিয়ে বললেন- আমি বুঝতে পেরেছি, কেন তুমি এসেছ?

সুশান কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেননি। মন্টে ব্যাঙ্কসের ওপর একটা তদন্ত করা হচ্ছিল। সেই খবরটা নেভাল ইনটেলিজেন্স অফিসে পৌঁছে যায়। যে ভদ্রলোক এই তদন্তের কাজে যোগ দিয়েছিলেন, তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

.

রবার্ট ব্যাপারটা ভালোভাবে মেনে নেবার চেষ্টা করছেন। তিনি তার এক বন্ধুকে ফোন করলেন, ওই ভদ্রলোক ফোবরস ম্যাগাজিনে চাকরি করেন।

রবার্ট, অনেক দিন তোমার কথা শুনিনি, কেমন আছো তুমি?

রবার্ট সব কথা বুঝিয়ে বললেন।

মন্টে বাঙ্কস? আমার মনে হচ্ছে তার নাম ফোরবস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এখনই তার সম্পর্কে সব খবর দেব কী করে? আর কিছু?

রবার্ট পাবলিক লাইব্রেরিতে গেলেন হু হু নামে যে বইটি আছে, সেখানে মন্টে ব্যাঙ্কসের নাম খুঁজে পেলেন না। তিনি মাইক্রো ফাইল দেখলেন। ওয়াশিংটন পোস্টের সব কটি সংখ্যা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লেন। মন্টে ব্যাঙ্কসের ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল কি? হা, সেই সম্পর্কে একটা ছোট্ট খবর আছে। ব্যাঙ্কসকে এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তা হলে? আমি হয়তো ভুল করছি। মন্টে বাসের চরিত্রে কোনো কলঙ্ক নেই। যদি উনি এক পাই বা ক্রিমিনাল হয়ে থাকেন, ড্রাগ চোরাইচালানকারীদের সঙ্গে যুক্ত, তাহলে আমাদের সরকার কখনও এতটা সাহায্য করত না। তার মানে? আমি বোধহয় সুশানকে বিরক্ত করার চেষ্টা করছি।

.

আবার সেই একাকীত্বের জীবন, নিঃসঙ্গতা এবং অন্ধকার রাত্রি। ঘুম আসে না, মনের ভেতর হতাশার সঞ্চরণ। মাঝে মধ্যে রবার্ট একা একা সুশানের জন্য চোখের জল ফেলেন। সর্বত্র সুশানের স্মৃতি। এই অ্যাপার্টমেন্টের সবখানে সুশান এখনও জীবন্ত হয়ে আছেন। পুরো ব্যাপারটা ভাবতে বসে রবার্ট নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করেন। সুশানের কণ্ঠস্বর, সুশানের হাসি, সুশানের উষ্ণতা আহা, সুশানের শরীর, চড়াই-উৎরাই, সবই রবার্টের মনে পড়ে যায়। বিছানাতে শায়িতা উলঙ্গ সুশান। আদরের জন্য অপেক্ষা। সবকিছু সবকিছু।

রবার্ট, তুমি আর একা একা থেকো না।

বন্ধুদের কণ্ঠস্বর। কেউ বলেছে, রবার্ট, তোর জন্য একটা শরীর ব্যবস্থা করেছি। ডবশ। তুই ভোগ করবি না?

হ্যাঁ, এইসব মেয়েরা সুন্দরী, যৌনবতী, কিন্তু এদের সাথে রবার্টের মনের দেওয়া নেওয়া চলবে কেমন করে? এদের কেউ মডেল, কেউ সেক্রেটারি, কেউ বিজ্ঞাপন সংস্থার উঁচু পদে কাজ করে, কেউ সবেমাত্র বিবাহ বিচ্ছেদ করেছে, কেউবা আইন বিশারদ। কিন্তু এদের কেউই সুশান নয়। এদের মধ্যে অনেক কিছুই সাধারণ আছে, কিন্তু সুশানের মতো আভিজাত্য? কৌতুকপ্রিয়তা? নাঃ, আমি আর নতুন করে জীবনটা শুরু করব না।

সি আই এর মধ্যে একটা গুপ্তচর ঢুকে পড়েছে, তাকে খেকশিয়াল নামে ডাকা হয়। ডেপুটি ডিরেক্টর এই কাজটা আমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন।

না, অ্যাডমিরাল, আমি পারব না। আমি আমার বউকে নিয়ে আবার হনিমুনে যাচ্ছি।

নতুনভাবে জীবনটা শুরু করা যায় কি? যার শেষটা হবে খুবই সুন্দর। না, জীবন কখনও দ্বিতীয় সুযোগ দেয় না। রবার্ট এখন একা।

— রবার্টকে নিজের হাতে বাজার-হাট করতে হয়। রান্না করতে হয়। তার মানে? দিনগুলো এখন খুবই খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে কাটছে। ওয়াশিংটনে টেলিফোন করলেন, ডিনারের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন প্রিয় বন্ধুদের। কিন্তু, রবার্ট এ ব্যাপারেও কেমন নিরাসক্ত। মনে পড়ে, ওই মেয়েটি, দুজনের জন্য কেমন সুন্দর ডিনারের ব্যবস্থা করেছিল।

রবার্ট বলেছিলেন- হ্যাঁ, আপনার রান্নার হাতটা দেখছি ভারী সুন্দর।

হঠাৎ আলাপ হওয়া ওই মেয়েটি বলল- হ্যাঁ, সর্বত্রই আমার এই চিহ্ন তুমি দেখতে পাবে। এসো, তোমাকে আমি আরও বেশি ভালোবাসা দেব।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি রবার্টের বুকে তার আঙুল রাখল। জিভে জিভে খেলা শুরু হল।

না, ব্যাপারটা আমি এমন করে ভাবছি কেন? এভাবে কি আর কাউকে ভালোবাসা যায়?

হঠাৎ মনের ভেতর কেমন একটা অনুভূতি। রবার্টের প্রথমবার মনে হল, সে নপুংসক। সে আর কখনও কোনো নারীকে তৃপ্ত করতে পারবে না।

মেয়েটি বলেছিল– এসো সোনা, সবকিছু আবার ভালোভাবে শুরু হোক। আমি জানি, তুমি এখন ক্লান্ত ধ্বস্ত। আমার কাছে রোগের উপশম আছে।

রবার্টের মনে হল, না, একা একা দিন কাটাতে হবে। আমি সুশানকে কষ্ট দেব না। আবার ভালোবাসার চেষ্টা করব।

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে, ও ও আই-এর এক উজ্জ্বল চোখের সেক্রেটারি। বিছানাতে সাংঘাতিক খেলোয়াড়। শরীরের সবখানে আঙুলের ছোঁয়া রাখে। সব কিছুতে মুখের পরশ। কিন্তু না, রবার্টের যৌনচেতনা আর জাগছে না। সুশানকে পেতে ইচ্ছে হচ্ছে তার। শেষ পর্যন্ত রবার্ট এইসব অভিযান ছেড়ে দিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, ডাক্তারের

কাছে যাবেন পরামর্শ করতে। লজ্জা মনে হল। এই সমস্যার সমাধান আছে কি? না, কোনো সমাধান নেই।

কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে শুরু করলেন। প্রতি সপ্তাহে সুশান অন্তত একবার করে ফোন করেন- লন্ড্রিতে তোমার শার্ট আছে, আনতে ভুলো না কিন্তু। আমি কি একজন কাজের মেয়ে পাঠাব? অ্যাপার্টমেন্টটা পরিষ্কার করবে। মনে হচ্ছে, সব জায়গা নোংরা হয়ে গেছে।

প্রত্যেকটি ফোনের পর নীরবতা, নিঃসঙ্গতা, একাকীত্বের যন্ত্রণা–সব মিলেমিশে একাকার।

বিয়ের আগের রাত, সুশানের ফোন রবার্ট, কালকে আমরা বিয়ে করতে চলেছি।

রবার্ট নিঃশ্বাস নিতে ভুলে গেছেন। কেমন যেন মাথাটা ঘুরছে তাঁর।

সুশানের আর্তনাদের শব্দ।

–আমি মন্টেকে ভালোবাসি। তোমাকেও ভালোবাসি অবশ্য। মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমি তোমাকে ভালোবেসে যাব। একথা আমি অস্বীকার করতে পারব না।

রবার্ট এখন কী বলবেন?

কিছুক্ষণের নীরবতা।

রবার্ট, তুমি ঠিক আছে তো?

–হা, ভালো আছি। আমাকে একটা সাহায্য করবে?

বল। –

-আমরা যেখানে হনিমুনে গিয়েছিলাম, লক্ষ্মীটি, সেখানে মন্টেকে নিয়ে যেও না, কেমন।

রবার্ট ফোনটা নামিয়ে রাখলেন। আবার মদ খেতে শুরু করলেন।

হ্যাঁ, অতীতের কথা মনে পড়ছে। ভাবতেই পারছি না, সুসান এখন অন্য আর একজনের। তাকে বর্তমানের মধ্যেই বাস করতে হবে। কাজ করতে হবে। আরও বেশি কাজ। সময় হয়েছে। লেসলির সঙ্গে কথা বলতে হবে। সেই ফটোগ্রাফার, যিনি অসাধারণ কিছু ছবি তুলেছিলেন, প্রত্যক্ষদর্শীদের নাম যিনি জানেন।

রবার্ট এবার তার কাজের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন।

.

১৮.

লেসলির মন আকাশে উড়ছে। লন্ডনে ফিরে আসার পর মনে হল, এই অতি মূল্যবান ফিল্ম নিয়ে সে এখন কোথায় যাবে? হাতের মুঠোয় স্বর্গ, সবকিছু, কিন্তু এখন কী করা যায়?

ভাবতে ভাবতে লেসলি ফিল্মটা গুটিয়ে রাখল। রিলগুলো একটা ট্যাঙ্কের মধ্যে ভরে দিল। ডেভলপ করতে হবে। ৬৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা দরকার। এগারো মিনিট কেটে গেছে। কাজ শুরু হয়ে গেছে।

ভীষণ-ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়েছে সে। যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে। না, কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

শেষ অব্দি নেগেটিভগুলো পরীক্ষা করল। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। এই তো, আহা, অসাধারণ।

প্রত্যেকটা ছবিকে একটুকরো হিরে বলা যেতে পারে। পৃথিবীর যে কোনো ফাটোগ্রাফার এমন ছবি তুলতে পেরে গর্বিত বোধ করতে পারে। ওই অদ্ভুত আকাশযানের সবকিছু পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। এমন কি, দুজন আগন্তুকের শরীরও।

লেসলির মনে হল, এখানে এমন কিছু আছে, যা ভালোভাবে দেখা দরকার। যেখানে ওই আকাশানটা পড়ে গেছে, সেখানে তিনটে ছোটো ছোটো কৌচ দেখা যাচ্ছে। তবে দুজন আগন্তুক। আর একজন? না, আরও একটা ব্যাপার সে স্পষ্ট দেখতে পেল। একজনের হাত কেটে নেওয়া হয়েছে।

তার মানে? এরা কি একহাতের মানুষ, নাকি অন্য কিছু? লেসলি ভাবল, এই ছবিগুলো নিয়ে এখনই আমাকে ছুটতে হবে। মা ঠিকই বলেছিল। আমি এক প্রতিভাধর মানুষ।

যখন আমি আবার এই ফিল্মগুলো ডেভেলপ করব, আমার নিজস্ব ম্যানসনে চলে যাব। ইটন স্কোয়ারে।

মহার্ঘ্য বস্তুগুলো হাতে রেখে লেসলি দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে, সে যেন সোনার খনির সন্ধানে জয়ী হয়েছে। এবার? এবার আমার আসল কাজ শুরু হবে।

অনেক দিন ধরে সে ভালো কাজের জন্য মাথা খুঁড়েছে। এখন আর অপেক্ষা করতে। পারছে না। এবার ছুটতে হবে। কোথায় যাওয়া যায়। ভাবতে ভাবতে লেসলি এগিয়ে চলেছে। সুখী সম্পৃক্ত জীবনের যাত্রাপথে।

.

রেস্টুরেন্টের এককোণে সে বসে আছে। এবার আসল লোকের সঙ্গে দেখা হবে। দুজন পরিচিতকে দেখতে পেল। বুঝতে পারল, একজন মাইকেল কায়েন, অন্যজন রজার মুর। আঃ, ভাবতেই পারা যাচ্ছে না। মা বেঁচে থাকলে, কত খুশি না হতেন। এইসব মুভি স্টারদের সম্পর্কে সে কত কথাই পড়েছে। দুজন বসে বসে গল্প করছেন। আর মাঝে মধ্যে লেসলির দিকে তাকাচ্ছেন। কেন?

লেসলি লাঞ্চ শেষ করেছেন, দুজন অভিনেতার পাশ দিয়ে হেঁটে গেছে। ওপরে গিয়ে টেলিফোন বুথের সামনে দাঁড়িয়েছে। সান পত্রিকার নাম্বারটা পেয়ে গেছে।

–আমি আপনাদের পিকচার এডিটরের সঙ্গে কথা বলতে চাইছি।

–উড়ন্তচাকির ছবি পেলে কেমন হবে? এমন কী দুজন অচেনা অজানা মানুষের ছবিও পাওয়া যাবে।

ফোনের অপর দিক থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল- যদি ছবিগুলো ভালো হয়, তাহলে আমরা ব্যবহার করতে পারব।

না, আমি সত্যি বলছি, যারা প্রত্যক্ষদর্শী তাদের সকলের নাম ঠিকানা তুলে দিতে পারব। এঁদের মধ্যে একজন ধর্মযাজক আছেন।

সঙ্গে সঙ্গে গলা পাল্টে গেল কোথায় এই ছবিগুলো নেওয়া হয়েছে?

– কথা দেখা হলে বলব, আপনি কি সত্যি রাজী আছেন?

–যদি ছবিগুলি সত্যি হয়ে থাকে, আমরা রাজী আছি।

কাজ এবার শুরু হয়েছে।

–ঠিক আছে, আমি যোগাযোগ করছি।

আবার দুটো ফোন করা হল। প্রত্যেকবারই একই জবাব পাওয়া গেছে। লেসলি বুঝতে পারল, প্রত্যক্ষদর্শীদের নাম ঠিকানা লিখে রাখাটায় আসল কাজ হয়েছে। কী ভালো হবে, ছবির তলায় তার নাম প্রকাশিত হবে।

সে রেস্টুরেন্ট থেকে বাইরে এল। আসার আগে ওই দুই ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বলল- আমাকে অটোগ্রাফ দেবেন?

দুজন টুকরো কাগজে নাম লিখে দিলেন।

ধন্যবাদ।

লেসলি বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সে আটোগ্রাফটা ছিঁড়ে ফেলল। ভাবল, না, কদিন বাদে ওঁরাই আমার অটোগ্রাফ নেবেন। আমি এ কী বোকামির কাজ করছি!

.

১৯.

রবার্ট ট্যাক্সি নিয়ে হোয়াইট চ্যাপেলের দিকে চলেছেন। শহরের মধ্যে দিয়ে পথ এগিয়ে গেছে। এটাকে আমরা লন্ডনের সবথেকে ব্যস্ত অঞ্চল বলতে পারি। শেষ অব্দি তিনি ঠিক জায়গাতে এসে পৌঁছোলেন। জ্যাক দ্য রিভারের জন্য এই জায়গাটা একসময় বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল।

ট্যাক্সিটা লেসলির বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে। রাস্তাঘাট কেমন অপরিচ্ছন্ন। শেষ অব্দি তিনি ২১৩ এ, গ্রোগ রোড়ে পৌঁছে গেলেন। ট্যাক্সি ছেড়ে দিলেন। দোতলা বাড়ি। ছোটো ছোটো ফ্ল্যাটে পরিণত করা হয়েছে। এর মধ্যে এমন এক মানুষের অবস্থান, যার হাতে প্রত্যক্ষদর্শীদের নাম ঠিকানা আছে।

.

লেসলি লিভিংরুমে বসেছিল। দরজার বেল আর্তনাদ করল। সে তাকাল। একটা ভয়, আবার আবার শব্দ হচ্ছে। সে ফটোগুলো নিয়ে গেল। ডাকরুমের মধ্যে পৌঁছে গেল। পুরোনো প্রিন্টের মধ্যে সেগুলো ঢুকিয়ে দিল। লিভিংরুমে ফিরে এল। দরজা খুলে দিল।

–আপনি কে?

–আমি কি ভেতরে আসতে পারি?

–হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কে?

রবার্ট তার পকেট থেকে ডিফেন্স মন্ত্রকের দেওয়া একটা পবিচয় পত্র বের করলেন। বললেন আমি এখানে দরকারী কাজে এসেছি। মিস্টার মাদারশেড, আমরা এখানে কথা বলতে পারি, কিংবা মন্ত্রণা সভায় যেতে পারি।

এটা একটা বাজে কথা। তিনি দেখতে পেলেন, এই কথাগুলো লেসলিকে দারুণ প্রভাবিত করেছে।

লেসলি আমতা আমতা করতে থাকে কী বিষয় নিয়ে আপনি কথা বলতে চাইছেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

রবার্ট ঘরে ঢুকে পড়লেন– আঃ, এখানে কি কোনো মানুষ থাকতে পারে?

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

আপনি কী বলবেন? এখানে কী করছেন?

–আপনি যে ফটোগ্রাফগুলো তুলেছেন সে সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাইছি।

কী আশ্চর্য, লোকটা জেনে গেছে? তার মানে? ভরে একটা শিহরণ।

লেসলি বলার চেষ্টা করেন আপনি কোন ফটোর কথা বলছেন?

রবার্ট শান্তভাবে বললেন- উড়ন্ত চাকির সামনে আপনি যেগুলো তুলছিলেন।

মাদার শেড রবার্টের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। তারপর বলল- হ্যাঁ, সেগুলো আপনাকে দিতে পারলে ভালো হত।

-কেন আপনি ছবিগুলো তোলেননি?

আমি চেষ্টা করেছিলাম।

কী বলছেন, চেষ্টা করেছিলেন?

–হ্যাঁ, ছবিগুলো ওঠেনি। আমার ক্যামেরায় গোলমাল ছিল। এইবার নিয়ে দ্বিতীয়বার এই ঘটনাটা ঘটল। আমি নেগেটিভগুলো পরীক্ষা করেছিলাম। ফিল্মটাই নষ্ট হল। আপনি তো জানেন, ফিল্মের দাম কত?

রবার্ট বুঝতে পারলেন লোকটা ভুল বকতে শুরু করেছে। ভয় পেয়েছে। রবার্ট সহানুভূতিসম্পন্ন কণ্ঠস্বরে বললেন- আহা, ছবিগুলো থাকলে ভালোই হত।

প্রত্যকদর্শীদের সম্পর্কে তিনি কিছুই বললেন না। যদি মাদারশেড ফটো সম্পর্কে মিথ্যে কথা বলে থাকে, তাহলে এই তালিকার সম্পর্কেও সে মিথ্যে কথা বলবে। রবার্ট চারদিকে তাকালেন। ফটোগ্রাফগুলো কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে। সহজেই পাওয়া যেতে পারে। এই ফ্ল্যাটে বেশি কিছু নেই। একটা ছোটো লিভিং, একটা বেডরুম, একটা বাথরুম, আর কী আছে– ক্লোসেট।

লোকটাকে চাপ দিলেই হয়তো আসল জিনিসটা বেরিয়ে আসবে। কিন্তু, এই ফটোগ্রাফগুলো নিয়ে আমি কী করব। আমাকে তো প্রত্যক্ষদর্শীদের তালিকাটা বের করতেই হবে।

মাদারশেড দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল– আহা, ছবিগুলো থাকলে আমি বড়োনোক হতে পারতাম।

রবার্ট বললেন- ওই আকাশযানটা সম্পর্কে বলুন তো।

মাদারশেড কাঁধে ঝাঁকুনি দিল। তার কণ্ঠে বিরক্তি।

আমি ভুলতে পারব না। ওই জাহাজটাকে মনে হয়েছে, ওটা বোধহয় জীবন্ত। ওর ভেতর একটা শয়তানি চিহ্ন আছে, ভয়ের বাতাবরণ, কেন তা বলতে পারব না।

বাসে যে সব প্যাসেঞ্জাররা ছিলেন তাদের সম্পর্কে?

মাদারশেড তাকাল। আমি তাদের সকলের নাম ঠিকানা জানি।

না, মাদারশেড বলতে থাকে, না, আমি তো তাদের সম্পর্কে কিছুই জানি না। তারা সকলেই অচেনা আগন্তুক।

–ঠিক আছে, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ছবিগুলো ওঠেনি বলে খারাপ লাগছে।

–আমারও খারাপ লাগছে, মাদারশেড বলল। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত আমি জিতে গেছি, জীবনযুদ্ধে।

রবার্ট দরজার তলার দিকে তাকিয়ে আছেন। চাপ দিলেই খুলে যাবে। পুরোনো দিনের তালা। তিনি তালা খুলে ফেললেন। মধ্যরাত। এবার কী অভিযান শুরু হবে। না, পরের দিনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ওই তালিকাটা আমার হাতে এসে গেলে, বাকি কাজটা করতে আর দেরি হবে না।

.

মাদারশেডের বাড়ির কাছাকাছি একটা ফ্ল্যাটে রবার্ট উঠলেন। জেনারেল হিলিয়াডকে ফোন করলেন।

–আমি ইংরাজ প্রত্যক্ষদর্শীর নাম পেয়ে গেছি জেনারেল।

–ঠিক আছে। আরও বলুন কমান্ডার।

–লেসলি মাদারশেড, সে হোয়াইট চ্যাপেলে থাকে, ২১৩এ, গ্রোগ রোড।

বাঃ, আমি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলছি।

রবার্ট আর কিছু বললেন না, ওই অন্যদের নামের তালিকা অথবা ছবিগুলো। তিনি জানেন, এটাই হল তুরুপের তাস।

.

ব্রম্পটন রোড- সেখানেই আছে রেগির একটা দোকান। ছোট্টো দোকান। কিন্তু অনেকেই এখানে নিয়মিত আসেন।

কাউন্টারের ধারে একটা ফোন, উলের সোয়েটার পরা একজন ফোনে কথা বলছেন। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি ইস্টএন্ডের বাসিন্দা। কী কথা? বুঝতে পারা যাচ্ছে কি?

রেগি কি শুনতে পাচ্ছো?

আমি বিশপ বলছি।

–রেগি, কথাটা কমে এল, ফিসফিসানি। আমাদের ক্লায়েন্টের নাম মাদারশেড লেসলি। ২১৩এ, গ্রোগ রোডের বাসিন্দা। আদেশটা যেন এখনই পালন করা হয়।

-ভেবে রাখবেন, এটা পালন করা হয়ে গেছে।

.

২০.

আহা, দিবাস্বপ্ন– লেসলি হারিয়ে গেছে। তাকে পৃথিবীর সমস্ত প্রেস ইন্টারভিউ করছে। স্কটল্যান্ডে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখান থেকে দক্ষিণ ফ্রান্স। একটা সুন্দর প্রমোদ তরণী কিনেছে সে। বলা হচ্ছে, মহারানি আপনাকে ডেকেছেন।

স্বপ্ন ভেঙে গেল, কলিংবেলের শব্দ। লেসলি দরজার দিকে তাকাল। এগারোটা, লোকটা কি আবার ফিরে এসেছে? সে দরজাটা খুলে দিল। একজন খর্বাকৃতি মানুষ। চোখে চশমা, মুখটা কেমন যেন।

লোকটা বলল-রাত এগারোটায় আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আমি শুনলাম, আপনি একজন ফটোগ্রাফার।

–তাতে কী হয়েছে?

–আপনি কি পাশপোর্টের ফটো তোলেন?

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

পাশপোর্টের ফটো? লেসলি মনে মনে হাসল। কিছুদিন বাদে যে হবে এই পৃথিবীর রাজা, তাকে এমন প্রশ্ন করা হচ্ছে? মাইকেল অ্যাঞ্জেলোকে বোধহয় বাথরুমের ছবি আঁকার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে!

না, লেসলি কঠিনভাবে বলল। সে দরজাটা বন্ধ করার জন্য এগিয়ে গেল।

-আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। সকাল আটটায়। আমার প্লেন টোকিওতে যাবে। আমার পাশপোর্টের ছবিটা নষ্ট হয়ে গেছে। তাই জন্য আমি আপনার কাছে এসেছি।

লোকটার চোখে জল।

মাদারশেড বলল- আমি দুঃখিত। আমি সাহায্য করতে পারব না।

–আমি আপনাকে একশো পাউন্ড দেব।

— লেসলির মুখে হাসি। লোকটা ভেবেছে কী? যার হাতে একটা দুর্গ আর একটা প্রমোদ তরণী, তাকে একশো পাউন্ড!

লোকটা তখনও বলে চলেছে, দুশো অথবা তিনশো পাউন্ড। দেখুন, আমাকে যে করেই হোক ওই প্লেনে উঠতেই হবে। তা না হলে আমি চাকরিটা হারাব।

তিনশো পাউন্ড, একটা পাশপোর্ট ছবি নেবার জন্য। দুশ সেকেন্ডের খেলা। মাদারশেড ভাবতে শুরু করল। তার মানে? এক মিনিটে আঠারোশো পাউন্ড। এক ঘণ্টায় কত? যদি সে রোজ আট ঘণ্টা করে কাজ করতে পারে তা হলে?

-কী আমার কথা শুনবেন কি?

মাদারশেড তাকাল। ভেতরে আসুন। ওই দেওয়ালের পাশে গিয়ে দাঁড়ান।

-ধন্যবাদ।

মাদারশেড ভাবল, একটা বোলারের ক্যামেরা থাকলে ভালো হত। ব্যাপারটা আরও সহজ হত। সে তার ভিভিটার ক্যামেরাটা নিয়ে বলল ওখানে দাঁড়ান।

দশ সেকেন্ড, কাজটা হয়ে গেছে।

–কিছুক্ষণের মধ্যেই ডেভেলপ করে দেব, আপনি কি একটু বাদে আসতে পারবেন?

–যদি আমি এখানে থাকি?

–আচ্ছা বসুন।

মাদারশেড ক্যামেরাটা নিয়ে ডার্করুমে চলে গেল। এবার ডেভলপিং-এর কাজ শুরু হবে। কোনো তাড়া আছে কি? পনেরো মিনিট কেটে গেছে। মাদারশেডের মনে হল, সে যেন পোড়া গন্ধ পাচ্ছে। এটা কি তার স্বপ্ন? সে দরজাটা খোলার চেষ্টা করল। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে।

মাদারশেড চিৎকার করল- হ্যালো? কী হয়েছে?

কোনো শব্দ ভেসে আসছে না।

-হ্যালো? সে আবার দরজায় হাত দিল। মনে হচ্ছে, এটা বোধহয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

কোনো উত্তর নেই। বিস্ফোরণের শব্দ। সব হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে। পোড়া গন্ধ সমস্ত ফ্ল্যাটে ছড়িয়ে পড়েছে। সে বুঝতে পারল, ফ্ল্যাটে আগুন লেগেছে। তাই বোধহয় ওই লোকটা পালিয়ে গেছে, কাউকে ডাকতে গেছে।

লেসলি আবার দরজায় ধাক্কা দিল- না, সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না।

সে চিৎকার করছে কেউ কি আছে? এখান থেকে আমাকে উদ্ধার করো।

দরজা দিয়ে হু-হু করে ধোঁয়া ঢুকতে শুরু করেছে। মাদারশেড বুঝতে পারল, এখন আগুনের তাপ আরও বেশি হবে। সে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। দম বন্ধ হয়ে আসছে। সে হাঁফাতে শুরু করে, জ্বলে যাচ্ছে। সব কিছু জ্বলে যাচ্ছে, সে অচেতন হয়ে পড়ল। হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসে পড়ল। ভগবান, আমাকে এখনই মেরে ফেলো না। আমাকে অনেক বড়োনোক হতে হবে।

.

ক্লার্ক রেগি কথা বলছি।

–আমার আদেশ পালিত হয়েছে?

–হ্যাঁ, ঠিক সময়ে আমরা দিয়ে এসেছি। রান্নাটা একটু বেশি ঝাল হয়ে গেছে, স্যার।

বাঃ, চমৎকার।

রবাট গ্রোগ রোডে এসে পৌঁছোল, রাত্রি দুটো। এবার আসল কাজটা শুরু হবে। ট্রাফিক জ্যামে আটকে পড়েছিল। এত ট্রাফিক? রবার্ট সামনে এল। এ কী? একতলাটা একেবারে ভস্মীভূত।

রবার্ট এক ফায়ারম্যানকে জিজ্ঞাসা করল– কী করে ঘটল?

–আমরা জানি না। আপনি একটু সরে যাবেন কি?

–আমার এক ভাই এই ফ্ল্যাটে থাকে, সে কি বেঁচে আছে?

–না, বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই।

রবার্ট দেখল, দুজন একটা দেহকে নিয়ে স্ট্রেচারে চাপিয়েছে। তাকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দেওয়া হবে।

রবার্ট আর্তনাদ করে ওঠে আমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে থাকতাম। আমার সব জামাকাপড় ভেতরে আছে। আমি কি একবার ভেতরে যাবার অনুমতি পাব?

ফায়ার ব্রিগেডের লোকটি মাথা নেড়ে বলল- না, ভেতরে গিয়ে কোনো লাভ নেই, স্যার। ওখানে কী দেখবেন? মুঠো মুঠো ছাই ছাড়া আর কিছু নেই।

তার মানে? ফটোগ্রাফগুলো সব ধ্বংস হয়ে গেল? প্রত্যক্ষদর্শীদের নামের তালিকা?

আঃ, রবার্ট ভাবল, জীবনটা কেন এত বিষাদঘন!

.

ওয়াশিংটন। ডাসটিন ফরনটন তার শ্বশুরের সঙ্গে এইমাত্র লাঞ্চ শেষ করলেন। এটা তার নিজস্ব ডাইনিং রুম। ডাসটিনকে কেমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বলে মনে হচ্ছে। শক্তিশালী শ্বশুরের সামনে এলে তিনি কেমন যেন হয়ে যান।

উইলার্ড স্টোন ভালো মুডে আছেন– গত সন্ধ্যায় আমি প্রেসিডেন্টের সাথে ডিনারের আসরে বসেছিলাম। ডাসটিন, তোমার কাজে উনি খুবই খুশি হয়েছেন।

সবই আপনার কৃপা।

–তুমি চমৎকার কাজ করেছ। তুমি আমাদের দেশকে রক্ষা করেছ।

হা, চেষ্টা করছি।

–ঠিক কথা, ভালোভাবে কাজ করে যাও। ডাসটিন, ভেবে দেখো, এর ওপর তোমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

একজন ঘরে এসে বলল- মি. স্টোন, ওঁরা এসে গেছেন। ওঁরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

স্টোন তার জামাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন- আমি লাঞ্চ শেষ করে আসছি। আমায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে। একদিন আমি তোমায় সব বুঝিয়ে বলব।

জুরিখের রাস্তাঘাট

২১.

জুরিখের রাস্তাঘাট। কত রকম মানুষের মিছিল এগিয়ে চলেছে। তার মধ্যে সুন্দরী মেয়েদের দেখা গেল। তারা মাংসের কারবারী। হ্যাঁ, পুরুষের কাঁচা মাংস।

এদের মধ্যে একজনকে আলাদা করে উল্লেখ করতে হয়। লম্বা, আচরণে আভিজাত্য। ওই অসামান্য রূপবতী। চোখের তারা সবুজ। সে বোধহয় এক রাজকন্যা। সকলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কারও দিকে তাকাচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত সে একটা রেস্টুরেন্টের টেবিলে গিয়ে বসল। চারদিকে তাকাল। ফিসফিসানি কণ্ঠস্বর।

ফ্রাঞ্চ, বুঝতেই পারছ, এমন সুযোগ জীবনে আসবে না। ৫০ হাজার ফ্রাঙ্ক, তোমার আর্দ্ধেক, আমার আর্ধেক। আমাকে কমিশন দেবে তো?

-হ্যাঁ, আমি দেব।

লোকটি বলল, যে কথাটি সে বলল না, তা হল আমার স্ত্রীকে বন্ধক দিয়ে আমি এই টাকাটা এনেছি।

বলো, আমি কি কখনো তোমাকে বিপথে চালনা করেছি।

হ্যাঁ, অনেক টাকা। লোকটি ভাবল, না, আর কোনোদিন আমি আমার স্ত্রীর সাহচর্য পাব না।

এসো, আমরা টাকার খেলায় মেতে উঠি।

–হ্যাঁ, আমি তোমার হাতে হাত মেলাব।

ফ্রাঞ্চ, ভবিষ্যতে কখনও আপসোস হবে না তো?

মেয়েটি তাকাল, এই সংলাপকে শেষ করতে হবে।

কোণের টেবিলে এক পুরুষ আর এক মহিলার মধ্যে চিৎকার শুরু হয়েছে।

-যিশুখ্রিষ্ট, তুমি কী করে জানলে যে, তুমি গর্ভবতী।

মনে মনে, বোকা হদ্দ, কুকুরি কোথাকার।

–বোকার মতো প্রশ্ন করো না। তোমার ওটাই তো এই কাজটা করেছে।

–হ্যাঁ, এবার সাবধানে আলোচনা করতে হবে।

–টিনা, ব্যাপারটা মেটাতে হবে। তুমি কি গর্ভপাতে রাজী হবে?

না, আমি তোমার বউকে সব বলে দেব।

-শোনো হনি, এখন একটা খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। এখন এরকম আচরণ করো না, লক্ষ্মীটি।

সময়টাও আমার কাছে ভালো নয় পল, আমি ভাবতেই পারছি না, তুমি আমাকে ভালোবাসতে না।

–তোমাকে আমি ভালোবাসি সোনা। কিন্তু আমার বউয়ের কানে খবরটা পৌঁছে দিও না।

-হ্যাঁ, আমি সবই বুঝতে পারছি। তুমি কেন বুঝতে পারছ না, আমার পেটে তোমার বাচ্চা।

হনি, চুপ করো-চুপ করো। ওই ছেলেটিকে আমিও তো ভালোবাসব।

পাশের টেবিলে এক পুরুষ একা বসে আছে। মনে মনে সে ভাবছে, তারা আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল, আমি কেন বোকার মতো আচরণ করলাম। সব টাকাটা ঢেলে দিয়েছি। অডিটররা আসার আগেই আমাকে পালাতে হবে। না, জেলের জীবন আমি সইতে পারব না। আত্মহত্যা করব। আমি নিজেকে মেরে ফেলব।

আর একটি টেবিলে নারী এবং পুরুষের মধ্যে কথাবার্তা মাঝপথে থেমে গেছে।

আমাকে ওই পাহাড়ের ওপর নিয়ে যাবে? হ্যাঁ, আগামী সপ্তাহে আমি যাব।

এসো, আমরা দুজনে বিছানায় শুয়ে সময় ভাগাভাগি করি।

আমি জানি না ব্যাপারটা কেমন হবে।

–এর মধ্যে আর যৌনতা এনো না। বুঝতে পারছ, তোমায় কিছুক্ষণ শান্ত থাকতে হবে। আমাকে তুমি ভাই হিসেবে ভাবতে পারো।

সুন্দরী মেয়েটি চারদিকে তাকাল। বিভিন্ন ভাষায় কথা হচ্ছে। সে বেশিক্ষণ সেখানে থাকবে না। তাকে এবার উঠতে হবে। তার হাতে একটা ছোট্ট ট্রান্সমিটার। এর ভেতর নিওরোনেট সিস্টেম আছে। যার অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, অন্য কোনো মহাপৃথিবীতে। অসংখ্য কোশের সমাহার। যদি কোনোটা মরে যায়, অন্যটা সঙ্গে সঙ্গে বেঁচে উঠবে।

সে কিছু ভাবার চেষ্টা করল। না, আর দাঁড়াতে পারছে না। দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

ক্যাশিয়ার বলল- মিস, আপনি দাম দিতে ভুলে গেছেন।

আমি দুঃখিত। আপনারা যে টাকাপয়সা লেনদেন করেন, আমার কাছে তা নেই।

–আপনি পুলিশের সঙ্গে কথা বলুন।

যুবতী মেয়েটি ক্যাশিয়ারের চোখের দিকে তাকাল। সে ওখান থেকে বেরিয়ে এল।

না আমাকে কিছু একটা করতেই হবে। তা না হলে আমি বাঁচব কী করে?

জল ছাড়া আমি বেঁচে থাকতে পারব না!

.

২২.

পঞ্চম দিন, বার্ন, সুইজারল্যান্ড।

রবার্ট এখন সিদ্ধান্তের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন। তিনি নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করছেন। রবার্ট ভাবলেন, গল্পটা কি এখানেই শেষ হয়ে গেল? যখন আমি মাদারশেডের ফ্ল্যাটে ঢুকেছিলাম, তখন কেন আর একটু তৎপর হলাম না। হানস বেকারম্যান একবার বলেছিলেন, কোনো কাজ ফেলে রাখতে নেই।

এখন আমি কী করব?

বার্ন এয়ারপোর্টে তিনি একটা গাড়ি ভাড়া নিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে এগিয়ে চললেন। বানের প্রধান রাস্তা। চারপাশে সুন্দর বাড়ি।

রবার্ট প্রশাসন ভবনের সামনে এসে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিলেন। রিসেপশন হলে পৌঁছে গেলেন।

বেকারম্যান বলেছিলেন, এই ভদ্রলোক একজন জার্মান। সোমবার তিনি তার লেকচার দেবেন।

রিসেপশনিস্ট মহিলার সাথে কথা হল। রবার্ট তার প্রতীক পত্রটা বের করে বললেন ইন্টারপোল। আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ অন্বেষণার কাজে এখানে এসেছি। মিস, আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন?

কী ধরনের কাজ?

–আমি একজন প্রফেসারের সন্ধান করছি।

—তার নাম কী?

–আমি তার নাম জানি না।

নাম জানেন না, তাহলে পাবেন কী করে?

–তিনি একজন ভিজিটিং প্রফেসার। কয়েকদিন আগে এখানে লেকচার দিয়েছেন।

প্রত্যেকদিন কত আমন্ত্রিত অধ্যাপক এসে ভাষণ দেন। তার বিষয় কী? কী বলছেন?

–তিনি কী বিষয়ে পড়ান?

–আমি জানি না।

–তাহলে, আমি তো আপনাকে সাহায্য করতে পারব না। এইসব অবান্তর প্রশ্ন শোনার মতো সময় আমার হাতে নেই।

ভদ্রমহিলা অন্য দিকে মাথা ঘুরিয়ে নিল।

-না, বাজে প্রশ্ন নয়। আমি কি আপনাকে বলতে পারি? ওই ভদ্রলোক একটা বেশ্যাচক্রের সঙ্গে জড়িত।

রিসেপশনিস্ট মেয়েটির মুখ কালো হয়ে গেল।

ইন্টারপোল অনেক দিন ধরেই ওনার অনুসন্ধান করছে। ওনার সম্পর্কে টাটকা খবর পাওয়া গেছে। উনি এখন জার্মান দেশে আছেন। উনি এই মাসের পনেরো তারিখে এখানে এসে একটা লেকচার দিয়েছিলেন। যদি আপনি আমাকে সাহায্য করতে চান, তাহলে ভালো হয়। আর যদি না করতে চান, তাহলে আমরা সরকারি তরফ থেকে তল্লাশি চালাব। আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কলঙ্কিত হবে।

না-না, মেয়েটি বলে উঠল– ইউনিভারসিটির সাথে এই ধরনের নোংরা ব্যাপার কখনওই জড়াবেন না। ঠিক আছে, আমি দেখছি, উনি কবে লেকচার দিয়েছিলেন?

-পনেরো তারিখ, সোমবার।

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। ফাইলিং ক্যাবিনেটের দিকে হেঁটে গেল। সে সেটা খুলল। কতগুলো কাগজ দেখে বলল, এই তো পাওয়া গেছে। সেদিন তিনজন গেস্ট প্রফেসার এসেছিলেন।

–আমি যাঁকে খুঁজছি, তিনি জার্মানদেশীয় ভদ্রলোক।

-এঁরা সকলেই জার্মান দেশের মানুষ। একজন অর্থনীতিবিদ, একজন রসায়নবিদ, একজন মনোস্তত্ত্ববিদ।

–আমি কি দেখতে পারি?

উদাসীনভাবে মেয়েটি কাগজগুলো তুলে দিল।

রবার্ট কাগজগুলো ভালো করে পরীক্ষা করলেন। প্রত্যেকের নাম এবং বাড়ির ঠিকানা লেখা আছে।

–আমি প্লিজ এগুলো কপি করে আপনাকে দেব?

মেয়েটি জানতে চাইল।

— না, ধন্যবাদ। রবার্ট নাম ঠিকানাগুলো মনে রেখেছেন।

তারপর তিনি বললেন- না, এঁদের কাউকেই আমি খুঁজছি না।

মেয়েটির চোখে মুখে উদ্বেগহীনতার চিহ্ন–অনেক-অনেক ধন্যবাদ। হায়, বেশ্যাবৃত্তি, আমরা কখনও এ ধরনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ি না।

-আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে দুঃখিত।

রবার্ট টেলিফোন বুথের দিকে এগিয়ে গেলেন।

প্রথমেই তিনি বার্লিনে ফোন করলেন প্রফেসার টুবেল?

–হ্যাঁ।

–আমি সানসাইন ট্যুরিস্ট বাস কোম্পানি থেকে বলছি। গত রোববার আপনি চশমা ফেলে গেছেন, যখন আপনি সুইজারল্যান্ড বেড়াতে এসেছিলেন।

-আপনি কে বলছেন, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

–আপনি কি ১৪ তারিখে সুইজারল্যান্ডে গিয়েছিলেন? নাকি আমার ভুল হচ্ছে?

–না-না, ১৫ তারিখে। বার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা লেকচার দিতে।

আপনি কি বাসে করে টুর করেননি?

না, এসব বাজে ব্যাপারে যোগ দেবার মতো সময় আমার হাতে ছিল না। আমি একজন ব্যস্ত মানুষ।

ভদ্রলোক টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে দিলেন।

দ্বিতীয় কলটি করা হল হামবুর্গে।

–অধ্যাপক হেইনরিচ বলছেন?

-হ্যাঁ, আমি অধ্যাপক হেইনরিচ বলছি।

–সানসাইন ট্যুরিস্ট বাস কোম্পানি থেকে কথা বলছি। আপনি সুইজারল্যান্ডে গিয়েছিলেন ১৪ তারিখে?

–কেন, আপনি জানতে চাইছেন?

–আমরা আমাদের বাসে আপনার ব্রিফকেস খুঁজে পেয়েছি প্রফেসার।

–আপনি ভুল লোককে ধরেছেন। আমি তো কখনও আপনার বাসে চড়িনি।

তৃতীয় ফোনটা করা হল মিউনিখে।

–প্রফেসার অটোস্মিডট?

–হ্যাঁ।

–প্রফেসার স্মিটট, আপনি সানসাইন ট্যুরিস্ট বাস কোম্পানির তরফ থেকে বলছি। আমাদের বাসে আপনি চশমা ফেলে গেছেন?

–আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে।

রবার্টের মন এখন নানা সমস্যায় জর্জরিত। তাহলে? কী করে যোগাযোগ হবে?

কণ্ঠস্বর শোনা গেল– এই তো চশমা আমার হাতেই আছে।

–আপনি কি ঠিক বলছেন প্রফেসার? আপনি ১৪ তারিখে আমাদের বাসে ওঠেননি?

–হা-হা, আমি উঠেছিলাম। কিন্তু আমি তো কিছু হারাইনি।

–আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রফেসার, রবার্ট টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন। শেষ পর্যন্ত আমি জ্যাকপটটা পেয়ে গেছি।

.

দু-মিনিটের মধ্যে রর্বাট জেনারেল হিলিয়াড়ের সাথে কথা বললেন।

দুটো বিষয়ে কথা বলতে হবে, লন্ডনের প্রত্যক্ষদর্শীর ব্যাপারে আমি আগেই বলেছিলাম।

-হ্যাঁ।

–গত রাতে অগ্নিকাণ্ডে তার মৃত্যু হয়েছে।

সত্যি? খুবই খারাপ খবর।

-হ্যাঁ, স্যার। আর একজন প্রত্যক্ষদর্শীকে আমি চিহ্নিত করতে পেরেছি। আমি শীগগিরই। তার সম্বন্ধে খবর পাঠাচ্ছি।

কমান্ডার, আপনার খবরের জন্য আমি অপেক্ষা করব।

.

জেনারেল হিলিয়াড জানুসকে রিপোর্ট দিচ্ছিলেন।

কমান্ডার বেলামি আর একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সন্ধান পেয়েছেন।

–ভালো। দলটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। খুব তাড়াতাড়ি এই ফাইলগুলো বন্ধ করতে হবে।

–আরও খবর শিগগিরই দেব।

–খবর নিয়ে আমার কী হবে। আমি ফল চাইছি।

–হ্যাঁ, জানুস।

মিউনিখের শান্ত সুন্দর আবাসন এলাকা। ৫ নম্বর বাড়িটা সহজেই পাওয়া গেল। লেখা আছে অধ্যাপক অটোস্মিডট। রবার্ট বেল বাজালেন।

অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে গেল। লম্বা শীর্ণ চেহারার এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। রবার্ট জানতে চাইলেন- অধ্যপক স্মিডট?

-হ্যাঁ।

–আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছি।

আমরা আগেই কথা বলেছি, অধ্যাপক স্মিডট বললেন। আপনি তো আজ সকালে আমাকে ফোন করেছিলেন, তাই না? মানুষের কণ্ঠস্বর চিনতে আমার ভুল হয় না। আসুন।

রবার্ট লিভিংরুমে ঢুকে পড়লেন। মেঝে থেকে ছাদ অব্দি শুধু বই আর বই। বইয়ের এক মহাসমুদ্র। টেবিলে, মেঝেতে চেয়ারে– সব জায়গায় বই পড়ে আছে।

–আপনি কি সানসাইন ট্যুরিস্ট বাস কোম্পানিতে ছিলেন?

হা।

রবার্ট আমতা আমতা করতে থাকেন।

–আপনি কি আমেরিকান?

–হ্যাঁ।

–তাহলে আপনি এখানে কেন এসেছেন? আমার হারানো চশমা দিতে নয়, নিশ্চয়ই।

–হ্যাঁ, আমি বুঝিয়ে বলছি।

–আমি যে উড়নচাকি দেখেছি, আপনি কি সেটার ব্যাপারে আগ্রহী? অভিজ্ঞতা মোটেই ভালো নয়। আমি ভেবেছিলাম, ওটা আছে, কিন্তু জীবনে দেখতে পাব, তা কোনো দিন ভাবতে পারিনি।

–এটা দেখে আপনি কি খুব আঘাত পেয়েছেন?

–হ্যাঁ।

–আপনি কি একটু গুছিয়ে বলবেন?

–এটা প্রায় জীবন্ত, নীল রঙের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে অথবা ধূসর, আমি ঠিক বলতে পারব না।

ম্যানডেলের বর্ণনা মনে পড়ে গেল রবার্টের আলো রং পাল্টাছিল, কখনও নীল, কখনও সবুজ।

–এটা ভাঙা অবস্থায় পড়েছিল, দুটো শরীর ভেতরে ছিল, ছোটো কিন্তু মস্ত বড়ো চোখ। তারা রূপোর পোশাক পরেছিল।

–আপনার সহযাত্রীদের সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন?

–আমার সহযাত্রীরা?

–হ্যাঁ।

অধ্যাপক কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন তাদের কাউকেই চিনি না। তারা সকলেই সম্পূর্ণ অচেনা। পরের দিন সকালে আমাকে যে ভাষণ দিতে হবে, তা নিয়ে আমি ব্যস্ত ছিলাম।

রবার্ট ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালেন, অপেক্ষা করলেন।

অধ্যাপক বললেন- যদি আপনার সাহায্য হয়, তাই বলছি, আমি রসায়ন পড়াই, কিন্তু মানুষের ভাষা অন্বেষণ করা আমার অন্যতম হবি।

–আপনি কী পর্যবেক্ষণ করেছিলেন?

–এক ইতালিয় ধর্ম্যাজক ছিলেন, একজন হাঙ্গারির বাসিন্দা, এক আমেরিকান টেকসান ভাষায় কথা বলছিলেন, এক ব্রিটিশ, এক রাশিয়ান মেয়ে।

রাশিয়ান?

–হ্যাঁ, উনি কিন্তু মস্কো থেকে আসেননি, আমি ওনার ভাষা শুনে বুঝেছি, উনি এসেছেন কিয়েত থেকে। অথবা কিয়েতের কাছাকাছি কোনো অঞ্চল থেকে।

রবাটের অপেক্ষা, তারপর জিজ্ঞাসা–ওনারা কেউ কি নাম বলেছিলেন। অথবা নিজস্ব পেশা সম্পর্কে আলোচনা?

–আমি দুঃখিত, আমি তো আগেই বলেছি, লেকচার নিয়ে মনটা ভারাক্রান্ত ছিল। অন্য কোনো দিকে মন দিতে পারিনি। টেকসান ভদ্রলোক আর ওই যাজক মশাই পাশাপাশি বসেছিলেন। টেকসান ভদ্রলোক বকর বকর করেই চলছিল। ব্যাপারটা খুবই আপত্তিকর। আমার মনে হল বেচারা যাজক বোধহয় মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছেন না।

যাজক?

–উনি রোমান টানে কথা বলছিলেন।

–আর কিছু?

অধ্যাপক কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন- না, আমি আর কিছু বলতে পারছি না। মুখ থেকে পাইপ বের করলেন। তারপর বললেন, এই তথ্যগুলো কি আপনার কাজে লাগবে?

হঠাৎ একটা জিনিস মাথায় এল রবার্টের। আপনি একজন রসায়নবিদ? •

-হ্যাঁ।

–আচ্ছা অধ্যাপক, দেখুন তো এটাকে চিনতে পারেন কিনা?

রবার্ট পকেট থেকে বেকারম্যানের দেওয়া ধাতুর টুকরোটা অধ্যাপকের হাতে তুলে দিলেন।

অধ্যাপক স্মিডট এই বস্তুটা হাতে নিলেন। পরীক্ষা করলেন। মুখের ভাষা পাল্টে গেল। উনি বললেন- কোথা থেকে এটা পেলেন?

–আমি বলতে পারব না। বলুন এটা কী?

–এটা কোনো বিকিরিত যন্ত্রের অংশবিশেষ।

আপনি ঠিক বলছেন?

–এখানে যে ক্রিস্টালটা আছে, সেটা হল ডিলিথিয়াম। সেটা কোথাও পাওয়া যায় না। আমি তো ভাবতেই পারছি না, এটা কোথা থেকে পেলেন। হায় ঈশ্বর, আমি কোনোদিন এই ধরনের ধাতব টুকরো দেখিনি। আপনি কি এটা আমাকে দেবেন? আমি তা হলে বর্ণালী পরীক্ষা করব।

না, অধ্যাপক, তা দেওয়া যাবে না।

–কিন্তু...

দুঃখিত, রবার্ট ধাতব টুকরোটা চেয়ে নিলেন।

অধ্যাপক খুবই দুঃখ পেয়েছেন, তিনি বললেন- ঠিক আছে, আবার দেখা হবে। সঙ্গে কার্ড আছে?

রবার্ট দুঃখিত স্বরে বললেন না, আমি কার্ড সঙ্গে আনি নি।

অধ্যাপক স্মিডট শান্তভাবে বললেন আমি তাই অনুমান করেছিলাম।

.

-কমান্ডার বেলামি কি লাইনে আছেন?

জেনারেল হিলিয়াড টেলিফোন নিলেন- হ্যাঁ, কমান্ডার বলুন।

সর্বশেষ যে প্রত্যক্ষদর্শীর নাম পাওয়া গেছে, উনি হলেন অধ্যাপক স্মিডট। উনি প্ল্যাটারসে বাস করেন, ৫ নম্বর বাড়ি

রবার্ট, বুঝতে পারলেন, যিনি শুনছেন তিনি আরও তথ্য পেতে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

রবার্ট তখনও বলে চলেছেন- আর কোনো প্রত্যক্ষদর্শীকে পাব কিনা বুঝতে পারছি না।

না, বিফলতা শব্দটাকে রবার্ট ঘৃণা করেন। সকলের পরিচয় মোটামুটি পাওয়া গেছে, একজন টেকসাসবাসী, এক ধর্মযাজক, উনি এসেছেন রোম থেকে, লক্ষ লক্ষ ধর্মযাজক রোমে বসবাস করেন। কী করে ওনাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করব? না, আমি ওয়াশিংটনে ফিরে যাই, নাকি রোমে গিয়ে শেষ চেষ্টা করে দেখব?

.

বার্লিন শহর, প্রশাসনিক ভবন। দোতলাতে আছে কনফারেন্স রুম। এখানকার প্রধান ইন্সপেক্টর অটো জোয়াকিন। মেসেজ করছেন। দুবার করলেন। লাল টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

.

ছ নম্বর দিন মিউনিখ, জার্মানি

পরের দিন সকালে অটোস্মিডট তাঁর কেমিস্ট্রি ল্যাবোরেটরির দিকে এগিয়ে চলেছেন। আগের সন্ধ্যাবেলা ওই আমেরিকান আগন্তুকের সঙ্গে তার যে কথা হয়েছিল, সে বিষয়ে ভাবছিলেন। ব্যাপারটা আশ্চর্যের। আমেরিকান ভদ্রলোক তাকে অবাক করে দিয়েছেন। তিনি কেন বাসের সহযাত্রীদের সম্পর্কে আগ্রহী? আমরা সবাই ওই ফ্লাইং সসারটা দেখেছি বলে? কেন এ বিষয়ে আর কথা বলতে চাইলেন না? নাঃ, খুবই ভাববার মতো জিনিস।

অধ্যাপক ল্যাবোরেটরিতে ঢুকলেন। জ্যাকেট খুলে টাঙিয়ে রাখলেন। অ্যাপ্রন পরলেন। টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। অনেক সপ্তাহ ধরে তিনি এখানে একটা রাসায়নিক পরীক্ষা করছেন। যদি এই পরীক্ষাটা শেষ পর্যন্ত সফল হয়, তিনি হয়তো নোবেল পুরস্কার পেয়ে যাবেন। তিনি দুটো তরল পদার্থের মধ্যে মিশ্রণ ঘটালেন। অবাক কাণ্ড। এত উজ্জ্বল হলুদ আলো আসছে কোথা থেকে।

বিস্ফোরণটা ছিল ভয়ঙ্কর। পুরো ল্যাবোরেটরি ভবনটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। দেওয়ালের গায়ে লেপটে গেল কাঁচ এবং মানুষের মাংসের টুকরো।

গুরুত্বপূর্ণ খবর চরম গোপনীয়তার সঙ্গে পাঠ করতে হবে।

চার নম্বর চিহ্নিত মানুষ অটোস্মিডট, শেষ হয়ে গেছে।

খবর শেষ হল।

বেচারী রবার্ট, তিনি অধ্যাপকের মৃত্যুসংবাদ জানতে পারেননি। তখন তিনি প্লেনে চড়ে বসে আছেন, গন্তব্য রোম।

.

২৩.

ডাসটিন ফরনটন অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। তার হাতে এখন অসীম ক্ষমতা। অনেকটা মদের মতো। তিনি আরও চাইছেন। তার শ্বশুরমশাই উইলার্ড স্টোন শপথ নিয়েছেন।

ফরনটন শ্বশুরের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছেন। এখন শ্বশুরের সঙ্গেই লাঞ্চ করেন তিনি।

একবার শ্বশুরমশাইকে ফোন করলেন। সেক্রেটারি বললেন- আমি দুঃখিত, মি. স্টোন আজ আর আসবেন না।

–খুবই খারাপ লাগছে। আগামী শুক্তবারের লাঞ্চের ব্যাপারে কিছু বলা আছে কি?

দুঃখিত মি. ফরনটন, মি. স্টোন আগামী শুক্রবারে থাকবেন না।

ব্যাপারটা খুবই অবাক করা। ফরনটনের সাথে দু-সপ্তাহ আগে কথা হয়েছিল। একই উত্তর ভেসে এসেছে। উনি গেলেন কোথায়? প্রতি শুক্রবার কেন থাকেন না? উনি কি গলফ খেলেন? অথবা ওনার অন্য কোনো হবি আছে?

এই সমস্ত প্রশ্নের একটিই উত্তর। তা হল এক রূপসী সুন্দরী।

উইলার্ড স্টোনের স্ত্রী প্রচন্ড সামাজিক। অনন্ত অর্থশালিনী। তিনি তার স্বামীর মতোই শক্তিশালী। কোনো ব্যাপারে অনুশোচনা করেন না।

ডাসটিন ফরনটনের মনে হল, ব্যাপারটার শেষ দেখে ছাড়তে হবে।

.

ভোর পাঁচটা, পরের শুক্রবার ডাসটিন ফরনটন একটা গাড়িতে বসে আছেন। উইলার্ড স্টোনের বাড়ি থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে। কনকনে হাওয়া বইছে। ভোর হবার আর বেশি বাকি নেই।

স্টোনের এই স্বাভাবের অন্তরালে কী আছে, তা দেখতেই হবে। হঠাৎ ফরনটনের মনে হল, এভাবে বাজে সময় নষ্ট করে কী লাভ? এখন সকালে সাতটা, ড্রাইভওয়েের দরজা খুলে গেল। একটি গাড়ি বেরিয়ে এল। উইলার্ড স্টোন বসে আছেন চালকের আসনে। কিন্তু তার পরিচিত লিমুজিন গাড়ি নয়। এটা একটা ছোট্ট কালো ভ্যান, বাড়ির লোকেরা

এটা ব্যবহার করে থাকেন। ফরনটনের সমস্ত শরীরে উত্তেজনা। উনি বুঝতে পারছেন। এই নাটকের অন্তরালে আছে অবশ্যই এক রহস্যময়ী নারী।

ফরনটন ওই গাড়িটিকে অনুসরণ করতে থাকেন। পথ চলে গেছে আরলিঙ্গটনের দিকে।

ব্যাপারটা খুব সাবধানে পরিচালনা করতে হবে, ফরনটন ভাবলেন, সামান্য ভুল হলেই সর্বনাশ।

নিজের ভাবনায় ফরনটন ব্যস্ত ছিলেন, তাই হয়তো আর অনুসরণ করতে পারলেন না।

কালো ভ্যানটা একটা ড্রাইভওয়েতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ডাসটিন ফরনটন গাড়ি থামালেন। এখন কোন্ দিকে যাবেন? বুঝতে পারা যাচ্ছে না। এখন কি অপেক্ষা করবেন? দেখবেন। কোন মহিলা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়?

ফরনটন গাড়িটাকে দাঁড় করালেন। ছোট্ট পথ দিয়ে এগিয়ে গেলেন। এই তো দোতলা বাড়ি। এখানেই আমার শ্বশুরমশাই ঢুকেছেন। বাড়ির পেছনে চলে যাওয়াটা কোনো সমস্যা নয়। ফরনটন গেট খুললেন। ভেতরে ঢুকলেন। আহা, ভারী সুন্দর সাজানো বাগান।

তিনি গাছের ছায়ার ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। পেছনের দরজার দিকে চলে গেলেন। এখন কী করবেন? হাতে প্রমাণ চাই। টাটকা তাজা প্রমাণ। তা না হলে বৃদ্ধ মানুষটি হো-হো করে হেসে উঠবেন।

ফরনটন দেখলেন, পেছনের দরজায় কোনো তালা নেই। তিনি টুক করে ভেতরে ঢুকে পড়লেন, একটা বিরাট পুরোনো দিনের কিচেনে পৌঁছে গেলেন। আশেপাশে কেউ নেই।

সামনে এগিয়ে গেলেন। মস্ত বড়ো রিসেপশন হল। তার পাশে একটা লাইব্রেরি। ফরনটন ধীরে ধীরে হাঁটছেন। শব্দ শোনা যাচ্ছে কি? না, জীবনের উন্মাদন নেই। তা হলে? বুড়ো শ্বশুরমশাই নিশ্চয়ই এখন তার বেডরুমে আছেন।

ফরনটন আর একটা দরজার সামনে এগিয়ে গেলেন। ওর কী? শ্বশুরমশাই দাঁড়িয়ে আছেন। চারপাশে অন্তত বারোজন লোক বসে আছেন। বিরাট টেবিলের চারপাশে।

উইলার্ড স্টোন শান্ত গলায় বললেন– ভেতরে এসো ডাসটিন, আমরা সকলে তোমার অপেক্ষায় বসে আছি।

.

২৪.

রোম শহরটা বারবার রবার্টকে অবাক করে দেয়। একটা অদ্ভুত স্মৃতির উন্মাদন। এখানেই সুশানের সঙ্গে কাটানো মধুচন্দ্রিমার প্রহর। আহা, কত-কত শুভ মুহূর্তের সমাহার। রোম শহরের নানা দিকে এত স্মৃতির সমাহার, রবার্টের ভালো লাগে না।

রবার্ট ভাবলেন, আমি কী কাজ করছি? আমি এই কাজে সফল হতে পারব?

ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত তাড়না। যে করেই হোক আমাকে সফল হতে হবে। তা না হলে নিজের সাথে লড়াইতে আমি হেরে যাব। হোটেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের মুখে এক গাল হাসি।

কমান্ডার বেলামি, কতদিন বাদে আপনার সাথে দেখা হল বলুন তো?

ধন্যবাদ, পিয়েত্রো। এক রাতের জন্য একটা ঘর পাব?

–আপনার জন্য আমার দরজা সবসময় খোলা।

আগে যে ঘরে রবার্ট ছিলেন, সেই ঘরটি তাকে দেওয়া হল।

কমান্ডার কিছু লাগলে বলবেন।

আমার কী চাই, কমান্ডার ভাবলেন, একটা অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনাপ্রবাহ।

মনটাকে পরিষ্কার করতে হবে। একজন ধর্মযাজক কেন রোম থেকে সুইজারল্যান্ডে যাবেন। অনেকগুলো সম্ভাবনা আছে। ছুটি কাটাতে যেতে পারেন, অথবা যাজকদের ধর্মসভায় যোগ দিতে। তিনি ছিলেন ওই বাসের একমাত্র যাজক। এর থেকে কী প্রমাণিত হচ্ছে। উনি কোনো দলে যাননি। তাহলে? বন্ধুদের কাছে বেড়াতে যাওয়া অথবা পরিবারের মানুষদের নিয়ে। কিংবা উনি একটা দলে ছিলেন। দলভুক্ত অন্য সদস্যরা শেষ মুহূর্তে মত পাল্টে ছিলেন। রবার্টের চিন্তাধারা ঘুরতে থাকে বৃত্ত করে।

তিনি আবার চিন্তার প্রথম অধ্যয়ে ফিরে এলেন। কীভাবে ওই যাজকমশাই সুইজারল্যান্ডে গিয়েছিলেন। তাঁর গাড়ি না থাকার সম্ভাবনা বেশি। কেউ কি লিভ দিয়েছিল? প্লেনে ভ্রমণ? ট্রেন অথবা বাস! যদি ছুটি কাটাতে যান তা হলে বেশি সময় হাতে ছিল না। প্লেনে ওঠার সম্ভাবনাই বেশি। এবার, এবার চিন্তাধারা কেন্দ্রীভূত হল। এয়ার লাইন্সে গেলে কী হয়? সেখানে তো যাত্রীদের পেশার কথা লেখা থাকে না, আর যদি? ওই যাজক অন্য কোনো নাম নিয়ে থাকেন? না, কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

.

ভাটিকান, মহামান্য পোপের রাজকীয় প্রাসাদ। ভাটিকান হিলের ওপর অবস্থিত। টিবা নদীর পশ্চিমপ্রান্তে, রোম শহরের উত্তর-পশ্চিমে। এখানে সেন্ট পিটারস ব্যাসিলিকা নামে একটি অসাধারণ স্থাপত্য কর্ম আছে। একদা যা মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর দ্বারা চিত্রিত হয়েছিল। আছে উঁচু পিজা, সারাদিন এখানে ধর্মসংগীত শোনা যায়।

রবার্ট এখানে এসে পৌঁছে গেছেন। তিনি জনসংযোগ অফিসে এলেন।

এক তরুণ ভদ্রলোক জানতে চাইলেন- বলুন স্যার, আপনাকে কীভাবে আমি সাহায্য করতে পারি?

রবার্ট তাঁর পরিচয়পত্রটা দেখালেন– আমি টাইম ম্যাগাজিনের তরফ থেকে এখানে এসেছি। আমি কয়েকজন ধর্মযাজকের ব্যক্তিগত জীবন এবং দর্শন সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখতে আগ্রহী, তারা সুইজারল্যান্ডে একটা কনভোকেশনে গিয়েছিলেন। দু-সপ্তাহ আগে। আপনি এ ব্যাপারে কোনে খবর দিতে পারবেন কি?

ভদ্রলোক বললেন- হ্যাঁ, কয়েকজন ধর্মযাজককে ভেনিসে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সুইজারল্যান্ডে নয়। আমি দুঃখিত। সাহায্য করতে পারছি না বলে।

ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোথায় গেলে খবর পাব বলুন তো?

–আপনি কি বলতে পারেন, যে যাজকদের আপনি খুঁজছেন, তারা কোন্ দলভুক্ত?

–আপনি কী বলছেন?

–এখানে অনেকগুলো উপশাখা আছে, কোন্ দল বললে হয়তো আমি বলতে পারতাম।

রবার্টের মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

রবার্ট জানতে চাইলেন অন্য কোনো সাজেশন?

না, আমি দিতে পারছি না।

রবার্ট ভাটিক্যান থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। রোমের রাস্তায় উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হাঁটছেন। কত মানুষ হেঁটে চলেছেন। না, পিজায় বসলেন, কাফেতে গেলেন। কফির জন্য বললেন।

হঠাৎ তার মনে হল, ওই যাজকমশাই কি এখনও সুইজারল্যান্ডে আছেন? উনি কোন্ দলভুক্ত আমি কী করে জানব? অধ্যাপকের কথা থেকে বুঝেছি, উনি রোমান টানে কথা বলেছেন।

ড্রিঙ্কের পাত্রে চুমুক দিলেন, বিকেলের প্লেনে ওয়াশিংটন পৌঁছোতে হবে।

রবার্ট তাকালেন, কাফের একদিকে প্যাসেঞ্জাররা নামছে। দুজন যাজককে পাওয়া গেল। রবার্ট দেখলেন, ভালোভাবে তাকালেন। যাজকরা কনডাক্টরের কাছে এগিয়ে গেছেন। তাঁরা পয়সা দিলেন না, বসার জন্য সিট পেলেন।

ওয়েটার জানতে চাইলেন- আপনার চেক, সিনর।

রবার্ট যেন তার কথা শুনতেই পাচ্ছে না। তাঁর মন দ্রুত ছুটে চলেছে এখানকার ক্যাথোলিক চার্চে, যাজকদের জন্য আলাদা সুযোগ সুবিধা আছে।

সুইজ এয়ারের বাড়িটায় পৌঁছে গেছেন রবার্ট।

কাউন্টারের পাশে বসে থাকা ভদ্রলোক বললেন- আমি কীভাবে আপনাকে সাহায্য করব?

–আমি ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

রবার্ট পকেট থেকে তার পরিচয়পত্রটা বের করলেন মাইকেল হাডসন, ইন্টারপোল।

বলুন হাডসন, কী করতে পারি?

কিছু কিছু বিমান সংস্থা অভিযোগ করেছে, এখানে নাকি দাম কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রোমে, কিন্তু আমরা তা করতে পারি না। যাত্রীদের ভাড়া সব জায়গায় একই রাখতে হবে।

সুইজ এয়ার তো কখনও তা করে না, মি. হাডসন। সকলকেই একই ভাড়া দিতে হয়।

সকলকে?

হ্যাঁ, খালি এয়ারলাইনের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কিছু ছাড় দেওয়া হয়।

–কেন, আপনারা ধমর্যাজকদের জন্য ছাড় দেন না।

, এখানে তাদের পুরো ভাড়া দিতে হয়।

–এখানে... রবার্টের কথাটা মনে হল।

এবার তার পরবর্তী পদক্ষেপ, এটা শেষ আশা- আলিতালিয়া।

ছাড়? ম্যানেজার অবাক। আমরা শুধু আমাদের কর্মচারীদের ছাড় দিই?

ধর্মযাজকদের জন্য?

ম্যানেজারের মুখ উজ্জ্বল।–হ্যাঁ, তা দিতেই হবে। ক্যাথোলিক চার্চের সঙ্গে আমাদের ব্যবস্থা করা আছে।

রবার্টের মন আনন্দে উদ্বেল একজন ধর্মযাজক যদি রোম থেকে উড়তে চান সুইজারল্যান্ডে, তাহলে কি এই এয়ারলাইনটা ব্যবহার করতে পারেন?

-হ্যাঁ, এটাই সস্তা।

রবার্ট বললেন– আমদের কম্পিউটারকে সর্বশেষ তথ্য সংযুক্ত করতে হবে। আপনি কি বলবেন, গত দু-সপ্তাহে কতজন ধর্মযাজক এখান থেকে সুইজারল্যান্ডে উড়ে গেছেন? তাদের কোনো রেকর্ড আছে কি?

–হ্যাঁ, রেকর্ড তো রাখতেই হয়, করের ব্যবস্থার জন্য।

–এই তথ্যটা আমার চাই।

–আপনি জানতে চাইছেন, কজন ধর্মযাজক জুরিখ কিংবা জেনেভাতে গিয়েছিলেন, তাই তো? আমি কম্পিউটারটা দেখে আসছি।

পাঁচ মিনিট বাদে ওই ভদ্রলোক কম্পিউটার প্রিন্ট আউট হাতে নিয়ে ফিরে এলেন।

–গত দুসপ্তাহে মাত্র একজন আমাদের আলিতালিয়া বিমান ব্যবহার করেছিলেন।

প্রিন্ট আউট দেখে উনি বললেন- সাত তারিখে উনি রোম ছেড়ে যান। জুরিখের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

–ওনার নাম?

–ফাদার, রোমেরো প্যাটরিনি।

–ঠিকানা।

কাগজ দেখে উনি ঠিকানাটা লিখে দিলেন- উনি বাস করেন অরভিয়েটোতে। আর কোনো তথ্য?

রবার্ট চলে গেলেন।

.

২৫.

অরভিয়েটো, ইতালি।

গাড়িটা থামল নির্দিষ্ট জায়গাতে। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হবে। এটা এক বিখ্যাত ক্যাথিড্রাল। চারপাশ অন্তত ছটি চার্চ আছে।

শহরটা ভারী সুন্দর। প্রাচীন চিহ্নগুলোকে ধরে রেখেছে। একটা খোলা আকাশ বাজার আছে। চাষীরা তাদের শাকসবজি বিক্রি করছে।

রবার্ট এক বৃদ্ধ যাজকের সন্ধান পেলেন। ক্যাথিড্রালের মধ্যে।

ফাদার, আমি একজন ধর্মযাজকের সন্ধান করছি, যিনি গত সপ্তহে এখান থেকে সুইজারল্যান্ডে গিয়েছিলেন।

ওই ভদ্রলোক বললেন, মুখে বৈরীতার ছাপ– আমি এ ব্যাপারটা আলোচনা করতে পারব না।

রবার্ট অবাক– কেন বলুন তো?

উনি আমাদের চার্চের নন, উনি সানজিওভেনেলা চার্চের।

রবার্টের হঠাৎ মনে হল, ভদ্রলোক এমন ব্যাবহার করলেন কেন?

.

অবশেষে সানজিওভেনেলা। একটা সুন্দর অঞ্চলে অবস্থিত। মধ্যযুগীয় ছাপ আছে।

এক অল্প বয়সী যাজক এগিয়ে এলেন।

সিনর, আপনি কী জন্য এসেছেন?

সুপ্রভাত, আমি একজন যাজকের সন্ধান করছি, যিনি সুইজারল্যান্ডে গিয়েছিলেন গত সপ্তাহে।

-হ্যাঁ, ব্যাপারটা ভাবতে পারা যাচ্ছে না। উনি হলেন ফাদার প্যাটরিনি। শয়তানের রথটা দেখার পর তিনি তা সহ্য করতে পারেননি। তার স্নায়ুবিক বিকলন ঘটেছে। অধোম্মাদ অবস্থা।

–এটা শুনে আমার খারাপ লাগছে। উনি কোথায়? আমি কি ওনার সঙ্গে কথা বলতে পারি?

–ওনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পিজাডির কাছে। আমার মনে হয় ডাক্তাররা অনুমতি দেবেন না।

রবার্ট দাঁড়িয়ে আছেন, বুঝতে পারা যাচ্ছে, চিন্তাগ্রস্ত। এমন একজন মানুষ, যাঁর শরীর খারাপ। শরীরে দুর্বলতা। তিনি কি কোনো সাহায্য করতে পারবেন?

হাসপাতালটা একতলা, শহরের উপকণ্ঠে বিরাট বড়ো বাড়ি।

রবার্ট গাড়িটা এককোণে রাখলেন। ছোট্ট লবির ভেতর ঢুকে পড়লেন। রিসেপশন ডেস্কে এক নার্স বসেছিলেন।

রবার্ট বললেন– সুপ্রভাত, ফাদার প্যাটরিনির সঙ্গে দেখা করতে পারি কি?

–না, উনি কথা বলতে চাইছেন না।

রবার্ট এখানেই থামবেন না। যে করেই হোক তাকে কথা বলতে হবে।

তিনি বললেন- আমি কিন্তু তার জন্যই এসেছি।

–উনি আপনাকে আসতে বলেছিলেন?

–হ্যাঁ, উনি আমেরিকাতে আমাকে লিখেছিলেন। আমি এত দূরে এসেছি, শুধু ওনার সঙ্গে দেখা করার জন্য।

নার্স বললেন- কেন উনি আপনাকে ডেকেছেন, আমি বুঝতে পারছি না। ওনার শরীর খুবই খারাপ।

–আমাকে দেখলে শরীর ভালো হবে।

ডাক্তার এখানে নেই, ঠিক আছে, আপনি যেতে পারেন। তবে মাত্র কয়েক মিনিট থাকবেন, কেমন?

রবার্ট ছোট্ট ঘরে ঢুকে পড়লেন, বিছানায় যে মানুষটি শুয়ে আছেন, তার সমস্ত শরীরে মৃত্যুর ধূসর ছায়া। রবার্ট সামনে এগিয়ে গেলেন, বললেন- ফাদার?

ভদ্রলোক তাকালেন এত দুঃখ যন্ত্রণা কেন?

–ফাদার আমার নাম হল...

ভদ্রলোক রবার্টের হাত চেপে ধরে বললেন আমাকে সাহায্য করুন। আমার সমস্ত বিশ্বাস চলে গেছে। সারাজীবন ধরে আমি ঈশ্বরের আরাধনা করেছি। আমি বুঝতে পারছি, ঈশ্বর বলে কিছু নেই। আছে শুধু শয়তান।

ফাদার।

–আমি নিজের চোখে দেখেছি। দুজন বসেছিল, শয়তানের রথে। আঃ, আমি ভাবতে পারছি না, অন্যরা আসবে। আমরা নরকের অন্ধকারে পৌঁছে যাব।

ফাদার, আমার কথা শুনুন। আপনি যা দেখেছেন, সেটা শয়তান নয়, এটা হল একটা মহাকাশ যান।

ধর্মযাজক ভদ্রলোক আবার রবার্টের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন আপনি কে? এখানে কেন এসেছেন?

–আমি একজন বন্ধু। আপনাকে সুইজারল্যান্ড ভ্রমণ সম্বন্ধে কয়েকটা প্রশ্ন করতে এসেছি।

-ওঃ! আমি যে কেন ওই বাসের যাত্রী হলাম?

ভদ্রলোক আবার উত্তেজিত।

রবার্ট কথা বললেন–উনি বললেন, আপনার পাশে এক টেকসাস ভদ্রলোক বসেছিলেন, মনে আছে। বকবক করছিলেন।

-হ্যাঁ, আমার মনে আছে।

–উনি কোথায় থাকেন, কিছু বলেছেন কি?

–উনি আমেরিকা থেকে এসেছেন।

–হ্যাঁ, টেকসাস থেকে। ঠিকানা দিয়েছিলেন।

–হ্যাঁ, উনি বলেছিলেন।

ফাদার? কোথায় বলুন তো?

–টেকসাস, শুধু টেকসাস বলেছিলেন।

–ঠিক আছে।

–আমি দেখেছি, আমি নিজের চোখে দেখেছি। ভগবান যদি আমাকে অন্ধ করে দেন।

ফাদার, টেকসাসের কোন জায়গা তিনি বলেছেন?

–হ্যাঁ, বলেছিলেন, পেনটেরোসা।

–ওটা তো টেলিভিশনে বলা হয়েছে। এটা একজন সত্যিকারের মানুষের নাম। উনি আপনার পাশে বলেছিলেন।

-হ্যাঁ, এসে গেছে। বাইবেল মিথ্যে কথা বলছে। ওই শয়তানরা পৃথিবী জয় করবে। দেখো-দেখো, আমি দেখতে পাচ্ছি।

নার্স এসে গেলেন। উনি বললেন রবার্টকে, এবার আপনাকে যেতে হবে, সিনর।

–আর এক মিনিট।

–এবার যেতেই হবে। রবার্ট শেষবারের মতো ওই যাজকের মুখের দিকে তাকালেন। রবার্ট ফিরে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। আর কিছুই বোধহয় করা গেল না। টেকসাস মানুষের ঠিকানা পাওয়া গেল না।

.

রবার্ট গাড়িতে ফিরে এলেন। রোমের পথে এগিয়ে চললেন। এখন আর কী বাকি রইল? রাশিয়ান ভদ্রমহিলা, টেকসাস ভদ্রলোক, হাঙ্গেরির মানুষ। কিন্তু না, এনাদের বোধহয় আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না। এতদূর এগিয়ে এসেছি। আর কিছু? না, পেন্টারোসার ভদ্রলোক খুব টেলিভিশন দেখেন। ভুল বকছেন।

তার মানে? একটা বিখ্যাত টেলিভিশন শো। বোলানডা পেন্টারোসা, ওখানে কারবাইট পরিবার বাস করতেন। রবার্ট গাড়ির গতি আস্তে করলেন। তিনি রাস্তার দুপাশে তাকাচ্ছেন। ইউ টার্ন নিলেন। তাকে আবার অরভিয়েটোর দিকে যেতে হবে।

আধঘন্টা কেটে গেছে। রবার্ট একটা বারে বসে আছেন। বললেন- আপনাদের শহরটা সুন্দর শান্তির বাতাবরণ।

-হ্যাঁ, আমরা এখানে ভালোই আছি। এর আগে কি ইতালিতে এসেছেন?

–হ্যাঁ, আমি রোমে মধুচন্দ্রিমা কাটিয়েছি।

কথাটা কানে বাজল। সুশান বলেছিল– ছোটো থেকে আমার স্বপ্ন ছিল, বড়ো হয়ে একবার ইতালি বেড়াতে যাব।

আঃ, রোম, বড় বড় শহর, বড্ড বেশি শব্দ।

–হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি।

এখানে আমরা সুখেই আছি।

–এখানে অনেক ছাদের মাথায় টেলিভিশন অ্যান্টেনা আছে।

–হ্যাঁ, আমরা সকলেই টেলিভিশনের ভক্ত হয়ে উঠেছি।

–এখানে কতগুলো টেলিভিশন চ্যানেল আছে?

মাত্র একটা।

–ওখানে আমেরিকার শো দেখানো হয়?

না-না, এটা হল সরকারী চ্যানেল। আমরা ইতালির তৈরি সিরিয়াল দেখতে পারি। ধন্যবাদ।

.

রবার্ট অ্যাডমিরাল হুইট্যাকারকে ফোন করলেন। রবার্ট অফিসটা স্পষ্ট দেখতে পেলেন। চারপাশে কর্মব্যস্ততা।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল কোথায় আছেন আপনি?

–আমি বলতে পারছি না, স্যার?

–আমি বুঝতে পারছি কী করতে হবে।

কারোর সঙ্গে কথা না বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাইরের সাহায্য দরকার। আপনি কি সাহায্য করবেন?

-হ্যাঁ, চেষ্টা করব।

–টেকসাসের কোথাও কি পেনটেরোসা নামে জায়গা আছে?

–একটু ভেবে দেখতে হবে। আমি জানাচ্ছি।

–আমাকে খবরটা দিন তো, এক-দুঘণ্টার মধ্যে, ব্যাপারটা আমাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন।

রবার্টের মনে হল, এবার বোধহয় আশার আলো পাওয়া যেতে পারে।

লাইনটা কেটে গেছে।

.

রবার্ট অ্যাডমিরাল হুইট্যাকারকে ফোন করলেন। আমি আপনার ফোনের জন্য বসে আছি।

-খরবটা পেয়ে গেছি। হুইট্যাকার বললেন।

রবার্ট জানতে চাইলেন- বলুন?

-টেকসাসে পেনটেরোসা নামে একটা অঞ্চল আছে। ওয়াকোর পাশে, ড্যান ওয়েনে নামে এক ভদ্রলোক এটার মালিক।

রবার্টের নিঃশ্বাস এখন স্বাভাবিক ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ অ্যাডমিরাল। ফিরে গেলে ডিনার খাওয়াবেন তো?

রবার্ট ফোন করলেন জেনারেল হিলিয়াডকে। বললেন–আমি আর একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সন্ধান পেয়েছি, ফাদার প্যাটরিনি।

একজন যাজক।

–হ্যাঁ। অরভিয়েটোতে উনি আছেন। হাসপাতালে। খুবই অসুস্থ। আমার মনে হয় না যে, ইতালিয় কর্তৃপক্ষ ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে।

ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ, কমান্ডার।

.

দু-মিনিট কেটে গেছে। জেনারেল হিলিয়াড জানুসের সঙ্গে কথা বলছেন।

কমান্ডার বেলামির কাছ থেকে খবর পেয়েছি, সর্বশেষ প্রত্যক্ষদর্শী, যাঁকে শনাক্ত করা হয়েছে, তিনি একজন ধর্মযাজক। অরভিয়েটোর:ফাদার প্যাটরিনি।

ব্যাপারটা ভেবে দেখতে হবে।

.

খবর, গুরুত্বপূর্ণ খবর, অপারেশন ডুমস ডে। পাঁচ নম্বর, ফাদার প্যাটরিনা।

খবর শেষ হয়ে গেল।

রোমের প্রান্তসীমায় একটি অফিস। চারপাশে ফার্মহাউস। আপাত শান্ত নিরীহ এই অফিসটির দিকে তাকালে বুঝতে পারা যাবে না, এখানে কত কাজ চলেছে।

কর্নেল ফ্রানসেস কোসিজার ওই ফ্ল্যাশ মেসেজটা পড়লেন। কর্নেলের বয়স বছর পঞ্চাশ। সুগঠিত চেহারা। বুলডগের মতো মুখ। তিনি আবার মেসেজটা পড়লেন।

তার মানে? শেষ পর্যন্ত শয়তানরা কাজ করতে শুরু করেছে। আমাদের এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

.

মধ্যরাত। অরভিয়েটো হাসপাতাল।

নার্স বললেন- সিনর ফিলিপ্পির সাথে দেখা করতে চান, অথবা অন্য কেউ?

ধমর্যাজিক শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ওই যাজকের ঘরে যাবেন। ভদ্রলোক ঘুমিয়ে আছেন। আহা, হাতদুটো বুকের কাছে জড়ো করা। চাঁদের আলো এসে পড়েছে। জানালা দিয়ে। সুন্দর শান্ত সমাহিত পরিবেশ।

সিস্টার একটা ছোট্ট বাক্স বের করলেন। তিনি কাট গ্লাসের পাত্র হাতে নিলেন। সেটা ওই বৃদ্ধ যাজকের হাতে তুলে দিলেন। এর মধ্যে কী আছে? এর মধ্যে আছে পুঁথি, যা দিয়ে আমরা ঈশ্বরের নাম জপি। হঠাৎ হাতে কিছু ঠেকল তার। রক্তরেখা বেরিয়ে এল। বাক্স থেকে একটা ছোটো বোতল বের করলেন তিনি। আই ড্রপারের সাহায্যে বিষ ঢুকিয়ে দিলেন।

কয়েক মুহূর্ত সময় দিলেন। বিষ কাজ করতে শুরু করেছে। সিস্টার ক্রশ চিহ্ন আঁকলেন বুকে। অন্ধকারের মধ্যে নীরবে বেরিয়ে গেলেন।

সংবাদ পাওয়া গেল। গোপন খবর, গোপন অপারেশন ডুমস ডে পাঁচ নম্বর ফাদার প্যাটরিনি, কাজ শেষ হয়ে গেছে।

.

২৬.

ফ্রাঙ্ক জনসনকে নেওয়া হয়েছে, কারণ ভিয়েতনাম যুদ্ধে তার অভিজ্ঞতা আছে। একসময় তাকে বন্ধুরা আদর করে কিলিং মেশিন নামে ডাকত। তিনি শুধু হত্যা করতে ভালোবাসেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমান সত্তা।

জানুস বললেন- হ্যাঁ, এই আমাদের আদর্শ চরিত্র। আমি ওনাকে হারাতে চাইছি না।

তখন এক ক্যাপ্টেন ফ্রাঙ্ক জনসনের সঙ্গে কথা বলছেন।

আমাদের সরকার সম্পর্কে চিন্তা করো না, এর অন্তরালে কিছু উৎসাহী মানুষ আছেন। তুমি ভয় পেও না। আমরা চিরদিন কেন আরবদের ওপর নির্ভর করব? নিজস্ব খনির সন্ধান করতে হবে।

-হ্যাঁ, আমি আপনার কথার সারমর্ম বুঝতে পারছি। ফ্রাঙ্ক জনসন বললেন।

–আপনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান, জনসনের মুখের দিকে তাকিয়ে উনি আবার বললেন, যদি কংগ্রেস আমাদের দেশটাকে বাঁচাবার চেষ্টা না করে তা হলে আমাদেরই করতে হবে।

–আমাদের?

–হ্যাঁ। এ বিষয়ে পরে কথা বলব।

পরের আলোচনা আরও সার্থক এবং সদর্থক।

-ফ্রাঙ্ক, একদল স্বদেশপ্রেমী এইভাবেই কাজ করতে চাইছেন। তারা পৃথিবীর অবস্থাটাকে পাল্টে দেবেন। তাদের মধ্যে ক্ষমতাসম্পন্ন ভদ্রলোকেরা আছেন। তারা একটা কমিটি করে। কাজ করতে শুরু করেছেন। আপনি কি যোগ দিতে চাইছেন?

ফ্রাঙ্ক বললেন- হ্যাঁ, আমি খুবই আগ্রহী।

.

এইভাবেই শুরু হল। পরের অধিবেশনটা হয়েছিল কানাডার অটোয়াতে। ফ্রাঙ্ক জনসন এই কমিটির কজন সদস্যের সঙ্গে দেখা করলেন। হ্যাঁ, অন্তত গোটা ছয়েক দেশের প্রতিপত্তিশালী মানুষরাই এই দলটি তৈরি করেছেন।

এই ভদ্রলোক ফ্রাঙ্ককে বোঝাল– আমরা যথেষ্ট সংঘবদ্ধ। এখানে বিভিন্ন বিভাগ আছে, বিজ্ঞাপন বিভাগ, প্রচার বিভাগ, বিনিয়োগ বিভাগ, কর্মসংস্থান বিভাগ, জনসংযোগ বিভাগ।

আর আছে মৃত্যু বিভাগ। পৃথিবীর সমস্ত গুপ্তচর সংগঠন আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত।

–আপনি বলতে চাইছেন, গুপ্তচর সংঘের প্রধানরা...

–না, ঠিক প্রধানেরা নয়, সহকারীরা। আমরা এভাবেই পৃথিবীর সর্বত্র আমাদের জাল ছড়িয়ে দিয়েছি।

পৃথিবীর নানা প্রান্তে মির্টিং অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সুইজারল্যান্ডে, মরক্কোতে, চিনে। জনসন প্রত্যেকটা মিটিং-এ যোগ দিচ্ছেন।

.

ছমাস বাদে কর্নেল জনসনের সঙ্গে জানুসের দেখা হল।

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।

কর্নেল, আপনাকে আমি ভালো ভালো খবর দিয়েছি বলুন।

ফ্রাঙ্ক জনসন বললেন- হা, কাজটা আমার ভালো লাগছে।

এবার আপনি সাহায্য করবেন তো?

কী করতে হবে বলুন।

–সিক্রেট এজেন্টদের ট্রেনিং দিতে হবে।

-আমি পারব। তারা কে কোন কাজে যুক্ত সেটা বের করতে হবে। আমি আপনার ওপর এই দায়িত্ব দিতে চাইছি। আমরা সবথেকে ভালো মানুষকে চয়ন করি।

কর্নেল জনসন বললেন- ঠিক আছে, আমার কোনো অসুবিধা হবে না। আমি আরও আরও বেশি কাজ করতে চাইছি। অপারেশন ডুমস ডে-ওর কথা শুনেছিলাম, এই ব্যাপারে আমি যোগ দিতে পারি কি?

-ঠিক আছে, আপনাকে নিয়ে নিলাম।

ধন্যবাদ। এই সিদ্ধান্তের জন্য আপনাকে কখনও দুঃখ প্রকাশ করতে হবে না। এভাবেই কর্নেল ফ্রাঙ্ক জনসন এক সুখী মানুষে পরিণত হলেন। এরপর তাকে আরও তৎপর হয়ে উঠতে হবে।

.

২৭.

আট নম্বর দিন। ওয়াকে, টেকসাস।

ড্যান ওয়েনের সকালটা ভালোভাবে শুরু হয়নি। বলতে গেলে বিপদের পর বিপদ। ওয়াকো কান্ট্রিকোর্ট হাউস থেকে তিনি এইমাত্র ফিরেছেন। তার বিরুদ্ধে নানা মামলা দায়ের করা হয়েছে। দেউলিয়ার মামলা। বউ, এক অল্প বয়সী ডাক্তারের সাথে অবৈধ প্রেমে মত্ত। ডিভোর্স করে চলে গেছে। যা ছিল সব নিয়ে। আর কী? একটির পর একটি ব্যবসায় ক্ষতি। কিন্তু কেন? ড্যান ওয়ানে ভাবেন, আমার নিজের দোষে কি?

এক সময় আমি এক ভালো স্বামী ছিলাম। বড়ো ব্যবসায়ী। এখন সব অন্ধ অতীত।

ড্যান ওয়েনে এক অহংকারী মানুষ। তিনি টেকসাস সম্পর্কে সব কটা জোকস জানেন। টেকসানরা হৈ-হৈ করতে ভালোবাসেন। বেহিসেবী উন্মাদনা। সবই তো তিনি করেছেন। আজ কেমন যেন হয়ে গেল।

দেখা করলেন ধমর্যাজকের সঙ্গে। বললেন– ওয়াকোর সব কিছু আছে, তা সত্ত্বেও কিছু নেই কেন বলুন তো? আমরা তেইশটি স্কুল স্থাপন করেছি। বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়। চারটি সংবাদপত্র। দশটি রেডিও স্টেশন। পাঁচটি টেলিভিশন স্টেশন। টেকসাস র‍্যানজার ফল। তার মানে? ইতিহাসের পাতায় একথাই লেখা আছে। ফাদার, ফ্রানজোস নদীর কথা কি মনে পড়ে? সেখানে আমরা সাফারি র‍্যানচ করব। একটা আর্ট সেন্টার। আমি বলছি,

ওয়াকো একদিন বিশ্বের অন্যতম সেরা শহরে পরিণত হবে। আপনি এখানে আসবেন তো?

ওই বৃদ্ধ যাজক হেসেছিলেন। ওয়েনে ভেবেছিলেন, হয়তো এই স্বপ্নটা একদিন সফল হবে।

ড্যান ওয়েনের বাবা তার হাতে এক হাজার একর জায়গা দিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে বিরাট পশুশালা তৈরি হল। দু হাজার থেকে দশ হাজার। দিয়েছিলেন দামী উৎসাহী ঘোড়া। তার থেকে অনেক টাকা আসত।

ওয়েনে এক সুইজ ভদ্রলোকের কথা শুনেছিলেন। তিনি টেকসাসে ঘোড়দৌড়ের আসর বসাতে ইচ্ছুক। জুরিখে উড়ে গেলেন তার সঙ্গে দেখা করতে। ব্যাপারটা শেষ হল কি? বৃথা অনুসন্ধান নাঃ, উনি চাইছেন একটা ফল-ফুলের বাগান করতে।

এইভাবেই ড্যান ওয়েনের পতন শুরু হল। শেষ পর্যন্ত উনি কোথায় পৌঁছোবেন কেউ জানে না।

জনি, কী হবে বলো তো? আমি কি আর উঠতে পারব?

ড্যান তাঁর প্রিয়তম মানুষটিকে জিজ্ঞাসা করলেন- হ্যাঁ, আবার ভালোভাবে চেষ্টা করতে হবে।

তখনই ডোরবেল বেজে উঠল।

রবার্ট বললেন আপনি কি ড্যানিয়েল ওয়েনে?

-হ্যাঁ, আমার নাম ড্যান।

তিনি রেগে আরও বললেন

–আমার প্রাক্তন বউ কি আপনাকে চর হিসেবে লাগিয়েছে নাকি? আপনি কি তার হয়ে কাজ করছেন?

না।

–ঠিক আছে। আপনি বোধহয় ওই উড়ন চাকির সম্পর্কে খবর চাইছেন? হ্যাঁ, ব্যাপারটা অদ্ভুত। প্রতি মুহূর্তে রং পাল্টাচ্ছিল। তার মধ্যে কিছু শত্রু বসেছিল- মৃত অথবা জীবিত, বুঝতে পারা যাচ্ছিল না। এখনও আমি চোখ বন্ধ করলে ওই ছবিটার স্বপ্ন দেখি।

মি. ওয়েনে, আপনি অন্য সহযাত্রীদের সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন? যাঁরা বাসে ছিলেন?

-না, আমি তো একাই ছিলাম।

–কিন্তু আপনি কয়েকজন সহযাত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

-সত্যি কথা বলতে কী, আমার মাথায় অনেক কিছু ছিল। আমি কারও দিকে সেভাবে নজর দিই নি।

মনে পড়ে তাদের কারও কথা?

ওয়েনে এক মুহূর্ত নীরবতা পালন করলেন। এক ইতালিয় যাজক ছিলেন। আমি তার সাথেই বেশি কথা বলেছি। ভদ্রলোক খুবই ভালো প্রকৃতির। আর কী বলব? ওই উড়ন চাকি তার মনকে ধাক্কা দিয়েছিল। শয়তানের কথা বলছিলেন।

–আর কিছু?

-না-না, হ্যাঁ একটু ভাবতে দিন তো। আমি এমন একজনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, যাঁর ব্যাঙ্ক আছে কানাডাতে। সত্যি কথা বলতে কী, এখানে আমার একটু সমস্যা আছে। আর্থিক সমস্যায় হয়তো এই ব্যবসাটাকে আমি আর ধরে রাখতে পারব না। আমি ব্যাক্তারদের সাথে কথা বলতে চাই না। তারা রক্ত চুষে খেতে ভালোবাসে। ভেবেছিলাম, ওই ভদ্রলোক বোধহয় আলাদা প্রকৃতির হবেন। যখন আমি শুনলাম, উনি একজন ব্যাঙ্কার, আমি ওনার কাছে ঋণের ব্যাপারে আলোচনা করেছিলাম। উনি অন্যসব ব্যাঙ্কারদের মতোই নির্বিকার এবং নিমর্ম।

-উনি এসেছিলেন কানাডা থেকে, তাই তো?

–হ্যাঁ, ফোর্থ স্মিথ নর্থওয়েস্ট রিটারিতে। এইটাই আমি বলতে পারি।

রবার্ট তার উত্তেজনা দমন করার চেষ্টা করলেন।

মি. ওয়েনে, আপনার কথা আমার কাজে দেবে।

–সত্যি?

–হ্যাঁ।

আপনি কি রাতের খাবার খাবেন?

না, ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।

এবার যেতে হবে ফোরথ স্মিথে, কানাডাতে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ।

.

রবার্ট জেনারেল হিলিয়াডকে বললেন- আর একজনকে পাওয়া গেছে, ড্যান ওয়েনে, উনি টেকসাসের ওয়াকো অঞ্চলের বাসিন্দা, ওনার বিরাট অশ্বশালা আছে। মস্তো বড়ো।

–ঠিক আছে। ডালাসের অফিসের সাথে এখনই কথা বলতে হবে।

খবরটা ভেসে এল অত্যন্ত গোপনীয়, ছ-নম্বর সাক্ষী, ড্যানিয়েল ওয়েনে, ওয়াকে, খবরটা শেষ হয়ে গেল।

.

ভার্জিনিয়া, সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্সির ডেপুটি ডিরেক্টর ওই ট্রান্সমিশনটা ভালোভাবে পড়লেন। ছ নম্বর দেওয়া আছে। কমান্ডার বেলামি সাংঘাতিক ভালো কাজ করছেন। তাকে নির্বাচন করাটা সত্যি একটা ভালো সিদ্ধান্ত। জানুস ঠিকই বলেছেন। জানুসের কথা কখনও ভুল হয় না।

ডিরেক্টর আবার ওই মেসেজের দিকে তাকালেন, আঃ, মনে করো এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট, তিনি ভাবলেন, ব্যাপারটা ঘটানো খুব একটা শক্ত হবে না। তিনি একটা বাজারে হাত দিলেন।

.

র‍্যানচে দুজন ভদ্রলোক এসেছে। ঘন নীল রঙের ভ্যানে চড়ে। ভ্যানটা বাগানের ধারে রেখে দিল। চারপাশে তাকাল। ড্যান ওয়েনে ভাবলেন, তারা বোধহয় এই র‍্যানচের দখলদারী নেবার জন্য এসেছে। তিনি দরজা খুলে দিলেন।

–ভ্যান ওয়েনে?

বলুন কী করতে পারি?

দুজন ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে।

তাদের মধ্যে যে একটু লম্বা সে, আরো কাছে এগিয়ে এল।

কিছু বোঝার আগেই লোহার অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হল ড্যানের মাথার ওপর। ড্যান চোখে অন্ধকার দেখলেন।

দেহটা তুলে ফেলা হল ওই আস্তাবলের মধ্যে, সুন্দর চেহারার শক্তিশালী একটা কালো রঙের ঘোড়া, ইলেকট্রিক চাবুক দিয়ে তাকে উত্তেজিত করা হল। তারপর? ঘোড়াটা অচৈতন্য ড্যানের শরীরের ওপর লাফালাফি করতে শুরু করল। পায়ের এক-একটি আঘাত ড্যানকে নরকের বাসিন্দা করে দিল।

একটু বাদেই সেই শুভ সংবাদটা পাওয়া গেল। অত্যন্ত গোপনীয়। ছ-নম্বর, ড্যানিয়েল ওয়েনে, ওয়াকো, কাজ শেষ হয়ে গেছে।

.

২৭.

ন নম্বর দিন, ফোরথ স্মিথ, কানাডা।

ফোরথ স্মিথ, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের একটি উন্নয়নশীল শহর। দু-হাজার লোক বাস করে। তাদের বেশির ভাগই চাষী কিংবা পশুশালার মালিক। ব্যবসায়ীদের আনাগোনা। আবহাওয়াটা ভারি সুন্দর। শীতকাল শুরু হয়ে গেছে। মনে হয় এই শহর বোধহয় ডারউইনের সেই প্রাচীন তত্ত্বকে আঁকড়ে ধরেছে সর্বোত্তমরাই এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার ছাড়পত্র পায়।

উইলিয়াম মান, এক বিশিষ্ট মানুষ। মিশিগানে জন্ম। তিরিশ বছর বয়সে তিনি ফোরথ স্মিথে আসেন। এখানেই থেকে যান। সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। ব্যাঙ্কের সাথে যুক্ত হয়েছেন। দু বছর আগে। ব্যাঙ্কটা চালান খুবই ভালোভাবে। অঙ্কে মাথা আছে। তিনি জানেন যে সদস্যদের সাহায্য করতে হয়। তিনি কয়েকটা সরল দর্শনে বিশ্বাস করেন। ব্যবসা করার জন্য নগদ অর্থ ঋণ দেন। ঋণ ঠিকমতো পরিশোধ করা হয়।

এভাবেই মান আজ শহরের এক গুরুত্বপূর্ণ বাসিন্দা। সুইজারল্যান্ডে গিয়েছিলেন, কজন ব্যাঙ্কারের সঙ্গে কথা বলতে, যাতে আরও বেশি মানুষকে ঋণ দেওয়া যেতে পারে।

মান ঠিক করলেন আলপস পাহাড়ে বেড়াতে যাবেন। সেখানে গিয়ে যা দৃশ্য। দেখেছিলেন, মনে থাকবে। টেকসাসের এক ভদ্রলোক, অশ্বশালার মালিক, ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যাপারে আলোচনা করেছিলেন। না, যাত্রাটা খুব একটা ভালো হয়নি। তবে সুইজ সরকারকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তারা কিন্তু ভালো ব্যবস্থাই করেছিল। তিনি ডিজনি ওয়ার্ল্ডে গিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে ভ্রমণটা মোটামুটি ভালোই হয়েছিল।

উইলিয়াম মান সুখী সম্পৃক্ত মানুষ।

.

দিনের প্রত্যেকটা প্রহরকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। সেক্রেটারি এলেন, বললেন, একজন এসেছেন দেখা করতে। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। তিনি ব্যাঙ্কারদের নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখছেন।

ব্যাপারটা একেবারে আলাদা। বেশি প্রচার দরকার। তাহলে ব্যবসাটা ভালো হবে। উইলিয়াম মান জ্যাকেটের ওপর হাত দিয়ে আঁচড়ে নিলেন। বললেন- ওনাকে পাঠিয়ে দাও।

এই আগন্তুক এক আমেরিকান, সুন্দর পোশাক পরা, বুঝতেই পারা যাচ্ছে, তিনি কোনো ভালো পত্রিকা কিংবা সংবাদপত্রে কাজ করেন।

মি. মান?

–হ্যাঁ।

রবার্ট বেলামি।

–আপনি আমাকে নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখবেন?

না, শুধু আপনাকে নিয়ে নয়। আমার কাগজে আপনার কথাই বারবার বলা হবে।

–কোন্ পত্রিকা?

–ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল।

–বাঃ, বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকা।

–এই জার্নালের মনে হচ্ছে বেশিরভাগ ব্যাঙ্কারই সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে আলাদাভাবে বেঁচে থাকতে ভালোবাসেন। তারা পৃথিবীর কোথাও যান না। অন্য দেশে গিয়ে সেখানকার ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দেখেন না। মি. মান, আপনি তো নানান দেশে ঘুরেছেন।

-হ্যাঁ, সত্যি কথা বলতে কী, আমি গত সপ্তাহে সুইজারল্যান্ড থেকে ফিরে এলাম।

সত্যি? ভালো লেগেছে?

–হ্যাঁ, আমি সেখানে আরও কয়েকজন ব্যাঙ্কারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। আমরা বিশ্বের অর্থনীতি পরিস্থিতি সম্পর্কে মত বিনিময় করেছিলাম।

রবার্ট সব কথাগুলো নোট বুকে লিখে নিচ্ছেন। তিনি বললেন- প্রমোদ ভ্রমণের সময় পেয়েছিলেন?

-না, সেভাবে পাইনি, তবে আলপস পাহাড় দেখতে গিয়েছিলাম।

কীভাবে? বলুন তো। বাসে কোনো বিশেষ মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

–বিশেষ মানুষ? না, তেমন কিছু নয়।

এক মুহূর্তের জন্য টেকসবাসী লোকটির কথা মনে পড়ে গেল।

মান রবার্টের মুখের দিকে তাকালেন। সাংবাদিক বোধহয় এখন আরও কিছু জানতে চাইবেন। আঃ, আমার জায়গাটা ভালোই হবে ওই আর্টিকেলে।

একজন রাশিয়ান মেয়ে ছিল?

রবার্ট জানতে চাইলেন। সত্যি? তার সম্পর্কে কী জানেন?

—আমরা যখন কথা বলছিলাম, আমি বোঝাচ্ছিলাম, রাশিয়া কত অনুন্নত। সেখানে নানা সমস্যা হয়েছে।

ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই খুব মন দিয়ে কথা শুনছিলেন?

–হ্যাঁ, তাকে দেখে মনে হয়েছিল, তিনি খুবই বুদ্ধিমতী রমণী।

নাম বলেছিল?

হ্যাঁ, বোলগা এই জাতীয় কিছু।

–কোথায় থাকেন কিছু বলেছিলেন?

-হ্যাঁ, উনি ইয়েভোর এক গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক। এই প্রথম বিদেশ ভ্রমণে এসেছেন। আমার মনে হয় গ্লাসনস্টের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে।

রবার্ট সবকিছু লিখছেন।

-বাঃ, এই খবরটার জন্য ধন্যবাদ।

আরও আধঘণ্টা তিনি ওই ব্যাঙ্কারের সঙ্গে কথা বললেন। পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা জেনে নিলেন।

এবার পরবর্তী পদক্ষেপ ফেলতে হবে।

.

রবার্ট হোটেলে ফিরে এলেন। জেনারেল হিলিয়াডের অফিসে ফোন করলেন– খবরটা পৌঁছে গেল। আরও একজনকে পাওয়া গেছে। উইলিয়াম মান, ফোরথ স্মিথ, কানাডার ব্যাঙ্কের স্বত্তাধিকার।

-ধন্যবাদ। এখনই কানাডিয় সরকারকে খবরটা দিচ্ছি।

–উনি আমাকে আর একটা তথ্য দিয়েছেন। আজ সন্ধ্যাবেলা রাশিয়াতে উড়ে যাচ্ছি। ভিসার ব্যবস্থা করতে হবে।

–আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন?

–ফোরথ স্মিথ থেকে।

স্টকহলমে কিছুক্ষণের জন্য থামবেন। ডেস্কের ওপর একটা এনভেলাপ থাকবে।

ধন্যবাদ।

ফ্ল্যাশ মেসেজ জ্বলে উঠল। অত্যন্ত গোপনীয়। সাত নম্বর সাক্ষী উইলিয়াম মান, ফোরথ স্মিথ। খবরটা শেষ হয়ে গেল।

.

উইলিয়াম মানের ঘরে ডোরবেলের শব্দ হচ্ছে। এত রাতে কে এসেছে? তিনি এইসব অবাঞ্ছিত অতিথিদের থেকে দূরে থাকতে ভালোবাসেন। হাউসকিপার চলে গেছে। বউ দোতলার ঘরে শুয়ে আছে। ঘুমিয়ে পড়েছে বোধহয়। একটু চিন্তিত হয়ে মান দরজাটা খুলে দিলেন। কালো পোশাক পরা দুজন দাঁড়িয়ে আছে।

–উইলিয়াম মান?

হ্যাঁ।

একজন পকেট থেকে তার পরিচিত পত্র বার করল- আমরা ব্যাঙ্ক অফ কানাডা থেকে আসছি। ভেতরে আসতে পারি কি?

কী হয়েছে?

ভেতরে গিয়ে আলোচনা করতে হবে।

–আসুন।

তারা লিভিংরুমে এলেন।

–আপনি সুইজারল্যান্ডে গিয়েছিলেন?

–হ্যাঁ, কী হয়েছে?

যখন আপনি ছিলেন না আমরা আপনার বইগুলো অডিট করেছি। আপনি কি জানেন, আপনার ব্যাঙ্কে প্রায় দশ লক্ষ ডলার কম পড়ছে।

উইলিয়াম মান ওই দুজন লোকের দিকে তাকালেন।

–আপনারা কী বলছেন? প্রতি সপ্তাহে আমি সবকটা বই নিজে পরীক্ষা করি। এক-পয়সা এদিক-ওদিক হবে না।

দশ লক্ষ ডলার, মি. মান। আমার মনে হয়, আপনি এসবের জন্য দায়বদ্ধ।

ভদ্রলোকের মুখ রাগে অপমানে লজ্জায় লাল হয়ে গেছে। তিনি বললেন–কীভাবে? আপনারা এখনই আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। নাকি আমি পুলিশ ডাকব।

–তাতে কোনো লাভ হবে না। পরে এই কাজের জন্য অনুশোচনা করতে হবে।

রক্ত চোখে মান আগন্তুকদের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি চিৎকার করে বলছেন–অনুশোচনা? কী জন্য? কেন আমায় বিরক্ত করছেন বলুন তো?

একজন পকেট থেকে একটা বন্দুক বের করল। বলল– বসে থাকুন মি. মান।

–আমার সর্বস্ব চুরি হচ্ছে, মান বললেন, সবকিছু নিয়ে যান, কিন্তু ঝামেলা করবেন না। হিংসার আবরণ আনবেন না।

বসুন।

দ্বিতীয় লোকটি লিকার ক্যাবিনেটের দিকে গেল। ওটা বন্ধ ছিল। সে কাঁচ ভেঙে গ্লাস বের করল। তারপর স্কচ খেতে শুরু করল। একটা গ্লাস হাতে নিয়ে মানের কাছে চলে গেল।

-এটা ধীরে ধীরে পান করুন। মনটা ভালো লাগবে।

–ডিনারের পর আমি কখনও মদ খাই না। ডাক্তার বারণ করেছেন।

অন্যজন বন্দুকটা উইলিয়াম মানের মাথায় ঠেকিয়ে দিল।

–ড্রিক করতেই হবে। না হলে এটা আপনার মাথা ফুটো করে দেবে।

মান বুঝতে পারলেন, তিনি দুজন দস্যুর হাতে পড়েছেন। তিনি গ্লাসের দিকে তাকালেন। কাঁপা কাঁপা হাতে গ্লাসখানা তুলে নিয়ে চুমুক দিলেন।

–এক্ষুনি খেয়ে নিতে হবে।

আরও একটু বেশি চুমুক।

–আপনারা কী চাইছেন? মান কথা বলার চেষ্টা করলেন। একটু গলা চড়িয়ে। মনে হল, বউয়ের বোধহয় ঘুম ভেঙে যাবে। বউ দোতলা থেকে চলে আসবে। না, আশা সফল হল না। ঘুম-ঘুম পাচ্ছে। কেন?

মান আবার বললেন– সব কিছু নিয়ে যান। আমি বাধা দেব না।

–গ্লাসটা পুরো খেতে হবে।

–আঃ, কেন জোর করছেন?

তিনি সবটা খেয়ে নিলেন, এক চুমুক। মনে হচ্ছে একটা আগুন বুঝি শরীরে প্রবেশ করল। ঘুম-ঘুম পাচ্ছে। বললেন– বেডরুমে আমার সিন্দুকটা আছে, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। আমি এটা খুলে দেব? আমার বউয়ের ঘুম ভেঙে যাবে। ও কিন্তু চিৎকার করে পুলিশ। ডাকবে।

বন্দুক হাতে ভদ্রলোক বলল- না, আমাদের কোনো তাড়া নেই। আর একটা ড্রিঙ্ক নেবেন?

দ্বিতীয় লোকটি লিকার ক্যাবিনেট থেকে আর একটা গ্লাস নিয়ে এল। এই ড্রিঙ্ক খেয়ে নিন।

উইলিয়াম মান বললেন- না, আমার লাগবে না।

-হ্যাঁ, এটা আপনাকে খেতেই হবে।

আবার কানের পাশে বন্দুকের নল- এখনই খেয়ে নিন।

ওরা কী চাইছে বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

–আমি খাব না, আমার ভালো লাগছে না।

একজন মানুষ শান্তভাবে বলল- যদি শরীর খারাপ লাগে তাহলে আমি আপনাকে হত্যা করব।

মান দুজনের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন আপনারা কী চাইছেন?

মি. মান, আমরা তো বলেছি, পরে আপনাকে অনুশোচনা করতে হবে।

–ঠিক আছে, আমি অনুশোচনা করছি।

একজন আগন্তুকের মুখে হাসি। হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বলা হল, লিখতে হবে, আমি দুঃখিত আমাকে যেন ক্ষমা করা হয়।

–এইটুকু?

–হ্যাঁ, এইটুকু। আমরা চলে যাব।

আনন্দ এসে গেল। লেখা শুরু হল।

কিন্তু পেনটা ধরতে পারছেন না। লেখা কি সম্ভব?

লেখা শেষ হল। মানের হাত থেকে কাগজ নিয়ে দুজন লোক দরজার দিকে এগিয়ে গেল। বলল- মি. মান, কত সহজে আপনাকে ছেড়ে দিলাম বলুন তো?

এবার আপনারা যাবেন তো?

–এখন চারদিকে অনেক অপরাধের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। নিজেকে বাঁচাবার জন্য এই বন্দুকটা সঙ্গে রাখবেন।

একজন আগন্তুক বন্দুকটা মানের বাঁ হাতে দিল।

–আপনি কি জানেন, কীভাবে গুলি করতে হয়?

না।

ব্যাপারটা খুবই সহজ। এটা এইভাবে ব্যবহার করবেন।

ওই আগন্তুক উইলিয়াম মানের হাতে থাকা বন্দুকে চাপ দিলেন। ট্রিগারের ওপর চাপ পড়ল। একটা শব্দ শোনা গেল। তারপর? রক্তরঞ্জিত চিরকূটখানা মাটিতে পড়ে গেল।

একজন বলল- শুভরাত্রি মিমান। আমাদের কাজটা শেষ হয়ে গেছে।

.

ফ্ল্যাশ মেসেজ জ্বলে উঠল- গোপনীয়। সাত নম্বর, উইলিয়াম মান, ফোরথ স্ট্রিট, কাজ শেষ হয়ে গেছে। মেসেজ শেষ হয়ে গেল।

দশ নম্বর দিন, ফোরথ স্ট্রিট, কানাডা। পরের দিন সকালে ব্যাঙ্কের লোকেরা পরীক্ষা করে বলল, মানের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে দশ লক্ষ ডলার পাওয়া যচ্ছে না। পুলিশ মানের মৃত্যুর ঘটনাটাকে আত্মহত্যা বলে চিহ্নিত করল।

ওই হারানো টাকা কিন্তু কোনোদিন পাওয়া যায়নি।

.

২৯.

এগারো নম্বর দিন। ব্রাসেলস। রাত তিনটে।

ন্যাটো হেডকোয়ার্টারের প্রধান জেনারেল সিপলে, মাঝরাতে তার ঘুম ভাঙানো হয়েছে। টেলিফোনের আর্তনাদ- জেনারেল, আপনার ঘুম ভাঙানোর জন্য দুঃখিত। একটা খারাপ খবর আছে।

জেনারেল সিপলে উঠে বসলেন। কাল রাতে তাকে অনেকক্ষণ ধরে একটা বিনোদনের আসরে থাকতে হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে একদল সেনেটর এসেছিলেন।

উনি বললেন- বিলি, কী সমস্যা হয়েছে?

র‍্যাডার টাওয়ার থেকে একটা সংকেত এসেছে, স্যার। কিছু অচেনা আগন্তুককে দেখা যাচ্ছে।

জেনারেল সিপলে উঠে দাঁড়ালেন পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি।

.

র‍্যাডার ঘরে বিশিষ্ট মানুষ এবং অফিসারদের ভিড়। ঘরের ভেতর র‍্যাডার স্ক্রিনটা রয়েছে। জেনারেল ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে র‍্যাডার স্ক্রিনের দিকে তাকালেন।

ক্যাপ্টেন মুলার বললেন- লুইস, ব্যাপারটা দেখো তো।

ক্যাপ্টেন মুলার আবার বললেন, ঘটনাটা অদ্ভুত। কেউ কি ঘণ্টায় ২২ হাজার মাইল দ্রুত ছুটতে পারে?

জেনারেল সিপলে জিজ্ঞাসা করলেন– কী বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

–গত আধ ঘন্টা ধরে র‍্যাডার স্ক্রিনে যেসব ছবিগুলো উঠছে, তা দেখে আমরা অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমরা ভেবেছিলাম, বোধহয় কোনো ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করা হচ্ছে। আমরা রাশিয়ার মানুষদের সাথে কথা বলেছি। ব্রিটিশ এবং ফরাসিদের সাথেও কথা বলা হয়েছে। তারাও র‍্যাডার স্ক্রিনে একই রকম ছবি দেখছে।

তাহলে? যান্ত্রিক পরীক্ষা নয়, তাই তো?

জেনারেল সিপলে মন্তব্য করলেন।

না, সারা পৃথিবীর সব র‍্যাডার যন্ত্র কি খারাপ হয়ে গেল নাকি?

কতগুলো মুখ ভেসে বেড়াচ্ছে?

–অন্তত বারো চোদ্দোটা হবে। তারা এত দ্রুত ঘুরছে যে ভাবাই যায় না। আমরা তাদের সঙ্গে তাল রাখতে পারছি না। আমরা ভেবেছিলাম, এগুলো বোধহয় উল্কাখণ্ড। আগুনের গোলা, আবহাওয়া বেলুন নাঃ, কোনো কিছু নয়। বিমানের ধ্বংসাবশেষ নয়।

জেনারেল সিপলে র‍্যাডার স্ক্রিনের দিকে তাকালেন এখন দেখা যাচ্ছে?

যে ভদ্রলোক বসেছিলেন, তিনি বললেন- না, এই মুহূর্তে নেই। কিন্তু যে কোনো সময় ওরা আবার ফিরে আসবে।

.

৩০.

অটোয়া, সকাল পাঁচটা

জানুস জেনারেল সিপলের রিপোর্টটা পড়লেন। ইতালিয়ান ভদ্রলোক অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। এবার যুদ্ধ শুরু হবে।

ফরাসি ভদ্রলোক বললেন- ইতিমধ্যে ওরা এসে গেছে।

রাশিয়ান ভদ্রলোক বললেন- বড্ড দেরী হয়ে গেল। বাঁচার কোনো উপায় নেই।

জানুস বাধা দিলেন– ভদ্রমহাশয়রা, এটা এমন একটা দুর্ঘটনা, যার থেকে আমরা মুক্তি পাব না।

ইংরাজ ভদ্রলোক জানতে চাইলেন কী করে এমন কথা বলছেন? ওরা কী চাইছে?

ব্রাজিলিয় ভদ্রলোক বললেন– ওরা বোধহয় আমাদের সবকিছু কেড়ে নেবে। আমাদের এত বছরের বৈজ্ঞানিক চেতনা...

–আমাদের কী হবে? জার্মান ভদ্রলোক জানতে চাইলেন। ওরা কি আকাশপথে আক্রমণ করবে? কারখানাগুলো ধ্বংস করে দেবে?

-তাহলে আমরা আর গাড়ি তৈরি করতে পারব না।

জাপানি ভদ্রলোকের প্রশ্ন- সভ্যতা বাঁচবে কী করে?

–আমাদের সকলেরই একই অবস্থা হবে, রাশিয়ান ভদ্রলোকের মন্তব্য, যদি দূষণ বন্ধ করি, যেটা ওরা বলছে, তাহলে বিশ্বের অর্থনীতি ব্যবস্থা একেবারে ধ্বসে যাবে। দেখা যাক নক্ষত্র যুদ্ধ শুরু হয় কিনা।

জানুস বললেন হ্যাঁ, মানুষদের শান্ত করব কী করে? চারদিকে আতঙ্ক সৃষ্টি হবে।

কমান্ডার বেলামি কীভাবে কাজ করছেন? কানাডিয় ভদ্রলোক জানতে চাইলেন।

–উনি দারুণ কাজ করছেন। দু-একদিনের মধ্যে অভিযানের বাকি অংশটা শেষ হবে।

গ্রাম্য রমণীর মতো

৩১.

কিয়েভ, সোভিয়েত ইউনিয়ন।

অন্যসব গ্রাম্য রমণীর মতো ওলগাও পেরোস্ত্রৈায়াতে আক্রান্ত হয়েছিল। তাদের জীবন ধারাটা একেবারে পাল্টে গেছে। আগের মতো আর সেই নিয়মশৃঙ্খলা নেই।

তিনি লাইব্রেরিতে কাজ করছেন। একটা স্কোয়ারের পাশে, কিয়েভ শহরের কেন্দ্রস্থলে, গত সাত বছর ধরে। এখন তার বয়স হল বত্রিশ। কখনও কোনোদিন সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে যাননি। চেহারাটা সত্যি আকর্ষণীয়। ওজন বেড়েছে বটে, রাশিয়াতে পৃথুলা মেয়েদের ভালোবাসার চোখে দেখা হয়। একজনের সাথে ছোট্ট একটা প্রেমের ঘটনা ঘটেছিল। ভদ্রলোক তাকে সরিয়ে দূরে চলে গেছেন। তিনি হলেন ডিমিত্রি, লেনিনগ্রাডে থাকেন এখন। আর একজন আইভান, তাকেও ওলগা ভালো বেসেছিলেন। সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য। আইভান। এখন মস্কোর বাসিন্দা। ওলগা চেয়েছিলেন মস্কোতে যেতে, আইভানের কাছে থাকতে, কিন্তু সম্ভব হয়নি।

বত্রিশ বছর জন্মদিনটা এগিয়ে আসছে। ভাবলেন, পৃথিবীর অন্য কোনো জায়গায় যেতে হবে। আবার কোনদিন লৌহ যবনিকা পড়ে যাবে। তিনি প্রধান লাইব্রেরিয়ানের কাছে গেলেন। তার অনুমতি নিলেন। আহা, কোথায় যাওয়া যায়? কৃষ্ণসাগর? সামারখন্দ? ইবলিসি? না, সোভিয়েত দেশের মধ্যে উনি কোথাও যাবেন না। উনি লাইব্রেরির তাক

থেকে বইগুলো ভরতে থাকলেন। আফ্রিকা, এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা। না, অতদূরে যাব কী করে? ইওরোপের মানচিত্র, সুইজারল্যান্ড- হ্যাঁ, এখানেই আমাকে যেতে হবে।

সুইজারল্যান্ড, অদ্ভুত আকর্ষণে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। একদা সুইজ চকোলেট খেয়েছিলেন। এখনও সব মনে আছে। উনি মিষ্টি খেতে ভালোবাসেন। রাশিয়াতে ক্যান্ডি পাওয়া যায়। চিনি কম, তেতো স্বাদ। আহা, ওই চকোলেটের সন্ধানে আরও একবার সুইজারল্যান্ডে...।

এবোফটেড উড়ান, জুরিখের পথে, অসাধারণ। আগে উনি কখনও উড়ান পাখিতে চড়ে বসেননি। জুরিখের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে নামলেন। বাতাসের ভেতর একটা অন্য সুবাস। কেন? সত্যিকারের স্বাধীনতা? ওলগা ভাবলেন। বেশি টাকা হয়তো খরচ করতে পারবেন না। যা আছে তাই দিয়েই আনন্দ করতে হবে।

হোটেলের রিসেপশন ক্লার্ককে বললেন–এই প্রথম আমি সুইজারল্যান্ডে এলাম, এখানে কী কী দেখব বলুন তো?

ভদ্রলোক বললেন অনেক কিছু দেখার আছে মিস, এই শহরটা দিয়ে শুরু করুন। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ওলগা জুরিখ শহরটাকে ভালোবেসেছিলেন। এই শহরের একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। মানুষজনের পরনে সুন্দর পোশাক। দামী দামী অটোমোবাইল ছুটে চলেছে। জুরিখের সবাই কি কোটিপতি নাকি? দোকানগুলো? আহা, অসাধারণ, সব কিছুই কিনতে ইচ্ছে

করে। চকোলেটের আবরণ দেওয়া কলা, চকোলেট বিন, লিকারে পরিপূর্ণ, চার দিকে শুধু খাবারের আহ্বান।

এক সপ্তাহ ধরে ওলগা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন। মিউজিয়ামে গেলেন। অলস সময় কাটালেন। চার্চে গেলেন। একাদশ শতাব্দীর গির্জা।

সময় দ্রুত কমে আসছে।

হোটেল ক্লার্ক বললেন সানসাইন ট্যুরিস্ট বাস কোম্পানি আল্পসে যাচ্ছে। আমার মনে হয় আপনার যাওয়া উচিত।

ওলগা জবাব দিয়েছিলেন চেষ্টা করব।

শুরু হল নতুন এক যাত্রা, অসাধারণ দৃশ্যপট। আল্পস পাহাড়, তুষারে ঢাকা।

তারপর? একটা ঘটনা চোখের সামনে ঘটে গেল। উড়ন্ত চাকি, দেখা গেল। বিস্ফোরণের শব্দ। কানাডিয় ব্যাঙ্কার তার পাশে বসে ছিলেন। তিনি সব কথা বুঝিয়ে বললেন। ওলগার বিশ্বাস হচ্ছিল না। ভয় পাওয়া উচিত, কী হাসা উচিত, বুঝতে পারছিলেন না। শেষ অব্দি ওলগা চিন্তা করলেন, দিমিত্রি কিংবা আইভান পাশে থাকলে ছুটির প্রহর আরও আনন্দঘন হয়ে উঠত। এখন রাশিয়াতে ফিরে গিয়ে কাজে মন দেওয়া সত্যি অসম্ভব ব্যাপার।

.

এয়ারপোর্ট থেকে কিয়েভ শহরের কেন্দ্রস্থলে এগিয়ে চলেছে গাড়িটি, নতুন তৈরি করা হাইওয়ে। এই প্রথম রবার্ট কিয়েভে এসেছেন। অসাধারণ স্থাপত্য দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছেন। বাসটা ড্যানিফার হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল। কয়েকজন যাত্রী নেমে গেলেন। রবার্ট ঘড়ির দিকে তাকালেন। রাত আটটা। লাইব্রেরি নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে গেছে। তাকে কাল সকাল অব্দি অপেক্ষা করতে হবে। তিনি একটা হোটেলে ঢুকে পড়লেন। বারে বসে ড্রিঙ্ক করলেন। ডাইনিং রুমে গিয়ে রাশিয়ান স্যালাড খেয়ে দেখলেন। আহা, অসাধারণ স্বাদ আর গন্ধ।

এবার কোথায় কীভাবে থাকবেন? রবার্ট ভাবলেন। না, কারও সাহায্য আমি নেব না। ডিনার শেষ হয়ে গেল। ডেস্কে বসে থাকা লোকটির সাথে গল্প করলেন। কিয়েভ হল ইউক্রেনের অন্যতম প্রাচীন শহর। ইওরোপীয় আদল আছে সর্বত্র। ড্যানিফার নদী বয়ে চলেছে। সবুজ উদ্যান আছে। গাছে ঢাকা সরণি। চার্চ আছে। ধার্মিক উন্মাদনা।

হঠাৎ সুশানের মুখটা ভেসে উঠল। সুশানকে ফোন করলে কেমন হয়।

-হ্যালো?

অনেক দূর থেকে সেই যৌন আবেদনময়ী কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

ব্রাজিলে কেমন আছো?

–রবার্ট, আমি তোমাকে অনেকবার ফোন করেছি, কিন্তু উত্তর পাইনি।

–আমি তো বাড়িতে অনেক দিন নেই।

–তাহলে ভালো আছে তো?

এক মুহূর্ত নীরবতা।

ভালো আছি। মন্টে কেমন আছে?

–ও ভালো আছে রবার্ট। আমরা জিব্রাল্টার যাব, আগামী কাল, ইয়েটে চড়ে বেড়াব।

–আহা, আমাকে ডাকবে না?

সামান্য কিছু কথা হল।

শেষ অব্দি সুশান বলেছিলেন– রবার্ট, প্রতি মুহূর্তে তোমাকে মনে পড়ে। নিজের দিকে নজর রেখো কেমন?

তখনই রবার্টের মনে হল, বিশাল রাশিয়ান ভূখণ্ডে তিনি একেবারে একা।

.

বারো নম্বর দিন।

পরের দিন সকালবেলা, লাইব্রেরি খুলছে, দশ মিনিট আগে। রবার্ট বিরাট বাড়িটিতে ঢুকে পড়লেন। রিসেপশন ডেস্কের কাছে গিয়ে বললেন- আমি ওলগার সাথে কথা বলতে চাইছি।

–ওই তো উনি আসছেন।

ধন্যবাদ।

কী বিষয়ে কথা বলা যায়?

এক মহিলাকে দেখা গেল, এগিয়ে আসতে। ভদ্রমহিলা লাইব্রেরি ঘরে ঢুকে গেলেন। নিজের পরিচয় কীভাবে দেবেন রবার্ট?

তিনি বললেন- আমি রাশিয়ার পরিবর্তিত অর্থনীতির ওপর একটা প্রবন্ধ লিখতে চলেছি। সাধারণ রাশিয়ানদের ওপর এর কী প্রভাব, সেটা আমাকে জানতে হবে। সত্যি করে বলুন তে, রাজনীতির এই পালাবদল কি আপনার জীবনকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পেরেছে?

ভদ্রমহিলা কাঁধ কঁকিয়ে বললেন- গরবাচভের আগে আমরা আমাদের মুখ খুলতে পারতাম না। এখন আমরা অনায়াসে মুখ খুলতে পারি। সত্যিকারের স্বাধীনতা পেয়েছি।

রবার্ট আর একটা কৌশল খেললেন- সত্যি কি? আপনি তো এখন ভ্রমণ করতেও পারছেন?

-হ্যাঁ, কী করে ভ্রমণ করব? এক বুড়ো স্বামী আর ছ-ছটি ছেলেমেয়ে আমার কাঁধে চাপানো, জানেন?

রবার্ট অবাক হয়ে গেছেন। আপনি তো সুইজারল্যান্ড গিয়েছিলেন?

সুইজারল্যান্ড? আমি জীবনে কোনোদিন সুইজারল্যান্ড যাইনি।

রবার্ট অবাক– সত্যি বলছেন?

হা। ওই মেয়েটির কাছে যান, ও কিন্তু সুইজারল্যান্ড থেকে ঘুরে এসেছে।

ভদ্রমহিলা একটা কালো চুলের মেয়েকে দেখালেন।

-ওর নাম কী? রবার্ট জানতে চাইলেন।

—ওলগা, একই নাম। আমার মতো।

রবার্টের দীর্ঘশ্বাস- ধন্যবাদ।

এক মুহূর্ত কেটে গেছে। রবার্ট দ্বিতীয় ওলগার সাথে কথা বলছেন।

–আমি রাশিয়ার পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখছি।

মহিলা বললেন- ঠিক আছে বলুন, কী করতে হবে?

–ওলগা বলুন তো, এই পরিবর্তন আপনার জীবনে কতখানি তফাত এনে দিয়েছে?

ছ-বছর আগেকার ঘটনা, ওলগা এক বিদেশীর সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেতেন। এখন সহজেই বললেন- আগের মতো সবকিছু আছে।

অজানা আগন্তুক জানতে চাইলেন– সত্যি কোনো নতুন ঘটনা ঘটেনি?

না, তবে আমরা এখন দেশের বাইরে যেতে পারছি।

–আপনি কি এর মধ্যে কোথাও গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, আমি সুইজারল্যান্ড ঘুরে এলাম। দারুণ সুন্দর জায়গা।

কারও সঙ্গে দেখা হয়েছিল কি?

–অনেকের সঙ্গে কথা হয়েছে। আমরা বাসে করে আল্পস দেখতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ ওলগার মনে হল, ওই মহাকাশযান সম্পর্কে কোনো কথা বলা উচিত কিনা? এই ব্যাপারটা নিয়ে তিনি কোনো বিদেশীর সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন কি?

রবার্ট বললেন- ওই বাসে আপনার সহযাত্রী কারা ছিলেন?

ওলগা বলতে থাকেন। তারা সকলেই খুব বন্ধুত্বের আচরণ করেছেন। এইভাবে তারা পোশাক পরেছিলেন। খুবই ধনী। ওয়াশিংটন ডিসি থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন।

–আপনি তার সাথে কথা বলেছেন?

–হ্যাঁ, উনি কার্ড দিয়েছেন।

কার্ডটা আছে?

না, ওটা আমি ফেলে দিয়েছি। এই ধরনের জিনিস রাখা উচিত নয়।

আবার ওলগা বললেন– ওনার নাম আমি মনে রেখেছি। পারকার, আমেরিকান পেনের মতো নাম, কেভিন পারকার। রাজনীতির এক বিখ্যাত মানুষ। তিনি বলেছিলেন, সেনেটররা কীভাবে ভোট দেয়।

রবার্ট অবাক হয়ে গেছেন সে কথা উনি বলেছিলেন?

হা, সেখানে নানা ধরনের উপহার দেওয়া হয়। আর এইভাবে ভোট কিনে নেওয়া হয়। আমেরিকাতে নাকি এমনই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু আছে।

রবার্ট আর ওলগা বেশ কিছুক্ষণ কথা বললেন। কিন্তু আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর পাওয়া গেল না।

.

রবার্ট জেনারেল হিলিয়াডকে হোটেল রুম থেকে ফোন করলেন- আমি রাশিয়ান সাক্ষীর সাথে কথা বললাম। তাঁর নাম ওলগা। সে কিয়েভের প্রধান লাইব্রেরিতে কাজ করে। আমি এখনই রাশিয়ান সরকারের সাথে কথা বলছি।

ফ্ল্যাশ আলো জ্বলে উঠল। অত্যন্ত গোপনীয়। অপারেশন ডুমস ডে। আট নম্বর সাক্ষী ওলগা কিয়েভ। খবরটা শেষ হয়ে গেল।

সেই সন্ধ্যেবেলা রবার্ট এরোফটেড এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আছেন। আধঘণ্টা কেটে গেল, আরও পঁচিশ মিনিট। তিনি এখন ওয়াশিংটন ডিসির দিকে এগিয়ে চলেছেন। এয়ার ফ্রান্সের ফ্লাইটে।

.

রাত্রি দুটো। ওলগা একটা গাড়ির শব্দ পেলেন। তার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। এই অ্যাপার্টমেন্টের দেওয়াল এত পাতলা যে, রাস্তার সব শব্দ শোনা যায়। তিনি বিছানা থেকে উঠলেন। জানলায় তাকালেন। সাধারণ পোশাক পরা দুজন তোক একটা কালো গাড়ি থেকে নেমে আসছেন। এই জাতীয় গাড়ি সরকারী মানুষেরা ব্যবহার করে। তারা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর সামনে এলেন। তাঁদের দেখে ওলগার বুকের ভেতর একটুখানি কাঁপন। অনেকদিন ধরেই এই ঘটনাটা ঘটছে। এক-একজন রাতের অন্ধকারে গায়েব হয়ে যাচ্ছে। সে কোনোদিন ফিরে আসছে না। তাদেরকে গুলাগে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সাইবেরিয়াতে। ওলগা অবাক হয়ে গেলেন। এবার ওই সিক্রেট পুলিশ অফিসার কেন

এসেছেন? সে ভাবল। কিন্তু তারপরেই দরজাতে শব্দ। আমি এখন কী করব? ওরা কি আমাকে চাইছে? হয়তো ভুল হয়েছে।

ওলগা দরজা খুলে দিলেন। দুজন সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

কমরেড ওলগা?

–হ্যাঁ।

–আমরা রাশিয়ান সিক্রেট সার্ভিস থেকে আসছি।

এক ভদ্রলোক বললেন আমি সার্জেন্ট ভ্লাদিমির।

ওলগার মনে আতঙ্কের শিহরণ। কিন্তু আমাকে কেন? মনে হচ্ছে কোনো ভুল হয়েছে বোধহয়।

উরি হাসতে হাসতে বললেন- আপনি সুইজারল্যান্ড বেড়াতে গিয়েছিলেন, তাই তো?

ওলগা আমতা আমতা করে বলতে থাকেন–হ্যাঁ, কিন্তু তার জন্য আমি তো কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আগাম অনুমতি নিয়েছি।

চাদিমির বললেন– কীসের অনুমতি? দেশের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার জন্য? আপনি সেখানে গিয়ে স্পাইয়ের কাজ করেছেন। আপনাকে এক্ষুনি আমাদের সঙ্গে হেড কোয়ার্টারে যেতে হবে।

হেডকোয়ার্টার? ওলগার সমস্ত শরীরে শীতল শিহরণ।

দুই আগন্তুক পুলিশ অফিসারের দিকে তাকিয়ে মিনতি করার ভঙ্গিতে ওলগা বললেন—- না, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি সত্যিই বলছি, কিছু জানি না।

উরির ঠোঁটের কোণে দুষ্টু হাসি। তিনি বললেন- আপনি ওভারকোটটা পরে নিন। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা। এখানে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করার মতো সময় নেই।

ওলগাকে বাইরে আসতে হল। কালো গাড়িতে বসতে হল। অন্ধকার রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে। দুই পুলিশ অফিসার নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন, ঠাট্টা মসকরা করছেন, ওলগা বেশ বুঝতে পারছেন, তার সামনে এখন একটা ভীষণ বিপদ। তাকে হয়তো সাইবেরিয়াতে নির্বাসন দেওয়া হবে। তিনি জানেন, জেলের জীবন ভয়ঙ্কর। পুরুষ রক্ষীরা যে কোনো সময় ধর্ষণ করবে। সমকামীদের শিকার হতে হবে। আর কোনোদিন হয়তো তিনি স্বাধীনতার আলো দেখতে পাবেন না। কিন্তু আমার কী দোষ? ওলগা বারবার ভাবতে থাকেন।

শেষ পর্যন্ত আশার আলোর ঝলকানি।

উরি হঠাৎ বললেন–কুমারি কন্যা, আপনাকে দেখে আমাদের ভালো লেগেছে। আসুন, একটা দেওয়া-নেওয়ার খেলা শুরু হোক।

ভাদিমির বললেন আপনি আমাদের মনের মতো কাজ করবেন, ব্যাপারটা শেষ করতে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। তারপর এই বিষয়টা আমরা ভুলে যাব। আপনাকে নিয়ে আর কোনোদিন টানাটানি করা হবে না। আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন।

ওলগা ভীত কণ্ঠস্বরে বলে ওঠেন– আপনারা কী চাইছেন? টাকা? বিশ্বাস করুন, আমার হাতে কিন্তু বেশি টাকা নেই। আমি টাকা দিতে পারব না।

একজন হো-হো করে হেসে উঠলেন, উরি, তিনি বললেন- না সুন্দরী, তোমার কাছ থেকে আমরা টাকা দাবি করছি না। ভগবান তোমাকে টাকার থেকে দামী জিনিস দিয়েছেন। সেটা আমরা দুজনে ভোগ করব। তুমি কিন্তু বাধা দিতে পারবে না।

ওলগা ভাবলেন, ব্যাপারটা এখানেই মিটে গেলে বোধহয় ভালো হয়। না হলে দারুণ ক্ষতি হবে। জেলের ভয়ঙ্কর কত...

উনি বললেন- ঠিক আছে, আপনাদের কথায় আমি রাজী, কিন্তু আমার ফ্ল্যাটে যাবেন কি?

দুজনেই হোহো করে হেসে উঠলেন– না, সেখানে আর যাব না। আমরা ওই ফাঁকা বাগানটাতে গিয়ে বসি।

কনকনে রাত। ওলগাকে নেমে আসতে হল। একজন তার কানের ওপর ট্রিগার রেখেছেন। বললেন– এখনই সব কিছু খুলে ফেলুন। তাড়াতাড়ি। আবার আমার মন হয়তো পাল্টে যাবে।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। ওলগা ওভার কোটটা খুললেন। ফিনফিনে রাত পোশাকটাও খুলতে বাধ্য হলেন। চাঁদের অলৌকিক আলো, জোৎস্নায় ভরে যাচ্ছে চারপাশ।

দুজন মুগ্ধ বিস্ময়ে ওই নগ্নিকা ওলগার দিকে তাকিয়ে আছেন। আহা, ঈশ্বরের অনবদ্য সৃষ্টি!

উরি এগিয়ে এসে স্তনবৃন্ত মুচড়ে দিলেন। ওলগা যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার কানে বন্দুক ঠেকিয়ে দেওয়া হল। বলা হল– সুন্দরী, আর একটি শব্দ উচ্চারণ করলে তোমাকে কিন্তু আমরা নরকের অন্ধকারে ঠেলে দেব।

প্রথমেই উরির পালা। তিনি জোর করে ওলগাকে ভোগ করলেন। অনেকক্ষণ ধরে।

এবার ভ্লাদিমিরের পালা, স্লাদিমির আরও কষ্ট দিলেন। আঃ, সব ব্যাপারটা ভালো ভালোয় মিটে গেছে। অপমানিতা আর বিধ্বস্তা ওলগা শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছেন। চোখ বন্ধ করে তিনি শুধু সুইজারল্যান্ডের কথাই ভেবেছেন। আহা, এমন সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, আমি কি সেখানেই একটা ছোটো বাড়ি তৈরি করব? জীবনের বাকি দিনগুলো সেখানেই কাটাব? শান্তি আর আনন্দের মধ্যে।

এ কী? ঘাড়ে একটা আক্রমণ। দুই পুলিশ অফিসার পালাক্রমে আক্রমণ করতে থাকেন। তারপর? চোখের সামনে নেমে আসে ঘন অন্ধকার।

.

পরের দিন সকালে খবরের কাগজের পাতায় বড়ো বড়ো হেডলাইন পার্কে ধর্ষিতা লাইব্রেরিয়ানের মৃতদেহ। সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এই শহরের তরুণী কন্যারা যেন একা একা পার্কে বেড়াতে না যান।

এরপরেই ফ্ল্যাশ আলো জ্বলে উঠেছে। কতগুলো সংবাদ ভেসে উঠল–অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয়। বিষয় অপারেশন ডুমস ডে। আট নম্বর সাক্ষী ওলগা। কাজটা হয়ে গেছে।

.

৩২.

উইলার্ড স্টোন এবং মন্টে বাঙ্কস পারস্পরিক শত্রু। অনেকদিন ধরেই এই শত্রুতা। ওয়াল স্ট্রিটে এঁদের কথা বারবার লেখা হয়। একটির পর একটি ঝামেলায় তারা জড়িয়ে পড়তে ভালোবাসেন।

একটা বিরাট কোম্পানি কেনা হল, তারপর দুজনের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল। উইলার্ড স্টোন প্রথম নিলামে ডাক দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, সমস্যা হবে না। তার হাতে এত শক্তি, তার নাম শুনে সকলে ভয়ে কাঁপতে থাকে। মাত্র কয়েকজন তার প্রতিদ্বন্দ্বি হবার। সাহস রাখেন। দেখা গেল, এক তরুণ উদ্যোগপতি এগিয়ে এসেছেন। তার নাম মন্টে বাঙ্কস। তিনি নিলামে অংশ নিলেন। স্টোন বাধ্য হয়ে দাম বাড়িয়ে দিলেন। বিরুদ্ধ পক্ষ দাম বাড়াতে থাকলেন। শেষ অব্দি অবশ্য উইলার্ড স্টোন এই রিবাট কোম্পানিটাকে কিনে ছিলেন। তবে এতে তাকে অনেক বেশি টাকা দিতে হয়েছিল।

ছমাস কেটে গেছে। এবার একটা মস্ত বড়ো ইলেকট্রনিক কারখানা বিক্রি হবে। স্টোনের সাথে আবার মন্টে বাঙ্কসের ঝগড়া বেঁধে গেল। নিলামের দর হু-হু করে চড়তে লাগল। এবার বাঙ্কস জিতে গেলেন।

উইলার্ড স্টোন বুঝতে পারলেন, মন্টে বাঙ্কস তার সাথে প্রতিক্ষেত্রে লড়াই করবেন। তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলেন। তারা বাহামার প্যারাডাইস দ্বীপে দেখা করলেন। উইলার্ড স্টোনের একটা সুন্দর বাহিনী ছিল। এর সাহায্যে তিনি তার প্রতিদ্বন্দী মন্টে বাঙ্কস সম্বন্ধে সব কথা জেনে নিয়েছেন। উনি একটা ধনী পরিবার থেকে এসেছেন। পৈত্রিক সূত্রে যা পেয়েছেন, সবকিছু অটুট রেখেছেন। বিশ্ববিখ্যাত হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখেছেন।

দুজনে লাঞ্চের আসরে বসেছেন। উইলার্ড স্টোনের বয়স বেশি এবং তিনি একটু কম কথা বলেন। মন্টে বাঙ্কসের বয়স কম, সবসময় কোনো কিছু করার জন্য ছটফট করছেন।

উইলার্ড স্টোন কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন এইভাবে আপনি সব ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করছেন কেন?

মন্টে বাঙ্কস বললেন- শেষ পর্যন্ত আপনি যে আমাকে আমন্ত্রণ জানাতে পারলেন, সেটা ভেবে আমি খুবই উত্তেজিত বোধ করছি।

–আপনি কী চাইছেন?

–আপনার যা স্বপ্ন, আমি পৃথিবীর রাজা হতে চাইছি।

–পৃথিবীরটা মস্ত বড়ো।

–তার মানে?

–এখানে আমরা দুজনেই পাশাপাশি বাস করতে পারব।

সেদিন থেকেই তারা অংশীদার হলেন। দুজনের সম্মিলিত ব্যবসা নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। গড়ে উঠল একটা সুন্দর সম্পর্ক।

অপারেশন ডুমস ডে, তাদের মস্তিষ্কপ্রসূত এক পরিকল্পনা। তারা দুজনেই এর সঙ্গে যুক্ত হলেন। তারা এককোটি একর জায়গা কেনার চেষ্টা করলেন আমাজন অঞ্চলে। সেখানে মস্ত বড়ো ব্যবসায়িক প্রয়াস শুরু হবে।

এইভাবেই একটা স্বপ্নের জয়যাত্রা শুরু হল।

.

৩৩.

তেরো নম্বর দিন, ওয়াশিংটন ডিসি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট, জুনিয়ার সেনেটর, দাঁড়িয়ে আছেন ফ্লোরের ওপর। তিনি বলছেন, এইভাবে আমাদের জাতীয় সম্পত্তি নষ্ট করা হচ্ছে। উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা যা পেয়েছি সেগুলোকে রক্ষা করা উচিত। আমরা সর্বশক্তি দিয়ে নিরাপত্তা বলয় রচনা করব। এই ভূমি, এই বাতাস এবং সমুদ্রকে আমরা দূষিত হতে দেব না। আমরা এখন কী করছি? আমরা ইচ্ছে করে সবকিছু নষ্ট করছি।

কেভিন পারকার অতিথিদের গ্যালারিতে বসেছিলেন। গত পাঁচ মিনিটে তিনবারের মতো ঘড়ির দিকে তাকালেন। কতক্ষণ ধরে এই ভাষণ চলতে থাকবে। তিনি এখানে বসে আছেন। কারণ সেনেটরের সঙ্গে তাকে লাঞ্চ খেতে হবে। সেনেটরের কাছে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। কেভিন পারকার ক্ষমতার অলিন্দে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন। কংগ্রেস সদস্য এবং সেনেটরদের সঙ্গে তাঁর দহরম মহরম সম্পর্ক। তাদের কাছ থেকে অনেক রাজনৈতিক অনুগ্রহ নিয়েছেন।

ইউচিনে তাঁর জন্ম হয়েছিল, দরিদ্র পরিবারে। বাবা সব সময় মদ খেতেন। এক অসফল ব্যবসাদার।

সত্যি কথা বলতে কি, পারিবারিক জীবন বলতে তার কিছুই ছিল না। মা কয়েক বছর আগে অন্য একজনকে বিয়ে করে সংসার ছেড়েছেন। অবশ্য সেই বয়স থেকেই তিনি অসাধারণ রূপবান পুরুষ হয়ে ওঠেন। মাথায় সোনালী চুলের বন্যা। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ। এটা তিনি পেয়েছেন তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে। দেখা গেল, শহরের বিখ্যাত বাসিন্দারা এই কিশোরের প্রতি অকারণ করুণা প্রদর্শন করছেন। এই শহরের সবথেকে ধনী ব্যক্তির নাম জেব, তিনি কেভিনকে সাহায্য করার জন্য উদগ্রীব

হয়ে উঠলেন। তাকে একটা আংশিক সময়ের কাজ দিলেন। মাঝেমধ্যেই অবিবাহিত জেব কেভিনকে ডিনারের আসরে নেমন্তন্ন করতেন।

একদিন জেব বললেন- তুমি এইভাবে একটা জীবন কাটাতে পারবে না। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গ তোমাকে করতেই হবে।

–আমি জানি স্যার, আপনার বন্ধুত্ব আমার ভালো লাগে। আমি আপনাকে আরও সাহায্য করতে চাইছি।

জেব বললেন–হ্যাঁ আমি তোমার কাছে আরও বেশি কিছু আশা করছি। তিনি ছেলেটির হাতে হাত রাখলেন। তুমি খুব ভালো ছেলে জানো কি?

-হ্যাঁ।

কখনও একা মনে হয় না?

কেভিন সবসময় একা, তিনি বললেন- হা।

–তাহলে এসো আমার কাছে, তোমাকে আর একা থাকতে হবে না। তুমি তো জানো, আমিও বড় একা, আমি তোমাকে সব ব্যাপারে সাহায্য করব। তুমি কি কখনও কোনো মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব করেছ?

–আমি সুত্রলেনার কাছে গিয়েছিলাম। কয়েকবার।

–তার সাথে শুয়েছ কি?

ছেলেটির মুখে রক্তিম আভা না, স্যার।

-তোমার বয়েস কত কেভিন?

–ষোলো।

–এখনই শুরু করতে হয়। এই বয়সেই তো পৃথিবীটা খুলে যায়। তুমি রাজনীতিতে আসবে?

রাজনীতি? আমি তো তার কিছুই বুঝি না।

যখন তুমি স্কুলে গিয়েছিলে তখন পড়াশোনা জানতে কি? আমি তোমাকে সাহায্য করব। এখানে অনেক কিছু করার আছে। তিনি কেভিনের পায়ের ওপর হাত রাখলেন। হাতটা ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। ইংগিত পূর্ণ চোখে তাকালেন পার্কারের চোখের দিকে। তারপর বললেন– আশা করি তুমি আমার কথার আসল অর্থ বুঝতে পারছ।

–হ্যাঁ, জেব আমি বুঝতে পারছি।

এভাবেই নিষিদ্ধ উপন্যাসটা শুরু হয়েছিল।

.

চার্চিল হাইস্কুল থেকে কেভিন পার্কার গ্রাজুয়েট হলেন। জেব তাকে অরিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠালেন। উনি মন দিয়ে রাষ্ট্রনীতি বিজ্ঞানটা পড়লেন। জেব বুঝতে পারলেন, স্বপ্ন কীভাবে সফলতার দিকে এগিয়ে চলেছে। সকলেই এই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের পুরুষটির প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা প্রদর্শন করতে চলেছে। ধীরে ধীরে অনেক বিখ্যাত মানুষদের সাথে পার্কারের যোগাযোগ স্থাপিত হল। সব মানুষকে এক জায়গায় আনার একটা ক্ষমতা ছিল পার্কারের মধ্যে। ওয়াশিংটনে পৌঁছে গেলেন, পা ফেলে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

দু-বছর আগে জেবের মৃত্যু হয়েছে, ইতিমধ্যেই পার্কার তার কাছ থেকে বিরাট ঐশ্বর্য সংগ্রহ করেছেন। মানুষকে ভালোবাসার শিক্ষা, সকলকে সম্মোহিত করার যাদুদণ্ড এখন তার হাতে। তিনি মাঝেমধ্যেই কিশোর ছেলেদের নিয়ে কোনো এক অজ্ঞাত হোটলে চলে যান, যেখানে কেউ তাকে চিনতে পারবে না।

শেষ পর্যন্ত উটাহ থেকে এক সেনেটর হিসেবে নির্বাচিত হলেন। তিনি এখন ভাষণ দিচ্ছেন, তিনি বলছেন আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার কারণেই পরিবেশের বিষয়টির ওপর নজর দিতে হবে।

ভাষণ শেষ হল, কেভিন পার্কার ভাবলেন, এই সন্ধ্যেটা আমার সামনে পড়ে আছে। এখনই শুরু হয়েছে। গতকাল এক কিশোরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। জিস স্টেশনে। কিন্তু ওই ছেলেটির সাথে আরেকজন ছিল। পার্কার ভাবলেন, একে কী করে জব্দ করা যায়, ছোট্ট একটা চিরকুট হাতে দিয়েছিলেন। লেখা ছিল, কাল রাতে, ছেলেটি বুঝতে পেরেছিল, হেসে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

.

কেভিন পার্কার তাড়াতাড়ি পোশাক পরলেন। এখনই তাকে বারে ছুটতে হবে। ছেলেটি এখনই সেখানে এসে যাবে। এই ছেলেটি খুবই আকর্ষণীয়। পার্কার আর কারোর সাথে ভাব জমাবেন না। হঠাৎ ডোরবেল বেজে উঠল। পার্কার দরজা খুলে দিলেন।

একজন দাঁড়িয়ে আছেন আপনি কেভিন পার্কার?

-হ্যাঁ।

–আমার নাম বেলামি, আমি এক মিনিট আপনার সঙ্গে কথা বলব।

পার্কার অধৈর্য খুব জরুরী একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আমার সেক্রেটারীর সাথে। আমি অফিসের বাইরে এ বিষয়ে আলোচনা করি না।

–এটা ব্যবসার ব্যাপারে নাম মি. পার্কার। আপনি সুইজারল্যান্ডে গিয়েছিলেন, কয়েক সপ্তাহ আগে মনে আছে তো?

-হ্যাঁ, গিয়েছিলাম তাতে কী?

আমার এজেন্সি, এই ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। সেখানে গিয়ে আপনি কাদের সঙ্গে দেখা করেছেন সেটা আমি জানতে চাইছি।

বেলামি সঙ্গে সঙ্গে তার সি আই এর কার্ডটা দেখালেন। কেভিন পার্কার এবার ভালোভাবে তাকিয়ে দেখলেন। সি আই এর সাথে আমার কী দরকার? ব্যাপারটার মধ্যে রহস্যের গন্ধ আছে।

লোকটাকে চটিয়ে লাভ নেই। উনি হাসলেন– ভেতরে আসুন। আমার দেরি হয়ে গেছে, কিন্তু আপনি বলছেন এক মিনিটের বেশি সময় লাগবে না তাই তো?

না স্যার, আমি জানি আপনি একটা ট্যুরিস্ট বাসে করে জুরিখ শহরের বাইরে গিয়েছিলেন।

তার মানে? ওই উড়ন্ত চাকির ব্যাপার তো? আর কতবার এই প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতে হবে কে জানে।

কেভিন বললেন– আপনি বোধহয় ওই উড়ন্ত চাকি সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন? হ্যাঁ, এটা একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা। আমি অস্বীকার করতে পারছি না।

আমাদের এজেন্সি ফ্লাইং সসারদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। আপনি কি জানেন আপনার সাথে আর কে কে ওই বাসে ছিলেন?

পার্কার অবাক হয়ে গেছেন। এ ব্যাপারে আমি আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারব না। কারণ তাঁরা সকলেই ছিলেন অপরিচিত।

–আমি জানি মি. পার্কার, রবার্ট শান্তভাবে বললেন, কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই তাদের হাবভাব কিংবা স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে কিছু জেনেছিলেন। এখনও মনে আছে কি?

পার্কার কাধ ঝাঁকিয়ে বললেন- হ্যাঁ, কয়েকটা জিনিস আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমি এ এক ইংরেজ ভদ্রলোকের সাথে কথা বলেছিলাম। তিনি আমাদের ছবি নিয়েছিলেন।

লেসলি মাদারশেড, রবার্ট বুঝতে পারলেন, আর কেউ?

হ্যাঁ, আমি এক রাশিয়ান মেয়ের সাথে কথা বলেছিলাম। ভারী সুন্দরী, আমার মনে হয় উনি বোধহয় ওলগা, লাইব্রেরীয়ান।

-ওলগা, বাহ, ভালো, আর কেউ, মি. পার্কার?

না, হা, আরও দুজনের কথা বেশ মনে আছে, একজন আমেরিকান, টেকসাসের বাসিন্দা।

ড্যান ওয়েনে। আর কেউ?

–একজন হাঙ্গেরির বাসিন্দা। তার একটা কার্নিভাল কিংবা সার্কাস জাতীয় কিছু আছে।

–হ্যাঁ, একটা কার্নিভাল আছে।

–এ ব্যাপারে আপনি একেবারে সুনিশ্চিত মি. পার্কার?

–হ্যাঁ, উনি আমাকে কার্নিভাল ব্যবসার গল্প বলছিলেন। উড়ন্ত চাকিটা দেখে তিনি উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়েন। মনে হয় তিনি বোধহয় এটাকে কার্নিভালে নিয়ে যেতে চাইছিলেন। আমি বলব, ওঃ, ভয়ংকর দৃশ্য। আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না।

-ওঁর নাম মনে আছে?

না, নামগুলো উচ্চারণ করা খুবই খটমটে।

–আর কিছু?

উনি কার্নিভালে ফিরতে ব্যস্ত ছিলেন। এবার আমায় ছেড়ে দেবেন কি?

–হ্যাঁ, মি. পার্কার, আপনি আমায় অনেক সাহায্য করেছেন।

তারা হাতে হাত দিলেন। রবার্টের মুখে শুকনো হাসি।

কোনো সময়ে আমার অফিসে আসবেন কেমন? ভালোভাবে গল্প করব।

–চেষ্টা করব।

রবার্ট ভাবলেন, এবার? কী করে ওই লোকটিকে ধরব?

.

রবার্ট জেনারেল হিলিয়াডকে ফোন করলেন জেনারেল, কেভিন পাকারের সঙ্গে কথা হয়েছে। ওয়াশিংটন ডিসির এক উঠতি রাজনীতিবিদ। আমি শেষ প্যাসেঞ্জারের সন্ধান করছি।

জেনারেল হিলিয়াডের কণ্ঠস্বর– ভারী ভালো কাজ করেছেন আপনি কমান্ডার, তাড়াতাড়ি জানাবেন।

মেসেজের আলোটা জ্বেলে দিলেন। অত্যন্ত গোপনীয়। অপারেশন ডুম শেডন নম্বর কেভিন পার্কার, ওয়াশিংটন ডিসি, মেসেজটা শেষ হয়ে গেল।

.

কেভিন পার্কার ড্যানিস ফ্রি স্ট্রিটে এলেন। দেখলেন অনেক লোকের ভিড়। এত বেশি লোক আজ কেন? বয়স্ক লোকেরা পুরোনো দিনের স্যুট পরেছে। তরুণরা নানা ধরনের আধুনিক পোশাকে সজ্জিত। অনেকে আবার কালো চামড়ার পোশাক পরে ঘোরাফেরা করছেন। পার্কার ভাবলেন হয়তো এই দৃশ্য দেখে সময় কেটে যাবে। আঃ, অনেকটা সময় বাজে কেটে গেল।

কেভিন পার্কার এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছেন। কোথায় যাবেন বুঝতে পারছেন না। অনেক লোকের কথাবার্তা তার কানে যাচ্ছে। এখন কি ড্যান স্কোয়ারে গিয়ে বসবেন?

কিছু কথাবার্তা তার কানে গেল।

–সে নিজেকে বিশ্বের সেরা সুন্দরী বলে মনে করে।

না, এত বেশি টাকা নিলে আমি দেব কেমন করে?

–আপনি কোষ্টা চাইছেন? ওপরের না নীচের দিকের?

–অবশ্যই ওপরের দিকের। আমি সব সময় আদেশ করতেই ভালোবাসি।

–আচ্ছা আমি দেখছি।

–জিনিসটা ভালো হওয়া চাই। আমার সবকিছু? আপনি দেখছেন তো?

রাত একটা বেজে গেছে, ছেলেটি হেঁটে হেঁটে এগিয়ে এল। সে চারপাশে তাকাল। পার্কারকে দেখতে পেল। পার্কার দেখছে, ছেলেটি সত্যিই সুন্দর।

শুভ সন্ধ্যা।

–আমার দেরী হয়েছে বলে দুঃখিত।

দাঁড়িয়ে থাকতে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি।

ছেলেটি সিগারেট ধরাল, কেভিন আগুন ধরিয়ে দিলেন।

–আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম। পার্কার বললেন।

সত্যি সত্যি?

ছেলেটির চোখের তারায় বিস্ময় মেশানো চাউনি।

–তুমি কি ড্রিংক করবে?

–হ্যাঁ, একটু করলে ভালো হত।

–তুমি আর কিছু কি করবে আমার জন্য? যা আমাকে সত্যিকারের সুখী করবে।

ছেলেটি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল- হ্যাঁ, আমি করব।

–গতরাতে তোমার সাথে একজন ছিল, সে তোমার ঠিক বন্ধু নয়।

–আপনি কি আমাকে আনন্দ দিতে পারবেন?

–হ্যাঁ, কেন পারব না। চলো আমরা হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি।

–এটাই ভালো লাগছে।

পার্কারের মনে হল হৃদয়ে যেন উত্তেজনার আগুন।

আমরা একটা সুন্দর জায়গায় যাব। সেখানে আর কেউ থাকবে না।

–ভালো হবে। আমি কি আরেকটু ড্রিংক করব?

তারা সামনের দরজার দিকে এগিয়ে এল। দরজাটা খুলে গেল। দুজন অল্প বয়েসী ছেলে বারে ঢুকে পড়েছে। তারা ওই ছেলেটির সামনে রাস্তা আটকে দাঁড়াল। বলল- তুমি, এখানে। কী করছ? টাকাটা কখন দেবে?

ছেলেটা অবাক হয়ে গেছে। বুঝতে পারছে না কী ঘটেছে। সে বলল আপনারা কী বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি তো আপনাদের কখনও আগে দেখিনি।

একজন চীৎকার করে বলল– আর কথা বলতে হবে না। একজন তার কাঁধে হাত, রেখেছে। তাকে মারতে মারতে রাস্তায় নিয়ে এল।

পার্কার অবাক হয়ে গেছেন। ভীষণ রেগে গেছেন তিনি। এই ব্যাপারে তাকে হস্তক্ষেপ করতেই হবে। কিন্তু এমন ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লে বদনাম ছড়িয়ে পড়বে। তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন। দেখলেন, ছেলেটা অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় মানুষটি কেভিন পার্কারের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

এবার থেকে আরও ভালোভাবে বন্ধু নির্বাচন করবেন কেমন?

পার্কার ওই লোকটির দিকে তাকালেন। আহা, মাথার চুল সোনালী, কী সুন্দর স্বভাবের। হ্যাঁ, দেহের কোথাও কোনো খুঁত নেই। পার্কারের মনে হল, সন্ধ্যেটা এভাবে নষ্ট করে কী লাভ? তিনি বললেন- তুমিও তো আমার আসল বন্ধু হতে পারো। কি পারো না?

জানি না আমাদের ভাগ্যে কী আছে। আমরা কী জানি?

লোকটি পার্কারের চোখের দিকে তাকাল।

–আমার নাম টম, তোমার নাম কী?

–পল।

–পল, এসো আমরা একসঙ্গে ড্রিংক করি।

অনেক ধন্যবাদ।

–আজ রাতে তুমি কী করবে?

–সেটা আপনার ওপর নির্ভর করছে।

–তুমি কি সারারাত আমার কাছে থাকবে?

ব্যাপারটা ভালোই লাগবে।

কাছে কত টাকা আছে?

দুশোর মতো হবে।

–এতেই হবে। তিরিশ মিনিট কেটে গেছে, পল সামনে এগিয়ে চলেছে। কেভিন পার্কার তাকে অনুসরণ করছেন। তারা জেপারসন সিটির একটা পুরোনো অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর কাছে পৌঁছে গেল। তারা তিনতলায় গেল। একটা ছোটো ঘরে ঢুকে গেল।

পার্কার চারিদিকে তাকিয়ে বললেন- ঠিক আছে, কিন্তু একটা হোটেল হলে কি ভালো হতো না? .

পল বলল- না টম, এখানে নিরাপত্তা অনেক বেশি, আমাদের তো একটা খাট দরকার, আর কিছু নয় তো।

–ঠিকই বলেছ, এখন তুমি শুরু করো। দেখি তোমার নগ্ন রূপ কেমন দেখায়।

পলের কণ্ঠস্বরে কী একটা অদ্ভুত আকুতি। তুমিও, আমি আর থাকতে পারছি না। আমি তোমাকে ভীষণভাবে কাছে চাইছি।

পার্কার তার জামাকাপড় খুলতে শুরু করেছেন।

পল জিজ্ঞাসা করল, তুমি কী পছন্দ করো? মুখ, নাকি অন্য কিছু।

এসো আমরা মিলেমিশে খাই। সারারাত এভাবেই আমরা আনন্দ করব।

–হ্যাঁ, আমি একটু বাথরুমে যাচ্ছি। পল বলল, আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি।

পার্কার উলঙ্গ হয়ে বিছানাতে শুয়ে আছেন। ভাবছেন, শুভ মুহূর্তটি সমাগত হবে। তার সঙ্গী বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। ধীরে ধীরে বিছানার দিকে এগিয়ে আসছে।

কেভিন হাত দুটো বাড়িয়ে দিলেন, বললেন- এসো বন্ধু, আমি আর থাকতে পারছি না।

–আমি আসছি।

হঠাৎ বুকে যন্ত্রণা, একটা ছুরি তার বুকের মধ্যে ঢুকে গেছে। চোখ দুটো খোলা, হায় ঈশ্বর এ কী?

পল পোশাক পরে নিচ্ছে।

–ভেবো না, টাকার জন্য ভেবো না। সবকিছু তুমি পেয়ে যাবে!

লাল আলো জ্বলে উঠেছে। গোপনীয়, অত্যন্ত গোপনীয়। অপারেশন ডুমস ডে, ন নম্বর কেভিন পার্কার। ওয়াশিংটন ডিসি। কাজটা হয়ে গেছে।

.

তখন রবার্ট বেলামি চলেছেন হাঙ্গেরীর দিকে। এমন একটি মানুষের সন্ধানে যে একটা কার্নিভালের মালিক। তাই এই নিউজ বুলেটিনটা তার চোখে পড়েনি।

.

৩৪.

চোদ্দ নম্বর দিন, বুদাপেস্ট।

প্যারিস থেকে বুদাপেস্ট, মালের এয়ার লাইনস। দু ঘণ্টা পাঁচ মিনিট। রবার্ট জানতেন না কিছুই হাঙ্গেরী সম্পর্কে। শুধু জানতেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হাঙ্গেরী অক্ষশক্তির অন্যতম ছিল। পরে রাশিয়ার অধীনে এক করদ রাজ্যে পরিণত হয়। রবার্ট এয়ারপোর্ট থেকে বাস নিয়ে বুদাপেস্ট শহরের কেন্দ্রে পৌঁছে গেলেন। বুদাপেস্ট দৃশ্যাবলী তাকে মুগ্ধ এবং মোহিত করেছে। পুরোনো শহরের মধ্যে আধুনিকতার স্পর্শ। পার্লামেন্ট হাউসটা দেখতে ভারী সুন্দর। নিও গ্রথিক স্থাপত্য শৈলীর অসাধারণ নিদর্শন। ক্যাসেল হিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে রয়াল প্যালেস। রাস্তায় অসংখ্য মানুষের ভিড়। অটোমোবাইল আপন গতিতে এগিয়ে চলেছে।

হোটেল লুনা ইন্টার কন্টিনেন্টাল, রবার্ট লবিতে হেঁটে গেলেন।

–আমাকে ক্ষমা করবেন। রবার্ট বললেন, আপনারা কি ইংরাজি বলতে পারেন?

কিছু কিছু পারি। বলুন আমি কি করব?

-কদিন আগে আমার এক বন্ধু বুদাপেস্টে এসেছেন, তিনি একটা সাংঘাতিক ভালো কার্নিভাল রেখেছেন। আমি এই শহরে কিছু দিন থাকব, কার্নিভালটা দেখতে পাব কি? কোথায় গেলে পাওয়া যাবে বলতে পারবেন কি?

ভদ্রলোক অবাক কার্নিভাল? তিনি কয়েকটা কাগজের দিকে তাকালেন। দেখা যাচ্ছে, বুদাপেস্টে এখন তো একটা অপেরা আছে, কয়েকটা থিয়েটার, ব্যালে সারা দিন ধরে শহরটা দেখতে পারেন। এই দেশের অন্য জায়গায় আসতে পারেন। কিন্তু কোনো কার্নিভাল তো নেই।

–আপনি কি ঠিক বলছেন?

ভদ্রলোক কাগজগুলো রবার্টের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন- আপনি নিজের চোখে দেখুন। এটা হাঙ্গেরী ভাষায় লেখা আছে।

রবার্ট বললেন- ঠিক আছে, আর কি কেউ এই বিষয়ে কথা বলতে পারবেন?

-আপনি একবার সংস্কৃতি মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

তিরিশ মিনিট কেটে গেছে, রবার্ট তখন সংস্কৃতি মন্ত্রকের এক করণিকের সাথে কথা বলছেন।

না, এখানে কোনো কার্নিভাল নেই। সত্যি আপনার বন্ধু হাঙ্গেরীতে কার্নিভাল রেখেছেন?

-হ্যাঁ।

–কিন্তু কোথায় উনি তা বলেছেন। না আমি দুঃখিত, আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব না। ভদ্রলোক অধৈর্য, আর কিছু বলার আছে?

না, রবার্ট দাঁড়ালেন, ধন্যবাদ, আরেকটা প্রশ্ন। আমি কার্নিভাল কি হাঙ্গেরিতে সার্কাস কিংবা আনতে পারি? অনুমতি পাবো কি?

-হ্যাঁ।

–কোথায় যোগাযোগ করতে হবে?

বুদাপেস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসে, লাইসেন্স বিভাগে।

.

লাইসেন্স বিভাগটা বুধাতে অবস্থিত। সেই প্রাচীন শহরের কাছে। রবার্ট তিরিশ মিনিট ধরে অপেক্ষা করছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি অফিসে গেলেন।

কীভাবে আপনাকে সাহায্য করব?

রবার্টের মুখে হাসি আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। আমি আমার ছোটো ছেলের সঙ্গে এখানে এসেছি। সে শুনেছে হাঙ্গেরীতে নাকি কার্নিভাল উৎসব খুব জনপ্রিয়। আমি তাকে কার্নিভাল দেখাব বলেছিলাম। বলতে পারেন কোথায় গেলে কার্নিভালের সন্ধান পাব?

ভদ্রলোক রবার্টের দিকে তাকালেন– কী দেখতে চাইছেন?

-সত্যি কথা বলতে কী, কোথায় কার্নিভাল দেখা যায় এ বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই। হাঙ্গেরী এত বড় সুন্দর একটা শহর। কেউ কি জানে কোথায় কার্নিভালের সন্ধান : পাওয়া যাবে?

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন- না, এখানে এ ধরনের কিছু করতে দেওয়া হয় না। তিনি একটা বোতাম টিপলেন। সেক্রেটারী প্রবেশ করলেন। হাঙ্গেরীয় ভাষায় তাঁরা কিছু কথা বললেন। সেক্রেটারী চলে গেলেন। দু মিনিট বাদে তিনি কিছু কাগজ নিয়ে এলেন। ভদ্রলোক রবার্টের দিকে তাকালেন। বললেন- তিন মাসে আমরা মাত্র দুটো পারমিট দিয়েছি। একটা দিয়েছি একমাস আগে, কিন্তু সেটা তো বন্ধ হয়ে গেছে।

আরেকটা?

আরেকটা সফ্রনে আছে। জার্মান সীমান্তের কাছে একটা ছোটো শহরে।

আপনারা কি মালিকের নাম জানেন?

ওই ভদ্রলোক বললেন- হ্যাঁ, উনি হলেন লাসলো।

.

লাসলো তার জীবনের সেরা সময়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছেন। এত বেশি টাকা হাতে এসেছে তিনি ভাবতেই পারছেন না। কীভাবে খরচ করবেন সেটাই হচ্ছে সমস্যা। তিনি একজন লম্বা চওড়া মানুষ। ছ-ফুট চার ইঞ্চি, তিনশো পাউন্ড ওজন, হাতে হীরে,

বাঁধানো একটি ঘড়ি, আঙুলে আছে হীরের আংটি। সোনার ব্রেসলেট পরেছেন। বাবার একটা ছোেট্ট কার্নিভাল ছিল। বাবা যখন মারা যান, তখন থেকেই এর দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন। কার্নিভালকে কেন্দ্র করে তার জীবনের সবকিছু আবর্তিত হচ্ছে।

লাসলোর ভারী সুন্দর স্বপ্ন আছে। তিনি তার ছোট্ট কার্নিভালটিকে আরও বড়ো করতে চান। একদিন তা সমস্ত ইউরোপের সেরা কার্নিভালে পরিণত হবে। এই মুহূর্তে তিনি বেশি কিছু দেখাতে পারছেন না। এখানে এক লেডি আছে, আছে গায়ে অসংখ্য উল্কি আঁকা একটি মানুষ। শ্যামদেশ থেকে দুই যমজ কন্যাকে নিয়ে আসা হয়েছে। হাজার বছরের পুরোনো একটা মমিও আছে। সেটা নাকি ইজিপ্ট থেকে তুলে আনা। আরও কত কী আছে, এক ভদ্রলোক তলোয়ার গিলে ফেলতে পারে। মুখের ভেতর আগুন জ্বালাতে পারে। সাপের নাচন, কিন্তু এখানেই তিনি থামতে চান না।

সারারাত ধরে তিনি স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসেন। স্বপ্নকে সত্যি করতে চান।

তিনি সুইজারল্যান্ডে গেছেন, সেখানকার শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলতে। এরই পাশাপাশি কিছু জায়গা ঘুরে দেখেছেন। সুইজারল্যান্ড থেকে কিছু শিল্পীকে এখানে আনতেই হবে। তাহলে কার্নিভালটা জমে উঠবে।

আহা, লাসলো ভাবলেন, আবার কবে আমি বাইরে যাব। নতুন নতুন জগত দেখব।

অন্যান্য সহযাত্রীদের মতো তিনিও ওই বিস্ফোরণটা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ভাবতে পারেননি যে এমন একটা মহাকাশযান এভাবে আঘাত করতে পারে। শুনেছেন

উড়ন্ত চাকি বলে কিছু আছে। কিন্তু তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেননি। শেষ অব্দি বিশ্বাস করতে বাধ্য হলেন।

তারপর? এখানে ফিরে আসার পর মাঝে মধ্যেই ভয়ংকর দৃশ্যটা তার মনকে আলোড়িত করে।

সুইজারল্যান্ডে যাবার আরও একটি কারণ ছিল। তিনি শুনেছিলেন একজন বিখ্যাত আর্টিস্ট নাকি সেখানে বন্দী জীবন যাপন করছেন। তাকে একবার যোগাড় করতে পারলে কেমন হয়?

ব্যাপারটা সম্ভব হবে কি?

লাসলো এভাবেই ভাবতে ভালোবাসেন।

সহযাত্রীদের কথা মনে পড়ছে। যারা ওই মারাত্মক বিস্ফোরণটা দেখেছিলেন। ছবি তোলা হয়েছিল। আঃ, দুটো সাংঘাতিক শরীর, জীবিত কী মৃত বুঝতে পারা যাচ্ছে না। লাসলো এখনও চোখ বন্ধ করে দেখতে পান। তখনই রুমালটার প্রয়োজন পড়ে। ঘাম মুছতে হয়। কোনো কিছুই আর ভালো লাগে না।

.

বাড়িতে ফিরে এলেন, হাত থরথর করে কাঁপছে। কেন? পুরোনো কোনো কথা?

যখন কার্নিভালটা আরও বড় হবে, তিনি সারা পৃথিবী ভ্রমণের সুযোগ পাবেন। বিজ্ঞানীদের জন্য আলাদা একটা শোয়ের ব্যবস্থা করবেন। সেখানে রাজনীতির বিখ্যাত মানুষজনও উপস্থিত হবেন। তাদের সকলের কাছ থেকে পয়সা নিতে হবে। হ্যাঁ, পয়সার পাহাড়ে আমাকে উঠতেই হবে, আসলো ভাবলেন।

এমনকি তিনি সৌভাগ্যের এই কথাটা তার প্রিয়তমা মারিটার কাছেও বলেননি। যৌনবতী ওই নর্তকী, অনায়াসে যে সাপিনীর সাথে খেলা করতে পারে। যদিও বিষদাঁত ভেঙে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দর্শকরা তা বুঝতে পারে না। কারণ লাসলো আরও একটা গোখরোকে রেখেছেন। অবিকৃতভাবে, যখন খেলা দেখানো হয়, তখন ওই সত্যিকারের গোখয়রাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। মুহূর্তের মধ্যেই সে ইঁদুরকে মেরে ফেলে। লোকেরা সভয়ে আর্তনাদ করতে থাকে। মারিটা যখন মঞ্চে আসে, সঙ্গে থাকে তার পোষা নির্বিষ সাপ। তার অর্ধ উলঙ্গ দেহ, ভাবতে ভালো লাগে। সপ্তাহে দুবার অথবা তিনবার মারিটা আসলোর টেন্টে আসে। লাসলের সাথে অসভ্য খেলা খেলে। আহা, এই মেয়েটি সব ব্যাপারে এত পারদর্শিনী হল কী করে? একে একটা পোষা জন্তুর মতো মনে হয়।

গতকালই তারা ভালোবাসা বিনিময় করেছিল। লাসলো একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। মারিটার শরীরের মধ্যে অদ্ভুত সহনশীলতা আছে। আছে এমন এক অদম্য আকর্ষণ যা কখনও অগ্রাহ্য করা যায় না।

স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে গেল। রোমন্থনের সমুদ্রে আলোড়ন। এক অজ্ঞাত আততায়ী বুঝি জেগে উঠেছে।

–আপনি লাসলো?

–হ্যাঁ। আমি আপনার জন্য কী করতে পারি?

-আপনি তো গত সপ্তাহে সুইজারল্যান্ড গিয়েছিলেন, তাই না? সেখানে আপনার কী অভিজ্ঞতা হল সংক্ষেপে বলবেন কি?

কী বিষয়ে জানতে চাইছেন?

–আপনি তো বাসে করে নানা জায়গায় গিয়েছিলেন। রোববার। তাই না?

লাসলো বললেন- হ্যাঁ।

রবার্ট বেলামির মনে আনন্দ। শেষ পর্যন্ত খেলাটার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছি আমি। এটাই হল শেষতম সাক্ষী। একে একে সব সাক্ষীকে ধরতে আমি সফল হয়েছি। একটা অসম্ভব অভিযানকে সম্ভব করেছি। আঃ, বাকি জীবনটা শুয়ে শুয়ে কাটাব।

–আমার ওই ভ্রমণ পরিকল্পনা সম্পর্কে আপনি এত আগ্রহী কেন?

বেলামি বললেন- ব্যাপারটা খুব উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এটা আমার কাছে আগ্রহজনক হতে পারে। আমি ভাবছি আপনার কাছ থেকে সব খবর সংগ্রহ করব।

লাসলো বললেন- কেন? খবর জেনে কী হবে? কারা কারা আমার সঙ্গে ছিলেন তাই তো? এক ইতালীয় ধর্মযাজক ছিলেন, তিনি অরভিয়েটে থেকে এসেছেন। জার্মান দেশের এক অধ্যাপক ছিলেন। তিনি এসেছেন মিউনিখ থেকে। এক রুশদেশীয় যুবতী ছিলেন, তিনি কিয়েভের একটি লাইব্রেরীতে কাজ করেন। টেকসাসের ওয়াকে থেকে এক ব্যবসায়ী এসেছিলেন। এক কানাডীয় ব্যাংকার। পার্কার নামে এক ভদ্রলোক এসে ছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত।

.

হায় ঈশ্বর, যদি এই ভদ্রলোককে প্রথম পেতাম তাহলে সবকিছু খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যেত। এ তো দেখছি খবরের খনি। তিনি বললেন আপনার স্মৃতি তো খুব পরিষ্কার।

লাসলো হাসলেন- হ্যাঁ, আরেকজন ভদ্রমহিলা এসেছিল।

–ওই রাশিয়ান মেয়েটি?

না-না, আরেকজন ভদ্রমহিলা, সম্পূর্ণ সাদা পোশাক পরা। লম্বা, চেহারাটা পাতলা। রবার্টের বুকের কাঁপন আরও বেড়ে গেছে। কেউ এতক্ষণ পর্যন্ত এই ভদ্রমহিলার কথা বলেননি কেন?

উনি বললেন- আপনি বোধহয় ভুল করছেন।

না, আমি ভুল করছি না, সব মিলিয়ে আমাদের সঙ্গে দুজন মহিলা ছিলেন।

রবার্টের মনে উত্তেজনা। উনি বললেন- কেউ তো ওনাকে দেখেননি?

-যখন ফটোগ্রাফাররা ছবি তুলছিলেন, তখন তিনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আহা, অসামান্য রূপবতী। সবথেকে মজার কথা হল, উনি বোধহয় আড়ালে থাকতেই ভালোবাসেন। ওনার শরীরটা রক্তশূন্য, মনে হচ্ছে, উনি যেন কারোর জন্য চিন্তিত ছিলেন।

রবার্টের মনে উৎকণ্ঠা– বাসে ফিরে আসার পর তিনি আপনার পাশেই বসেছিলেন?

না, তারপর তো আমি ওনাকে দেখতে পাইনি। আসলে তখন আমি ওই উড়ন্ত চাকিটা দেখে এত উত্তেজিত ছিলাম যে চারপাশে কী হচ্ছে বুঝতে পারিনি।

–আপনাকে ধন্যবাদ।

.

সে রাতে রবার্ট বেলামি তার শেষ রিপোর্টটা জেনারেল হিলিয়াডের কাছে তুলে দিলেন। নাম পাওয়া গেছে, লাসলো, তিনি সফরনে একটা কার্নিভালের মালিক।

–এটাই হল শেষতম সাক্ষী?

রবার্ট এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন, সাদা পোশাক পরা মেয়েটির কথা বলবেন কিনা ভাবলেন। তারপর বললেন- হ্যাঁ, স্যার, আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে।

দশ নম্বর যাত্রীকে সনাক্ত করা সম্ভব হল। তারপর? অনন্ত ছুটি আর কী?

অনেক ধন্যবাদ কমান্ডার, আপনি অসাধ্যকে সাধ্যাতীত করেছেন।

আলো জ্বলে উঠল, লাল আলো, গোপন খবর। অপারেশন ডুস ডে, দশ নম্বর লাসলো, সফরন, খবরটা শেষ হয়ে গেল।

.

মধ্যরাত, কার্নিভাল বন্ধ হয়ে গেছে। পনেরো মিনিট বাদে তারা এসেছে। অত্যন্ত নীরবতার মধ্যে। লাসলো স্বপ্ন দেখছেন। তিনি একটা বিরাট সাদা টেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে। আছেন। হাজার হাজার মানুষ আনন্দে হাত তুলছে, টিকিট কিনতে হবে। এইভাবে স্বপ্নটা সফল হবে, হ্যাঁ, দেখলাম, অন্য রো থেকে দুটো অজানা অচেনা প্রাণী নেমে এসেছে। তাদের চোখে জিঘাংসা। এমন দৃশ্য সারা জীবন আর কখনও দেখতে পাব না।

মারিটার সঙ্গে যখন তিনি শয্যায় শুয়ে থাকেন, দুজনেই সম্পূর্ণ ল্যাংটো, মনে হয়, আহা, ওই দুটো বৃন্ত আমার বুকের সাথে চেপে বসে আছে। ওর জিভ আমার শরীরের সবখানে স্বর্গের কারুকাজ আঁকছে। মেয়েটি হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটছে আমার দেহের ওপর। আমার দুষ্টু খোকাটা উত্থিত হচ্ছে। আমি ওর কাছে এগিয়ে যাচ্ছি। ঠাণ্ডা কোনো কিছু একটা আমার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। আমি চোখ খুলছি। আমি চীৎকার করছি। এ কী? বিষাক্ত গোখরো সাপ আমাকে আক্রমণ করছে কেন?

সকালবেলা শরীরটা পাওয়া গেল, আর দেখা গেল, যে খাঁচার মধ্যে বিষাক্ত গোখরো সাপকে রাখা হয়েছিল, সেই খাঁচাটা ফাঁকা, সাপটার চিহ্ন কোথাও নেই।

লাল আলা জ্বলে উঠল, গোপনীয়, বিষয় অপারেশন ডুমসডে, দশ নম্বর লাসলো, কাজটা শেষ হয়ে গেছে।

.

জেনারেল হিলিয়াড় তার ফোনে একটা কল পেলেন, জেনাস, আমি শেষতম রিপোর্টটা কমান্ডার বেলামির কাছ থেকে পেয়েছি। শেষ সাক্ষ্যকেও পাওয়া গেছে। তার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

–আমি সকলকে খরব দিচ্ছি। এবার কাজটা শেষ করতে হবে। অবশ্যই। এখন একটুও সময় নষ্ট করা যাবে না।

.

৩৫.

পনেরো নম্বর দিন

রবার্ট বেলামি অবাক হয়ে গেছেন। এগারো নম্বর প্রত্যক্ষদর্শী সত্যি আছে কি? যদি বা থেকেও থাকে কেউ কেন তার কথা আগে বলেনি।

যে ক্লার্ক বাসের টিকিট বিক্রি করছিল, সে বলেছিল, মাত্র সাতজন যাত্রী ছিল। রবার্ট একথা বিশ্বাস করে, হাঙ্গেরীয় কার্নিভাল মালিকের কোনো ভুল হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা খুব খারাপ লাগছে। রবার্ট ভাবল, হানস বেকারম্যান, বাস ড্রাইভার নিশ্চয়ই ব্যাপারটা জানে।

সানসাইন ট্যুরিস্ট বাস কোম্পানিকে তিনি একটা ফোন করলেন। অফিসটা বন্ধ। এক মুহূর্তের জন্য রবার্ট ভাবলেন, আমি কি আবার সুইজারল্যান্ডে ফিরে যাব? এই ব্যাপারটার শেষ না দেখা অব্দি তিনি ছটফট করতে থাকবেন।

.

মধ্যরাত, রবার্ট জুরিখে এসে পৌঁছেছেন। বাতাস ঠাণ্ডা। পূর্ণিমার তিথি। রবার্ট একটা গাড়ি ভাড়া করলেন। কাপ্পেল গ্রামের দিকে এগিয়ে গেলেন। চার্চের পাশ দিয়ে গাড়ি ছুটে গেল। এই তো হানস বেকারম্যানের বাড়ি। না, এভাবে খোঁজাখুঁজি করে কোনো লাভ নেই। রবার্ট দরজায় শব্দ করলেন এবং অপেক্ষা করতে থাকলেন।

শীতের কনকনে বাতাস সব কিছু কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

শ্রীমতী বেকারম্যান শেষ পর্যন্ত জবাব দিলেন।

মিসেস বেকারম্যান, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন? আমি আপনার কাছে এসেছিলাম। হানস সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লেখার জন্য। আমি কি আপনার স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে পারি?

নীরবতা ভেঙে গেল। একটা শব্দ ভেসে এল হানস মারা গেছে।

কী বলছেন?

–আমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। তার গাড়িটা পাহাড়ের ধারে চলে গিয়েছিল। কণ্ঠস্বরে তিক্তুতা। পুলিশ বলছে, সে নাকি প্রচুর মদ খেয়েছিল।

না-না, আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি না।

হানসের কথা মনে পড়ে গেল। হানসের পেটে আলসার ছিল। ডাক্তাররা তাকে কোনো কিছু খেতে বারণ করেছিল।

পুলিশ বলছে, এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট?

–হ্যাঁ।

তারা কি শব ব্যবচ্ছেদ করেছিল?

–হ্যাঁ, তারা পেটের ভেতর ড্রাগস পেয়েছে। আমি বুঝতে পারছি না।

–আমি অত্যন্ত দুঃখিত, শ্রীমতী বেকারম্যান।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। রবার্ট দাঁড়িয়ে থাকলেন। শীতের রাতে একা।

তার মানে? একজন প্রত্যক্ষদর্শী চলে গেল। না-না, দুজন, লেসলি মাদারশেডেরও মৃত্যু হয়েছে দুর্ঘটনায়।

রবার্ট সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। দুজনের মৃত্যু হল! তাহলে? ব্যাপারটা কোন্ দিকে এগিয়ে যাচ্ছে?

সমস্যা? কেন? রবার্টের মনে নানা ভাবনার উতরোল। এটা কি নেহাত কাকতালীয় ব্যাপার? দেখা যাক, অন্য দিকে কী ঘটনা ঘটছে।

.

প্রথম ফোন করলেন ফোরথ স্ট্রিটে, কানাডাতে।

এক মহিলার কণ্ঠস্বর।

-কে বলছেন?

–উইলিয়াম মান আছেন?

–না, আমার স্বামী আমাদের মধ্যে আর নেই।

–আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

–উনি আত্মহত্যা করেছেন।

–সে কী? ওই ভদ্রলোক আত্মহত্যা করেছেন? কী হচ্ছে?

তিনি একটির পর একটি ফোন করতে থাকলেন।

-প্রফেসার স্মিডটকে একবার দেবেন?

–প্রফেসার মারা গেছেন। ল্যাবোরেটারিতে বিস্ফোরণ হয়েছিল।

.

-আমি কি ড্যান ওয়েনের সাথে কথা বলতে পারি?

–আঃ, তার পোষা ঘোড়াটা খেপে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ঘোড়র আঘাতে তার মৃত্যু হয়।

.

লাসলো আছেন?

কাংভিনাল বন্ধ হয়ে গেছে। আসলে মারা গেছে।

.

–ফিজস ম্যানডেল আছেন?

–ফিজসের মৃত্যু হয়েছে একটা অ্যাকসিডেন্টে।

সংকেত চিহ্ন বাজছে জোরে জোরে।

.

–ওলগা আছেন কি?

আহা, অল্প বয়সেই চলে গেল বেচারী।

.

-কেভিন পারকারের সঙ্গে কথা বলা যাবে?

–কেভিনকে হত্যা করা হয়েছে।

.

মৃত, প্রত্যক্ষদর্শীরা সবাই মৃত। তা হলে? আমি একমাত্র বেঁচে আছি। হঠাৎ একটা শীতল শিহরণ, কে এইসব খুনের অন্তরালে? রবার্টের মনে পড়ল, তিনি একমাত্র জেনারেল হিলিয়াডের কাছে এইসব খবর পাঠিয়ে ছিলেন। অর্থাৎ এই জঘন্য হত্যাকান্ডের পেছনে একটা চক্র কাজ করছে। কে হতে পারে?

আমাকে ভাড়া করা হয়েছিল প্রত্যক্ষদর্শীদের খুঁজে বের করার জন্য। কিন্তু? অটোর মৃত্যু হয়েছে জার্মানিতে, হানস এবং ফিজ মারা গেছেন সুইজারল্যান্ডে। ওলগা রাশিয়াতে। ড্যান ওয়েনে এবং কেভিন পারকার আমেরিকাতে। উইলিয়াম মান কানাডাতে। লেসলি ইংল্যান্ডে। ফাদার প্যাটরিনি ইতালিতে। লাসলো হাঙ্গেরীতে। তার মানে ছটার বেশি দেশ এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। আলোচনা হচ্ছে, যে উড়ন চাকি দেখবে, তার মৃত্য অনিবার্য। কিন্তু কেন?

এটা একটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছাতে রবার্ট তার অংশীদার হয়ে গেছেন।

.

রবার্ট এখন ভাবছেন, এবার আমার মৃত্যুর পালা। হ্যাঁ, আমার হাতে সমস্ত তথ্য প্রমাণ আছে। আমি এখন আর কোনো সুযোগ নেব না। কোথায় যাওয়া যায়। একটা পাশপোর্ট জোগাড় করতে হবে।

রবার্ট পরবর্তী প্লেনটা ধরলেন। পালাতে হবে, এক্ষুনি পালাতে হবে। গত পনেরো দিন ধরে তার ওপর ভীষণ চাপ গেছে।

তিনি ভিঞ্চি এয়ারপোর্টে নামলেন। লিওনার্দোর নামে নামাঙ্কিত। টারমিনালের দিকে হেঁটে গেলেন। সুশান, আহা! এ কী?

সুশান?

সূচিপত্র

সুসানের চোখে বিস্ময়- রবার্ট? কী আশ্বর্য সমাপতন বলেতো?

–আমি ভেবেছিলাম, তোমরা জিব্রাল্টার চলে গেছে।

-হ্যাঁ, আমরা সেখানেই ছিলাম, মন্টের কিছু ব্যবসা আছে এখানে। আমরা আজই চলে যাব। তুমি রোমে কী করছ?

–আমি একটা কাজ শেষ করছি।

রবার্ট মনে মনে ভাবলেন, এটাই আমার শেষ কাজ। আমি ছেড়ে দেব ডার্লিং, আর কোনো কিছুই আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনতে পারবে না। মন্টেকে ছেড়ে দাও, আমার কাছে ফিরে এসো।

মনের এই ভাবনাগুলো কথায় বলতে পারলেন না। সুশানকে দেখে মনে হচ্ছে, নতুন জীবনে সে পরিতৃপ্ত।

আমাকে এখন একাই থাকতে হবে।

-তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে?

–হা, কদিন ধরে খুব পরিশ্রম হয়েছে।

তারা পরস্পরকে দেখলেন। হ্যাঁ, আকর্ষণ এখনও আছে। সেই অগ্নি উত্তেজনা, সেই হাসির উতরোল, কাছে আসার তীব্রতম আকাঙ্খ।

সুশান হাতে হাত রাখলেন রবার্ট! রবার্ট!

সুশান!

সেই সময় এক ভদ্রলোক সামনে এসে দাঁড়ালেন। ড্রাইভারের পোশাক পরা। সে বলল মিসেস বাঙ্কস, গাড়ি তৈরি আছে।

আহা, স্বপ্নটা ভেঙে গেল।

রবার্টের দিকে তাকিয়ে সুশান বললেন- আমি দুঃখিত, আমাকে এখন চলে যেতে হবে। শরীরের যত্ন নিও কেমন?

রবার্ট বললেন- হ্যাঁ, তুমি চিন্তা করো না।

জীবন কোথায় চলে গেছে, সবকিছু হারিয়ে গেছে। সমাপতন, শুধুই সমাপতন।

ট্যাক্সি নিয়ে রবার্ট চলেছেন হ্যাঁসলার হোটেলের দিকে।

.

কমান্ডার ফিরে এলেন?

হা, রাত দশটা বেজেছে। এবার রবার্ট ওপরে যাবেন। ঘুমোতে হবে। কিন্তু পাশপোর্টের ব্যবস্থা করতে হবে।

রবার্ট বললেন আমি এখন আমার ঘরে যাব না। ব্যাগগুলো ওপরে পাঠিয়ে দেবেন?

রবার্ট বেরোতে যাচ্ছেন, এলিভেটর খুলে গেল, হৈ-হৈ করতে করতে কিছু মানুষ বেরিয়ে এসেছে। একজন রবার্টের দিকে হাত তুলে তাকাল।

রবার্ট লবি দিয়ে হেঁটে গেলেন। ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে। ট্যাক্সিতে উঠতে যাবেন, দেখলেন একটা ধূসর রঙের ওভাল গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কেন? গাড়িটাকে দেখে তাঁর সন্দেহ হল।

রবার্ট ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললেন- মনটিগ্রাঙ্গায় যেতে হবে।

কাঁচ দিয়ে তাকিয়ে থাকলেন, সে কি? ওভাল গাড়িটা কোথায় গেল?

রবার্ট ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেলেন। আবার ওই গাড়িটাকে দেখা গেল। তার মানে? কেউঁকি আমাকে অনুসরণ করছে? ধীরে ধীরে তিনি গাড়িটার সামনে চলে গেলেন। দেখতে পেলেন, গাড়িটা আরও কাছে এগিয়ে আসছে। হ্যাঁ, এবার তিনি নিশ্চিত, গাড়িটা তাকেই অনুসরণ করছে!

গাড়িটা পুরোনো, অনাকর্ষক। রবার্ট এখানে অনেক বার এসেছেন। বিভিন্ন কাজে। তিনি বেসমেন্টে চলে গেলেন। দরজায় শব্দ করলেন।

রবার্ট? একজন চিৎকার করলেন। তুমি কেমন আছো?

বছর ষাট বয়স, সাদা চুল, ভুরু দুটো মোটা, দাঁতে হলুদ ছোপ। দরজা বন্ধ করলেন।

-আমি ভালো আছি রিক্কো।

রিক্কোর কোনো আলাদা নাম নেই। তিনি বললেন- বন্ধু, আমি তোমার জন্য কী করব?

-আমাকে একটা পাশপোর্ট করে দেবে?

খুব তাড়াতাড়ি চাই?

তিনি এগিয়ে গেলেন, বললেন কোন দেশ থেকে আসতে চাইছ? বেশ কয়েকটা পাশপোর্ট রয়েছে তার হেপাজতে। তিনি বললেন- গ্রিস, তুরস্ক, যুগোশ্লোভিয়া নাকি ইংল্যান্ড?

আমেরিকা হবে?

রিক্কো নীল খামের ভেতর পাশপোর্ট পুরে দিলেন- হ্যাঁ, আর্থার বাটারফিল্ড, নামটা কেমন হয়েছে। আমি তোমার ছবি নেব।

রবার্ট দেওয়ালের ধারে চলে গেলেন। রিক্কো একটা ড্রয়ার খুললেন। বোলারের ক্যামেরা বের করলেন। এক মিনিট কেটে গেছে। ছবিটা হয়ে গেছে।

রবার্ট প্রশ্ন করলেন– আমি কি হাসছি?

না, আমার মুখে হাসি নেই কেন?

রিক্কো তাকিয়ে বললেন- আর কিছু বলবে?

আবার মুখে হাসি ছবিটা নেওয়া হল।

রিক্কো বললেন- এখন কাজটা খুবই ঝামেলার হয়েছে।

এবার ল্যামিনেশন করতে হবে। রবার্ট একটা টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন। সব ব্যবস্থা এখানে রয়েছে।

রিক্কো বললেন- বাঃ, সুন্দর হয়েছে। রবার্টের হাতে পাশপোর্টটা তুলে দিলেন। পাঁচ হাজার ডলার।

-হ্যাঁ, এটার দাম তুমি ঠিকই ধরেছ।

-তোমার মতো লোকের সাথে ব্যবসা করতে খুবই ভালো লাগে। রবার্ট মনে মনে আনন্দিত। হা, রিক্কোর হাতের কাজ দেখার মতো। জনা ছয়েক সরকারী নথিপত্র তুলে নিতে পারে। কারও প্রতি তার আনুগত্য নেই। রবার্ট পাশপোর্টটা পকেটে রাখলেন।

রিক্কো হাসলেন মি. বাটারফিল্ড, ধন্যবাদ।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। রিকো এবার টেলিফোন বুথের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। কাউকে একটা খবর দিতে হবে। এই খবরটা দিয়েও তিনি অনেক টাকা পাবেন।

কুড়ি গজ দূরে রবার্ট দাঁড়িয়ে আছেন। নতুন পাশপোর্টটা পকেট থেকে বের করলেন। আঃ, এবার আমি অন্য মানুষ হয়ে গেছি। আর্থার বাটারফিল্ড।

ধূসর রঙের ওভাল গাড়িটা কয়েকটা ব্লক দূরে দাঁড়িয়ে আছে। এখনও অপেক্ষা করছে।

রবার্টের মনে দৃঢ় ধারণা। এই গাড়িটা তাকেই অনুসরণ করছে। কিন্তু এখন? এখন কি গাড়িটা আর আসছে? কী করা যায়? রবার্ট কি আর হোটেলে ফিরে যাবেন?

না, কিছু বুঝতে পারছি না। গাড়িটাকে আর চোখের সামনে দেখা গেল না।

রাস্তায় অনেকগুলো ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। রবার্ট লাইসেন্স প্লেটগুলো দেখলেন। একটা ফরাসি নম্বর দেওয়া কার্ডটা পাওয়া গেল। হ্যাঁ, আমাকে কেউ দেখছে না। তিনি ট্যাক্সি ডাকলেন। লবিতে পৌঁছে গেলেন। বললেন- আজ রাতে প্যারিস যাওয়ার কোনো প্লেন আছে কি?

-হ্যাঁ, কমান্ডার, কোন এয়ারলাইন্সে আপনি যেতে চাইছেন?

–যে কোনো একটা হলেই হবে।

–আমি ব্যবস্থা করছি।

রবার্ট হোটেল ক্লার্কের কাছে এগিয়ে গেলেন। আমার চাবি? ৩১৪ নম্বর ঘর। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে আসব।

কমান্ডার বেলামি, ক্লার্ক বললেন, আপনার একটা চিঠি আছে।

রবার্টের শিরদাঁড়াতে শীতল উত্তেজনা। এনভেলাপটা বন্ধ করা। লেখা আছে, কমান্ডার রবার্ট বেলামি। মনে হল, ভেতরে বোধহয় একটা ধাতব পাত্র আছে। তিনি সাবধানে সেটা খুললেন। ইতালিয় রেস্টুরেন্টের বিজ্ঞাপন। আঃ, অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু নামটা ওপরে এল কী করে?

–কে এই চিঠিটা দিয়েছে বলতে পারবে কি?

না, খুব ব্যস্ত থাকি তো।

–এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। হয়তো এর ভেতর কোনো কিছু নেই।

রবার্ট ওপরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল। তিনি রবার্টের সঙ্গে যেচে বন্ধুত্ব করলেন।

তিনি বললেন, আমি আমেরিকাকে কেন ভালোবাসি বলুন তো? তারা জীবনটাকে ভোগ করতে জানে। আসুন, আমরা একসঙ্গে আনন্দ করে সময় কাটাই।

রবার্ট দরজাটা খুললেন। একদিকে চলে গেলেন। ঘরটা অন্ধকার, আলো জ্বাললেন। ঘরের ভেতর এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছে। কী আশ্চর্য? হাতে সাইলেনসার, এক্ষুনি একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটে যাবে।

একজন চিৎকার করল- এখানে কী হচ্ছে? কয়েকজন হৈ-হৈ করতে করতে এগিয়ে এসেছে।

ওই রোগা লোকটা রবার্টের দিকে এগিয়ে এল। সবাই মিলে ওকে ধরার চেষ্টা করছে। রবার্ট দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছেন।

নীচের লবিতে হৈ-হৈ শুরু হয়ে গেছে।

কমান্ডার বেলামি, আমি তো রিজার্ভেশন করে দিয়েছি। এয়ার ফ্রান্সের ফ্লাইট, প্যারিসে যাবে। রাত একটায় ছাড়বে।

রবার্ট বললেন– ধন্যবাদ।

রবার্ট দরজা থেকে বেরিয়ে এলেন। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

রবার্ট এসে বললেন– ভায়া মনটিগ্রাপ্পা।

হ্যাঁ, এখন আর উত্তর নেই। ওরা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছে। ওরা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমি কি বাঁচব?

রবার্ট ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললেন, রোমা টারমিনি। হ্যাঁ, সর্বত্র অনুসন্ধান শুরু হয়ে গেছে।

ট্যাক্সি এগিয়ে চলেছে। শেষ পর্যন্ত ড্রাইভার বলল- আমরা এসে গেছি।

এক মুহূর্ত দাঁড়াবেন কি? সবকিছু সাধারণ বলে মনে হচ্ছে। ট্যাক্সি আসছে। লিমুজিন গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে। কুলিরা কাজ করতে ব্যস্ত। পুলিশরা নিজেদের কাজ করছেন।

রবার্ট শেষ পর্যন্ত বললেন- আমি আর কোথাও যাব না। না, একটা জায়গায় যাওয়া বাকি আছে। ভেনেটো, ১১০, পৃথিবীর এই অঞ্চলে রবার্টকে একবার যেতেই হবে।

আমেরিকান এমব্যাসি ভায়া ভেনেটোতে অবস্থিত। সামনে লোহার গেট। পাহারাদার জিজ্ঞাসা করল– কী আপনাকে সাহায্য করব, স্যার।

–আমি একটা নতুন পাশপোর্ট পেতে চাইছি। আমারটা হারিয়ে গেছে।

–আপনি কি আমেরিকার বাসিন্দা?

–হ্যাঁ।

–ওইখানে চলে যান স্যার, শেষ দরজা।

–ঠিক আছে।

অনেকে সেই ঘরে বসে কাজ করছেন। অনেকের সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা হচ্ছে। বলা হল, আমি আলবানে যেতে পারি কি? একটা ভিসা দরকার। সেখানে আমার আত্মীয়রা আছেন।

কেউ বলছেন, আমার পাশপোর্ট আজ রাতের মধ্যে রিনিউ করতে হবে। একটা প্লেন ধরতে হবে।

কত রকম কথা। রবার্ট দাঁড়িয়ে থাকলেন। কথাগুলো শুনছেন। পুরোনো চোরাই পাশপোর্ট সহজেই পাওয়া যায়। নতুন পাশপোর্ট জোগাড় করাটাও খুব একটা শক্ত নয়।

–মি. কোয়ান, এই আপনার নতুন পাশপোর্ট। ইস, আপনার এত খারাপ অভিজ্ঞতা হল। রোমে পকেটমারদের থেকে সাবধান থাকবেন।

কোয়ান বলল, এবার আমাকে আরও সাবধান থাকতে হবে।

রবার্ট লক্ষ্য করলেন, কোয়ান পাশপোর্টটা তার জ্যাকেটের পকেটে রেখেছেন। সে যাবার জন্য তৈরি হল। রবার্ট তাকে অনুসরণ করল। একটা মেয়ে মধ্যিখানে এসে দাঁড়িয়েছে। রবার্ট কোয়ানের দিকে এগিয়ে গেলেন। আস্তে করে তাকে ধাক্কা দিলেন। ভদ্রলোক মাটিতে পড়ে গেল, আমি ক্ষমা চাইছি। জ্যাকেটটা ফাঁক হয়েছে।

কোয়ান বলল না, কোনো সমস্যা নেই।

রবার্ট ঘুরে দাঁড়ালেন। বাথরুমে চলে গেলেন। ওই মানুষটির পাশপোর্ট এখন তার পকেটে, হ্যাঁ, আমি এখন একা। বুথে দাঁড়িয়ে আছি। এবার কী করব? প্লেট নিয়ে এসেছি। আঠার বোতল রিক্কোর ঘর থেকে চুরি করে।

তিনি প্লাসটিকটা আস্তে আস্তে খুলে ফেললেন। কোয়ানের ছবিটাও সরিয়ে ফেলা হল। নিজের ছবিটা সেখানে মেরে দেওয়া হল। আঠা লাগিয়ে দিলেন। বাঃ, হাতের কাজটা চমৎকার হয়েছে। এখন আমি হেনরি কোয়ান। পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। ভায়া ভেনেটো দাঁড়িয়ে আছে। বললেন, আমি এয়ারপোর্টে যাব।

রাত বারোটা বেজে তিরিশ মিনিট, রবার্ট এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেছেন। কোনো কিছু চোখে পড়ছে কি? না, সবই সাধারণভাবে এগিয়ে চলেছে। রবার্ট টারমিনালে ঢুকলেন। অনেক এয়ারলাইন্সের ব্যস্ততা।

এয়ার ফ্রান্সের কাউন্টার দেখা গেল।–শুভ সন্ধ্যা।

-শুভ সন্ধ্যা, আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি, সিনর?

হা, রবার্ট বললেন, আপনি কমান্ডার রবার্ট বেলামিকে একটা ফোন করতে দেবেন কি?

-হ্যাঁ।

মাইক্রোফোন নেওয়া হল। কয়েক ফুট দূরে এক মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা স্যুটকেসের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এয়ারলাইন্সের এক ভদ্রলোকের সাথে তার কথা কাটাকাটি হচ্ছে।

তিনি বলছেন আমেরিকাতে আমরা বেশি ওজনের জন্য পয়সা দিই না।

–আমি দুঃখিত, ম্যাডাম। আপনাকে বেশি টাকা দিতেই হবে।

রবার্ট কাছে এগিয়ে গেলেন। তিনি অ্যাটেনডেন্টের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন,লাউস্পিকারে গমগম করছে- কমান্ডার রবার্ট বেলামি, এই সাদা টেলিফোনের সামনে চলে আসুন। কমান্ডার রবার্ট বেলামি, সাদা ফোনের সামনে চলে আসুন।

চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে খবরটা। একজন লোক ক্যারিব্যাগ নিয়ে এগিয়ে গেলেন।

রবার্ট বললেন– কী হয়েছে?

–আমার বউ আমাকে ডাকছে। কিন্তু আমি তো লাগেজ ছাড়তে পারছি না।

রবার্ট ওই ভদ্রমহিলার লাগেজের দিকে তাকালেন। লোকটির হাতে দশ ডলারের বিল দিলেন। বললেন, আপনি কি ওই সাদা টেলিফোনের কাছে গিয়ে একবার দাঁড়াবেন? ওনাকে বলবেন, আমি একঘণ্টা বাদে হোটেলে পৌঁছে যাচ্ছি। তা হলে খুবই ভালো হয়।

ভদ্রলোক দশ ডলার বিল পকেটে নিয়ে বললেন- হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি।

রবার্ট তাকিয়ে থাকলেন। তিনি রিসিভারটা নিয়ে বললেন- হ্যালো?

পরমুহূর্তে চারজন কালো পোশাক পরা মানুষ এসে গেছে। তারা মানুষটির দিকে তাকিয়ে আছে।

একজন বলল– এখনই কাজ শুরু করতে হবে। না, কমান্ডার, এখনই।

কমান্ডার! আপনারা ভুল লোককে পেয়েছেন। আমার নাম মেলভিন ডাভিচ। আমি ওমহা থেকে আসছি।

–অনেক খেলা হয়েছে। আর নয়।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন। যে মানুষটিকে আপনারা চাইছেন, সে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

না, রবার্টকে আর দেখতে পাওয়া গেল না।

টারমিনালের বাইরে এয়ারপোর্ট বাস রেডি হচ্ছে। রবার্ট সেই বাসে উঠে পড়লেন। অন্য প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে হারিয়ে গেলেন। তিনি ব্যাক সিটে বসে আছেন। পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন।

এখনই তাঁকে অ্যাডমিরাল হুইট্যাকারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। কীভাবে এবং কেন এইসব অসহায় মানুষদের হত্যা করা হল? কে এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের অন্তরালে আছেন? জেনারেল হিলিয়াড? ডাসটিন ফরনটন? নাকি ফরনটনের শ্বশুর উইলার্ড স্টোন? মানুষটির মধ্যে একটা রহস্য আছে। নাকি এডওয়ার্ড হ্যাঁন্ডারসন। এন এস-এর ডিরেক্টর? প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত এই ব্যাপারটা পৌঁছে গেছে কি?

এইসব প্রশ্নের উত্তর আমাকে পেতেই হবে।

বাস ইডেন হোটেলে পৌঁছে গেল। রবার্ট নামলেন। আমি এখন এই দেশ থেকে পালাব কি? কাকে আমি ভরসা করব? হা, কর্নেল ফ্রানসেসকো সিজার, ইতালিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের প্রধান। উনি আমাকে সাহায্য করবেন।

.

কর্নেল সিজার অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাজ করেন। নানা ব্যাপারে তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কমান্ডার রবার্ট বেলামি তার পূর্ব পরিচিত। এর আগে তিনি রবার্টের সঙ্গে কাজ করেছেন। সিজার শেষ মেসেজটার দিকে তাকালেন। শেষ হয়ে গেছে। সেক্রেটারি বলল, স্যার, কমান্ডার বেলামি আপনার সাথে কথা বলতে চাইছেন।

কর্নেল সিজার বললেন- বেলামি? আচ্ছা আমি কথা বলছি?

রবার্ট?

ফ্রানসেসকো, কী হয়েছে বলুন তো? অনেক খবর পাচ্ছি, আপনি পেয়েছেন কি?

হা, তোমার সাথে দেখা হলে ভালো হত। কিছু ব্যক্তিগত কথা আছে।

–আমি শুনলাম, আপনি চিনা সরকারের সঙ্গে একটা কাজ করেছেন?

না-না, ব্যাপারটা মিথ্যে।

–কেন বলুন তো?

–অনেক খবর পেয়েছি। রবার্ট, এ নিয়ে ঠাট্টা করো না।

ফ্রানসেসকো, দশজন অসহায় মানুষকে আমি মৃত্যুর মুখে ফেলে দিয়েছি। আমি হলাম এগারো নম্বর।

–তুমি কোথায় আছো?

–আমি রোমে আছি। আমি এই শহর থেকে বেরোতে পারছি না।

–আমি তোমাকে কীভাবে সাহায্য করব?

–আমাকে এমন একটা নিরাপদ আস্তানার সন্ধান দিন, যেখানে আমরা সাবধানে কথা বলতে পারব। পালাবার ষড়যন্ত্র করতে হবে। আপনি কি তার ব্যবস্থা করতে পারেন?

–তোমাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। খুব সাবধান। আমি তোমাকে ঠিক জায়গা থেকে তুলে নেব।

রবার্টের দীর্ঘশ্বাস, অনেক ধন্যবাদ ফ্রানসেসকো।

তুমি ঠিক কোথায় আছে বলো তো?

হোটেল রুয়েতে।

–আমি এখনই যাচ্ছি। এক ঘণ্টার মধ্যে।

ধন্যবাদ। রবার্ট রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। এক ঘণ্টা? অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

তিরিশ মিনিট কেটে গেছে, দুটো গাড়ি এসে থেমেছে লিভো বারের সামনে। চারজন মানুষ নেমে এসেছে। সকলের হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র আছে।

কর্নেল সিজার প্রথমে গাড়ি থেকে নামলেন। তাড়াতাড়ি কাজটা করতে হবে। যেন আর কেউ আঘাতপ্রাপ্ত না হয়।

এবার কাজ শুরু হবে।

রুফটপ থেকে রবার্ট সবকিছু দেখলেন। সিজার এবং তার লোকরা অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, বারে উত্তেজনা।

রবার্ট মুখে একটা বিশ্রী শব্দ উচ্চারণ করলেন।

.

১৬.

ষোলো নম্বর দিন, রোম, ইতালি।

রবার্ট কর্নেল সিজারকে ফোন করলেন রাস্তার বুথ থেকে। বললেন- কী হল? এমন কেন হল?

বন্ধু, আমাকে আদেশ করা হয়েছে। আমি বলতে পারি, তোমার আর বেঁচে থাকার অধিকার নেই। তুমি সব গোপন খবর জেনে ফেলেছ। পৃথিবীর অন্তত ছটা দেশের সরকার তোমার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

–আপনি কি মনে করেন যে, আমি একজন বিশ্বাসঘাতক?

সিজারের দীর্ঘশ্বাস আমি কী বিশ্বাস করি, তাতে কিছুই আসে যায় না, রবার্ট। এটা কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। আমাকে আদেশ করা হয়েছে।

–আমাকে হত্যা করার জন্য?

-হ্যাঁ, এটা আমাকে করতেই হবে।

অনেক ধন্যবাদ, যদি কখনও আপনার সাহায্য দরকার হয়, আমি আপনাকে ফোন করব।

রবার্ট বুঝতে পারছেন, বিপদটা এবার আকাশ ছুঁয়েছে। তার মানে? এখন কোথায় যাওয়া যায়? কিছুই করা যাচ্ছে না।

রবার্ট পিজার দিকে তাকালেন। এখন প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। তিনি ভাবলেন, জেনারেল হিলিয়াডের সঙ্গে কথা বললে কেমন হয়? ওই ভদ্রলোককেই তো রবার্ট তার দুঃস্বপ্নের জন্য দায়বদ্ধ করতে পারেন।

রবার্ট দেখলেন দুটো টেলিফোন পাশাপাশি আছে। একটা একেবারে ফাঁকা। জেনারেল হিলিয়াডের ব্যক্তিগত নাম্বারে ফোন করবেন কি? না, তিনি এন এস এর সুইচ বোর্ডে ফোন করলেন।

কিছুক্ষণ বাদে সেক্রেটারির কণ্ঠস্বর শোনা গেল জেনারেল হিলিয়াডের অফিস।

বলুন একটা সমুদ্রপারের কল আছে?

রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন।

পরবর্তী বুথে চলে গেলেন। নাম্বারটা আবার ডায়াল করলেন। আর একজন সেক্রেটারির কণ্ঠস্বর।

–জেনারেল হিলিয়াডের অফিস।

–একটা ওভারসিজ কল আছে।

রিসিভারটা ঝুলিয়ে রাখলেন। তিন নম্বর বুথে গিয়ে ডায়াল করলেন।

আর একজন সেক্রেটারির কণ্ঠস্বর। রবার্ট বললেন- আমি কমান্ডার বেলামি বলছি। জেনারেল হিলিয়াডের সঙ্গে কথা বলব।

এক মুহূর্ত– কমান্ডার, সেক্রেটারি ইন্টারকম বাজিয়ে দিলেন। জেনারেল কমান্ডার বেলামি লাইনে কথা বলছেন।

জেনারেল হিলিয়াড হ্যারিসন কেলারের দিকে তাকালেন। বেলামি কথা বলতে চাইছেন, আমি এক্ষুনি আসছি।

হ্যারিসন কেলার নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টারে ফোন করলেন। এই সেন্টার চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করে।

সিনিয়র অফিসার ফোন ধরেছেন।

–একটা কল এসেছে, কোথা থেকে এসেছে কী করে জানব? ..

দু মিনিটের মধ্যে জানতে পারব।

শুরু করে দিন। জেনারেল হিলিয়াডের অফিসে তিনটে লাইন আছে। আমি ঝুলিয়ে। রাখছি।

জেনারেল হিলিয়াড ফোন নিলেন– কমান্ডার।

-কে বলছেন?

অপারেশন সেন্টার। অ্যাডামস একটা নাম্বার ঢুকিয়ে দিলেন কম্পিউটারের মধ্যে। এবার কাজ করতে শুরু করবে।

কমিউনিকেশন রুম ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

কেলার জিজ্ঞাসা করলেন কী ঘটছে? সব কিছু ঠিক মতো হচ্ছে তো?

নিউজার্সির নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার কাজ করছে। একটুখানি ধরুন।

পর্দাটা একেবারে ফাঁকা। তারপর ওভারসিজ ট্রাঙ্কলাইন ওয়ান দেখা গেল।

–ইওরোপের কোনো একজায়গা থেকে এই কলটা এসেছে। আমরা দেশটাকে এক্ষুনি ধরে ফেলব।

জেনারেল হিলিয়াড বললেন– কমান্ডার বেলামি, আমার মনে হচ্ছে, কোথায় একটা ভুল হয়েছে।

রবার্ট রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন।

জেনারেল হিলিয়াড কেলারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন–আপনি কি পেয়েছেন?

হ্যারিসন কেলার জানতে চাইলেন কী হয়েছে বলুন তো?

-ওই মানুষটিকে খুঁজে বের করা দরকার।

রবার্ট আর একটা বুথে গেলেন। টেলিফোনটা নিলেন জেনারেল হিলিয়াডের সেক্রেটারি বললেন- কমান্ডার বেলামি দু নম্বর লাইনে ডাকছেন।

দুজন মানুষ পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

কমান্ডার?

–আমি কি একটা কথা বলব?

জেনারেল হিলিয়াড মাউথপিসে হাত রাখলেন। বললেন– তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি বার করতে হবে রবার্ট কোথায় আছেন।

হ্যারিসন কেলার টেলিফোন নিয়ে অ্যাডমাসকে বললেন- আবার ওকে পাওয়া গেছে, দু-নম্বর লাইনে। তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে।

-ঠিক আছে দেখছি।

-জেনারেল, আমার একটা অনুরোধ হল, আপনি পেছনে লাগা বন্ধ করুন। আশা করি বুঝতে পারছেন।

আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না, কোনো সমস্যা থাকলে আসুন আমরা সমাধান করি।

–আমি একাই পারব। না, আমার জীবনে কোনো সমস্যা নেই।

নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার আবার কাজ করতে শুরু করেছে।

অ্যাডামস শেষ পর্যন্ত বললেন- রোম থেকে কলটা এসেছে।

অঞ্চলটা কোথায় বলতে হবে। কেলার বললেন।

–রোমে, রবার্ট তার ঘড়ির দিকে তাকালেন। আপনি আমাকে একটা কাজ দিয়েছিলেন, কাজটা আমি করেছি।

-হ্যাঁ, কমান্ডার, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

লাইনটা কেটে দেওয়া হল।

জেনারেল কেলারের দিকে তাকিয়ে বললেন- উনি আবার রেখে দিয়েছেন।

কেলার জানতে চাইলেন পাওয়া গেল?

এক্ষুনি বের করছি?

রবার্ট তিন নম্বর বুথে গেলেন, ফোন তুললেন। আবার কমান্ডার বেলামির সঙ্গে কথা বলা হল।

-জেনারেল, আপনি অনেক সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছেন। যদি এখনও এই কাজ বন্ধ না করেন, তাহলে আমি গণমাধ্যমের সামনে সব কিছু বলে দেব।

আমি আপনাকে শেষবারের মতো বলছি, একাজ করবেন না। আপনি কি বিশ্বজোড়া সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চাইছেন? ওই বিদেশী শত্রুরা সত্যি। আমরা তাদের সঙ্গে লড়াই করব কেমন করে? তারা এক্ষুনি আক্রমণ করতে শুরু করবে। এই সংবাদটা প্রকাশিত হলে কী ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে যাবে আপনি বুঝতে পারছেন কি?

না, আমি আপনাকে কোনো সুযোগ দেব না। আমার পেছনে লাগবেন না, কথা দিন। যদি আমার জীবনের ওপর আর একবারের জন্যও আক্রমণ করা হয়, আমি কিন্তু জনসমক্ষে সব কথা বলব।

জেনারেল হিলিয়াড বললেন- ঠিক আছে। আমি আমার ছেলেদের বলে দিচ্ছি, কখন দেখা হবে?

–আগে দেখি ব্যাপারটা কোথায় দাঁড়ায়।

লাইনটা কেটে গেল।

.কেলার বললেন পাওয়া গেছে?

অ্যাডামস বললেন- বন্ধ হয়ে গেছে, সেন্ট্রাল রোমের কোনো অঞ্চল থেকে উনি ফোন করেছিলেন। উনি বারবার নম্বর পরিবর্তন করছেন।

সূচিপত্র

জেনারেল তাকালেন কেলারের দিকে কী খবর?

–জেনারেল, উনি রোমের কোথাও আছেন। কিন্তু ঠিক জায়গাটা ধরতে পারছি না।

–ঠিক আছে, ব্যাপারটা এখন বাদ দিন।

.

রবার্ট আবার ভাবনা চিন্তার জগতে প্রবেশ করছেন। কীভাবে এখান থেকে উনি চলে যাবেন? বুঝতে পারা যাচ্ছে না। একটা ট্যাক্সি কর্নারে এসে দাঁড়িয়েছে। রবার্ট ট্যাক্সিকে ডাকলেন মুখে শব্দ করে। ড্রাইভার অবাক চোখে তাকিয়ে আছে।

রবার্ট ড্রাইভারের হাতে কুড়ি ডলারের নোট তুলে দিলেন। বললেন, বন্ধু, আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে?

ড্রাইভারের চোখ ছোটো।

একটা ভালো মাল চাই কিন্তু?

–হ্যাঁ, ভালো মেয়েছেলে, যে আপনাকে আরাম দিতে পারবে।

রবার্ট গাড়িতে উঠে বসলেন। গাড়িটা চলে গেল বেশ্যাপাড়াতে।

কুড়ি মিনিট কেটে গেছে। বিখ্যাত এবং কুখ্যাত অঞ্চল।

–এখানে সুন্দরী মেয়েদের দেখা পাবেন।

মুখে দুষ্ট হাসি হেসে ড্রাইবার বলল।

–অনেক ধন্যবাদ, রবার্ট ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। চারপাশে তাকালেন। না, এখানে কোনো পুলিশ নেই। কয়েকটা গাড়ি আর অনেক মানুষ পায়ে হেঁটে চলেছে। বেশ্যাগুলি হি-হি করে হাসছে। কেউ হাত তুলে অসভ্যতা করছে। আহা, এই হল শহরের সবথেকে বিখ্যাত লাল আলোর দেশ। কোথায় যাওয়া যায়?

একটা মেয়েকে দেখা গেল, মোটামুটি ভালো দেখতে। পোশাক পরিচ্ছদ ভালো পরেছে।

বছর কুড়ি বয়স হবে তার। লম্বা কালো চুল আছে। কালো স্কার্ট পরেছে, সাদা রাউজ। ওপরে একটা কোট চাপিয়েছে। রবার্টের মনে হল, এ বোধহয় অভিনেত্রী কিংবা মডেল। সেও রবার্টকে দেখছিল।

রবার্ট বলল- হাই বেবি, তুমি কি ইংরাজি জানো?

মেয়েটির মুখে হাসি হ্যাঁ, আমি জানি। চলো কোথায় যাবে? ইতালিয় টান আছে। একশো ডলার এক্ষুনি লাগবে কিন্তু।

না না, কোনো সমস্যা নেই।

মেয়েটি আবার বলল- কাছাকাছি একটা হোটেল আছে।

-তোমার নাম কী?

-পিয়েরে।

আমার নাম হেনরি।

একটা পুলিশের গাড়ি দূরে দাঁড়িয়ে ছিল।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি বলল- চলল, এখান থেকে চলে যাই।

অন্য মেয়েরা ঈর্ষার চোখে পিয়েরের দিকে তাকিয়ে আছে। আহা, কেমন একটা আমেরিকান খদ্দের পাকড়েছে।

হোটেলটা ফাঁকা, আলো আঁধারের খেলা। যে ছেলেটা কাউন্টারে বসেছিল, সে পাশপোর্ট দেখতে চাইল না। সে পিয়েরের হাতে চাবি তুলে দিল। বলল– পঞ্চাশ হাজার লিরা।

পিয়েরে রবার্টের কোমর জড়িয়ে ধরেছে। রবার্ট পকেট থেকে টাকাটা বের করলেন। ছেলেটির হাতে তুলে দিলেন।

বিরাট একটা খাট আছে এককোণে, ছোটো একটা টেবিল, দুটো কাঠের চেয়ার, একটা আয়না। বেসিনের ওপর।

দরজার পাশে জামাকাপড় রাখার একটা র‍্যাক আছে।

–আমাকে আগাম টাকা দেবে তো?

–হা, রবার্ট একশো ডলার গুনে হাতে তুলে দিলেন।

পিয়েরে ল্যাংটো হতে শুরু করছে। রবার্ট জানলার দিকে হেঁটে গেলেন। পর্দাটা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। সবই স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। ভেবেছিলেন, পুলিশ অথবা অন্য কেউ এখনই এসে পড়বে। পর্দা ফেলে দিলেন। পিয়েরে একেবারে উলঙ্গ। আহা, ভারী সুন্দর শরীর তার। দুটি উদ্ধত স্তন, এতটুকু অবনত হয়নি। গোল নিতম্ব, সরু কোমর, লম্বা পা।

মেয়েটি অবাক চোখে রবার্টকে দেখছিল। তুমি কখন সবকিছু খুলবে, হেনরি?

-সত্যি কথা বলতে কী, আমার মনে হচ্ছে, অনেকটা মদ খেয়েছি। একটুবাদে আমার খেলা শুরু করব।

মেয়েটির চোখে রাগ- তাহলে আমাকে ভাড়া করলে কেন?

–তোমার পাশে সারারাত শুয়ে থাকব। জড়াজড়ি করে। কাল সকালে তোমায় ভালোবাসব।

মেয়েটি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল– আমাকে কাজ করতে হবে। খাটতে হবে। আরও টাকা আয় করতে হবে।

–ভেবো না, আমি তার ব্যবস্থা করছি।

পকেট থেকে আরও কয়েকটা একশো ডলারের নোট বের করে মেয়েটির হাতে রবার্ট তুলে দিলেন।

এতে হবে তো?

পিয়েরে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে টাকার দিকে। মনে মনে কী যেন গণনা করছে সে। আহা, বাইরে বড্ড ঠাণ্ডা। ব্যবসাটায় মন্দা দেখা দিয়েছে। এখানে একটা নিরাপত্তা, উষ্ণতা, খদ্দেরটার মধ্যে একটা রহস্য আছে। লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে না, ও মাতাল। ভালো পোশাক পরা, যথেষ্ট অর্থবান, তা হলে? ও একটা ভালো হোটেলে গেল না কেন? পিয়েরে ভাবল। ঠিক আছে, আমরা দুজন এখানেই শোবো তো।

পিয়েরে দেখল, রবার্ট আবার জানলার দিকে হেঁটে গেলেন, পর্দা তুলে বাইরের দিকে তাকালেন।

–তুমি কি কিছু দেখছ? কারোর জন্য অপেক্ষা?

–হোটেলের পেছনের কোনো দরজা আছে?

পিয়েরে এবার বুঝতে পারল, কোনো একটা সমস্যা আছে। হয়তো এই লোকটা একটা আততায়ী। খুনীও হতে পারে। প্রিয় বান্ধবীর মুখটা মনে পড়ে গেল। এরকম একটা

বাজে কাছে যুক্ত থাকায় তাকে হত্যা করা হয়েছে। তবে লোকটাকে দেখে তো খুনে বদমাইস বলে মনে হচ্ছে না।

মেয়েটি বলল- হা, দরজা আছে।

হঠাৎ একটা আর্তনাদের শব্দ, রবার্ট ফিরে তাকালেন।

একটা মেয়ের গলা- পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে, পাতলা দেওয়াল।

রবার্ট জানতে চাইলেন– কী হয়েছে?

পিয়েরে হাসছে ওরা মজা করছে। এটা আর কিছু নয়।

রবার্ট আরও কিছু শব্দ শুনতে পেলেন।

পিয়েরে ল্যাংটো হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলছে, তুমি কখন শুতে যাবে?

চলো, এখনই যাচ্ছি। রবার্ট বললেন।

জামাকাপড় খুলবে না?

না।

পিয়েরে বিছানার এককোণে চলে গেল। রবার্টের পাশে শুয়ে পড়ল। বলল- তুমি নাক ডাকো না তো?

-না, কাল সকালে কথা হবে কেমন?

ঘুমোনোর কোনো ইচ্ছে রবার্টের ছিল না। তিনি রাতের আকাশ এবং শহর দেখতে চাইছিলেন, কীভাবে হোটেল থেকে বেরিয়ে যাওয়া যেতে পারে? এই জাতীয় বাজে হোটেলে তিনি কখনও আসেন না। কিন্তু এখন এখানে শুয়ে থাকতেই হবে। এবার তিনি কোথায় যাবেন? বুঝতে পারা যাচ্ছে না। সুশানের উষ্ণ শরীরটার কথা মনে পড়ে গেল। স্বপ্নের মধ্যে রবার্ট ভাবলেন, সুশান বোধহয় তার জীবনে আবার ফিরে এসেছে।

.

৩৭.

সতেরো নম্বর দিন, রোম, ইতালি

সূর্যের আলো রবার্টকে জাগিয়ে দিল। রবার্ট উঠে বসলেন। পিয়েরের দিকে তাকালেন। স্মৃতি মনে পড়ে গেল। আঃ, পিয়েরে আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়াচ্ছে।

না, তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি কিন্তু নাক ডাকোনি।

রবার্ট ঘড়ির দিকে তাকালেন। সকাল নটা। মূল্যবান সময় হারিয়ে গেছে।

–তুমি কি এখনও আমায় ভালোবাসবে? এর জন্য কিন্তু টাকা আমি পেয়ে গেছি।

রবার্ট বললেন- ঠিক আছে।

পিয়েরে এই অবস্থায় সামনে এগিয়ে এল। একই রকম আছে সে, শরীরের কোথাও সুতোটি পর্যন্ত নেই।

সে এবার পোশাক পরতে শুরু করল। বলল- সুশান কে?

রবার্ট অবাক সুশান? কেন এই প্রশ্ন?

-তুমি ঘুমের ঘোরে সুশানের নাম বলছিলে।

রবার্টের মনে পড়ল, হ্যাঁ, ঘুমন্ত অবস্থায় সে সুশানের স্বপ্ন দেখছিল। এটা কি সৌভাগ্যের লক্ষণ?

রবার্ট বললেন- ও আমার বন্ধু। বলতে পারলেন না, ও আমার স্ত্রী। এখন হয়তো নতুন স্বামীকে নিয়ে বিরক্ত। আমার কাছে আবার ফিরে আসতে চাইছে। তবে আমি কি অতদিন বেঁচে থাকব?

রবার্ট জানলার কাছে হেঁটে গেলেন। পর্দা তুলে তাকালেন। রাস্তায় নোক চলাচল শুরু হয়েছে, দোকানপাট খুলে গেছে। না, বিপদের চিহ্ন কোথাও নেই।

এবার ভাবনাটাকে কাজে পরিণত করতে হবে। রবার্ট পিয়েরের দিকে তাকিয়ে বললেন– পিয়েরে আমার সাথে দেশভ্রমণে যাবে?

পিয়েরে অবাক হয়ে গেছে কোথায়?

–আমাকে ব্যবসার কাছে ভেনিস যেতে হবে। একলা যেতে ভালো লাগে না। তুমি কি যাবে?

–হ্যাঁ।

–আমি তোমাকে যথেষ্ট টাকা দেব। আমরা দুজনে ছুটি কাটাব।

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রবার্ট আবার বললেন- ওখানে একটা সুন্দর ছোট্ট হোটেল আছে। সিবরিয়ানি।

রবার্টের হঠাৎ মনে পড়ে গেল কয়েক বছর আগে তিনি আর সুশান ওই শহরের একটা হোটেলে ছিলেন। আবার সেখানে তাকে যেতে হচ্ছে। রোজ এক হাজার ডলার লাগবে কিন্তু। মেয়েটি মনে করিয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত পাঁচশো ডলারে রাজী হল সে। মনে মনে ভাবল, হ্যাঁ, এটা হলেই চলবে।

রবার্ট বললেন– ঠিক আছে, তিনি দু-হাজার ডলার মেয়েটির হাতে দিয়ে বললেন এটা দিয়ে কাজ শুরু হোক।

পিয়েরে চিন্তা করছে। তার কেবলই মনে হচ্ছে, কোনো একটা গোলমাল আছে। তবে ব্যাপারটা যখন শুরু হয়ে গেল, সে আর কী করে পিছিয়ে আসবে।

.

পিয়েরে ট্যাক্সির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তার হঠাৎ মনে হল, কেউ বা কারা নিশ্চয়ই এই লোকটাকে লক্ষ্য করছে। প্রাণভয়ে কাঁপছে এই লোকটা।

পিয়েরে বলল– আমি মত পরিবর্তন করেছি। তোমার সঙ্গে ভেনিসে যাব না।

রবার্টের মনে চিন্তা– কেন? তিনি জানতে চাইলেন।

উল্টোদিকে একটা জুয়েলারি দোকান। রবার্ট পিয়েরের হাতে হাত রেখে দোকানে ঢুকে পড়লেন। বললেন- এসো, তোমাকে একটা উপহার দিই।

কাউন্টারে বসে থাকা ছেলেটি বলল- কীভাবে আপনাকে সাহায্য করব, স্যার?

রবার্ট বললেন, এই মেয়েটির পক্ষে মানানসই কিছু দেখান তো?

পিয়েরের দিকে ফিরে তিনি বললেন- তুমি মরকত মনি পছন্দ করো।

-হ্যাঁ।

রবার্ট আবার ক্লার্ককে বললেন- মরকত মনির ব্রেসলেট আছে?

-হ্যাঁ, একটা সুন্দর ব্রেসলেট আছে, স্যার। এটাই আমাদের সবথেকে ভালো। পনেরো হাজার ডলার দাম।

রবার্ট পিয়েরের দিকে তাকিয়ে বললেন ভালো লাগছে?

পিয়েরের কথা বন্ধ হয়ে গেছে। সে মাথা নাড়ল।

রবার্ট বললেন- এটা আমি তোমাকে উপহার দেব।

রবার্ট ক্রেডিট কার্ডটা বের করলেন।

–এক মুহূর্ত, স্যার। ক্লার্ক কোথায় যেন হারিয়ে গেল। একটু বাদে ফিরে এল, এটা কি প্যাকেট করে দেব?

না, এটা আমার হাতে দিন। আমি বান্ধবীকে উপহার দেব।

মরকতের এমন সুন্দর একটা অলংকর, পিয়েরের কবজিতে বাধা হল। পিয়েরে আরও অবাক হয়ে গেছে।

রবার্ট বললেন- ভেনিসে তুমি যখন ঘুরে বেড়াবে, তোমাকে একটা উড়ন্ত জলপরী বলে মনে হবে।

পিয়েরের মুখে হাসি। নিজের এই সৌভাগ্য সে বিশ্বাস করতে পারছে না।

রাস্তায় বেরিয়ে পিয়েরে বলল– কীভাবে তোমাকে ধন্যবাদ দেব, বুঝতে পারছি না।

রবার্ট বললেন- আমি আশা করি, আমাদের বন্ধুত্ব অনেক দিনের হবে।

রবার্ট আরও জানতে চাইলেন- তোমার কি গাড়ি আছে?

-না, আমার একটা পুরোনো গাড়ি ছিল। কিন্তু সেটা চুরি হয়ে গেছে।

–তোমার কাছে কি ড্রাইভার লাইসেন্স আছে?

পিয়েরে অবাক– গাড়ি যখন নেই, ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে কী হবে?

–এসো, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

রবার্ট একটা ট্যাক্সি ডাকলেন, বললেন, ভায়াপোতে যাব।

পিয়েরে ট্যাক্সিতে উঠে বসল। রবার্টকে ভালোভাবে দেখল- লোকটা কেন আমার সাহচর্য প্রার্থনা করছে? এর অন্তরালে নিশ্চয়ই একটা রহস্য আছে।

রবার্ট ট্যাক্সিকে থামতে বললেন কার রেন্টাল এজেন্সির সামনে।

রবার্ট পিয়েরেকে বললেন– এসো, আমরা নেমে আসব। ড্রাইভারকে টাকা মিটিয়ে দিলেন।

ট্যাক্সিটা চোখের বাইরে চলে গেল।

পিয়েরের হাতে হাত রেখে রবার্ট বললেন- তুমি একটা গাড়ি ভাড়া করো। ফিয়াট কিংবা আলফা রোমিও নেবে, বলবে– চার-পাঁচদিনের জন্য লাগবে। এই টাকাটা হাতে রাখো। এটা আগাম বাবদ দেবে। তোমার নামে ভাড়া করবে। আমি উল্টোদিকের বারে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

দুজন ডিটেকটিভের চোখে সবকিছু পড়ল। তারা এক ড্রাইবারকে প্রশ্ন করছে। ফরাসি লাইসেন্স প্লেট লাগানো লাল ট্রাকের ড্রাইভার।

-না, স্যার। আমার কোনো ধারণা নেই। মনে হচ্ছে, এটা বোধহয় ভুল করে আমার গাড়িতে চলে এসেছে।

দুজন ডিটেকটিভ চোখ চাওয়া চাওয়ি করল। একজন বলল- আমি এক্ষুনি ফোন করছি।

.

ফ্রানসেসকো সিজার তার ডেস্কে বসেছিলেন। সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলেন। ব্যাপারটা এত সহজে সমাধান হবে কি? না, কমান্ডার বেলামিকে কম শক্তিশালী ভেবে কোনো লাভ নেই।

কর্নেল ফ্রাঙ্ক জনসন জেনারেল হিলিয়াডের অফিসে বসে আছেন।

ইওরোপের সব এজেন্টকে কাজে লাগানো হয়েছে। জেনারেল হিলিয়াড বললেন, এখনও অব্দি ভালো খবর যে ওই কমান্ডার আমাদের চোখের বাইরে যেতে পারেননি। বেলামি রোমে আছেন, কিছুক্ষণ আগে উনি এক বান্ধবীর জন্য পনেরো হাজার ডলার দিয়ে ব্রেসলেট কিনেছেন। উনি নজরবন্দি হয়ে গেছেন। কিছুতেই এই জাল থেকে বেরোতে পারবেন না। আমরা জানি পাশপোর্টে উনি যে জাল নামটা ব্যবহার করছেন, সেটা হল আর্থার বাটারফিল্ড।

কর্নেল জনসন মাথা ঝাঁকালেন, না, বেলামিকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। আপনি জানেন না ও কত চালাক। মনে হয়, অত সহজে ওকে ধরা যাবে না। আর একটা কথা, উনি কিন্তু এখন আমাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। কারণ ওনার হাতে চাবিকাঠি। গোলমাল হলে উনি সর্বসমক্ষে সবকিছু বলে দেবেন।

-হ্যাঁ, এটা একটা চিন্তা করার বিষয়। কী করা যায় বুঝতে পারছি না।

কর্নেল জনসন বললেন আমি কি রোমে যাব? আমি কি নিজের হাতে দায়িত্বটা নেব?

কর্নেল ফ্রাঙ্ক জনসন অফিসে ফিরে এলেন। ভয়ংকর একটা খেলায় তিনি কি অংশ নেবেন? না, এ বিষয়ে আর চিন্তা করার সময় নেই। যে করেই হোক কমান্ডার বেলামিকে খুঁজে বের করতে হবে।

.

৩৮.

ফোনটা বেজেই চলেছে। নিউইয়র্কে এখন সকাল ছটা বাজে। শেষ পর্যন্ত ছবারের পর অ্যাডমিরালের কণ্ঠস্বর শোনা গেল– হ্যালো?

–অ্যাডমিরাল, আমি।

রবার্ট? কী হয়েছে?

–কোনো কথা বলবেন না। আপনার ফোনের ওপর নজরদারি আছে। আমি খালি বলছি আপনাকে যে, এখনও আমি বেঁচে আছি। পরে হয়তো আপনার সাহায্য লাগতে পারে।

-রবার্ট, বলো, তোমার জন্য কী করব?

না, এখন কিছু করবেন না। পরে ডাকব আপনাকে।

রবার্ট রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। তিনি দেখলেন, একটা নীল রঙের ফিয়াট গাড়ি বারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পিয়েরে বসে আছে।

রবার্ট গাড়িতে উঠে বললেন- স্যার যাও। আমি ড্রাইভ করব।

পিয়েরে জায়গা করে দিল।

–আমরা কি ভেনিস যাচ্ছি? পিয়েরের জিজ্ঞাসা।

–না, আমরা কয়েকটা জায়গায় থামব।

রবার্ট রাস্তার দিকে এগিয়ে গেলেন। রোসিনি ট্রাভল সার্ভিস, রবার্ট বললেন– আমি একমিনিটের মধ্যে আসছি।

পিয়েরে দেখলেন, রবার্ট ট্রাভল এজেন্সির অফিসে ঢুকে পড়েছেন। পিয়েরে ভাবল, আমি এখন যদি গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যাই, তা হলে কী হবে? ও তো আমাকে আর কখনওই খুঁজে পাবে না। না, গাড়িটা আমার নামে ভাড়া করা হয়েছে। আমি একটা বোকার মতো কাজ করেছি।

রবার্ট রিসেপশনিস্ট মেয়েটিকে বললেন– আমি কমান্ডার রবার্ট বেলামি। আমাকে একটু সাহায্য করবেন? আমি কয়েকটা জায়গায় যাব। আগাম ব্যবস্থা করতে হবে।

–আপনি কোথায় যাবেন?

–বেজিং-এ যাব। ফার্স্ট ক্লাস এয়ারলাইন্স টিকিট লাগবে। একদিকের।

কবে উড়তে চাইছেন?

–এই শুক্রবার?

–ঠিক আছে। এয়ার চায়না ফ্লাইট। ৭-৪০ ছাড়বে। শুক্রবার রাতে।

বাঃ।

–আর কিছু?

আমি বুদাপেস্টের ট্রেন ধরব।

কবে?

সামনের সোমবার।

–কোন্ নামে?

–একই নামে।

রিসেপশনিস্ট মেয়েটি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। আপনি তো শুক্রবার বেজিং যাচ্ছেন।...

–আমি এখনও শেষ করিনি, ম্যাডাম। রবার্ট বললেন। মিয়ামি যাব, রোববার। ফ্লোরিডাতে...।

এবার মেয়েটি অবাক হয়ে গেছে। সিনর, এভাবে কি ভ্রমণ করা যায়?

রবার্ট তার ও এন আই কার্ডটা বের করলেন। বললেন– এই কার্ডে টিকিটের চার্জ বাদ দিয়ে দিন।

ভদ্রমহিলা অবাক– সে ব্যাক অফিসে চলে গেল। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এল। সবকটা টিকিটই হয়ে গেছে। আমরা সব ব্যবস্থা করেছি। আপনি কি সব একই নামে সংরক্ষণ করতে চাইছেন?

–হ্যাঁ, কমান্ডার রবার্ট বেলামি।

রবার্ট দেখতে পেলেন। মেয়েটি বেশ কয়েকটা বোম টিপল। তারপর টিকিটগুলো চলে এল।

–আলাদা আলাদা এনভেলাপে পুরে দিন, কেমন?

–টিকিটগুলো কোথায় পাঠাতে হবে?

–আমি এগুলো নিয়ে যাচ্ছি।

রবার্ট ক্রেডিট কার্ড স্লিপে সই করলেন। টিকিটগুলো পেয়ে গেলেন।

–আহা, ভ্রমণটা ভালো হোক, কেমন?

পিয়েরে প্রশ্ন করল, এবার আমরা যাব তো?

–আরও কয়েকটা জায়গায় আমাকে থামতে হবে।

পিয়েরে অবাক চোখে রবার্টের দিকে তাকিয়ে আছে।

-তুমি কি আমার জন্য একটা কাজ করবে?

রবার্টের এই কথা শুনে পিয়েরে বুঝতে পারল, এবার আমাকে ভয়ঙ্কর ঝামেলায় জড়িয়ে দেওয়া হবে।

পিয়েরে জানতে চাইল– কী করতে হবে?

হোটেল ভিকটোরিয়া, রবার্ট পিয়েরের হাতে এনভেলাপ দিয়ে বললেন, তুমি ডেস্কে চলে যাও। কমান্ডার রবার্ট বেলামির নামে একটা স্যুট ভাড়া করো। তুমি নিজেকে সেক্রেটারি বলে পরিচয় দেবে। তুমি বলবে যে, উনি এক ঘণ্টার মধ্যে আসছেন। তুমি স্যুইটটা দেখতে এসেছ। তুমি ভেতরে যাবে। ঘরের একটা টেবিলের ওপর এই খামখানা রেখে আসবে।

ব্যস, আর কিছু নয়?

না, আর কিছু নয়।

মেয়েটি চলে গেল কে এই কমান্ডার রবার্ট বেলামি? পিয়েরে হোটেলের লবি দিয়ে হাঁটছে। একটু ভয় পেয়েছে। যে পেশার সঙ্গে সে যুক্ত, সেখানে এমন অনেক কাজ তাকে করতে হয়। যে ক্লার্ক বসেছিল, সে বলল– সিরিয়া, কীভাবে আপনাকে সাহায্য করব?

–আমি কমান্ডার রবার্ট বেলামির সেক্রেটারি, তার জন্য একটা স্যুইট ভাড়া করতে হবে। এক ঘণ্টার মধ্যে উনি আসছেন।

-ঠিক আছে, একটা সুন্দর সুইট পাওয়া যাবে।

–আমি সেটা দেখতে পাব?

–হ্যাঁ, কেন নয়?

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ছুটে এলেন। পিয়েরে ওপরে উঠে গেল। ওই স্যুইটের লিভিং রুমটা ভারী সুন্দর। পিয়েরের দিকে তাকিয়ে অ্যাসিন্ট্যান্ট ম্যানেজার জানতে চাইলেন এটা কি চলবে?

পিয়েরের এ ব্যাপারে কোনো ধারণা নেই। সে বলল- হ্যাঁ, এটাই চলবে। সে তার পার্স থেকে এনভেলাপটা বের করে চুপিচুপি রেখে দিল। বলল- কমান্ডারের জন্য এটা রেখে গেলাম।

পিয়েরে আর একটু অবাক হয়েছে। সে খামটা খুলল। দেখল, বেজিং-এর একটা টিকিট আছে, রবার্ট বেলামির নামে। পিয়েরে টিকিটটা আবার এনভেলাপে রেখে দিল। নীচে নেমে এল।

নীল রঙের ফিয়াট গাড়িটা সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রবার্ট জানতে চাইলেন কোনো সমস্যা?

না।

–আরও দুজায়গায় আমাদের থামতে হবে। তারপর আমরা ভেনিসের দিকে যাত্রা করব।

এবার হোটেল ভালাডিয়ার। রবার্ট একইভাবে পিয়েরের হাতে একটা খাম তুলে দিলেন। একইভাবে বললেন– কমান্ডার রবার্ট বেলামির নামে ঘর বুক করতে হবে।

পিয়েরে কাজটা করে বেরিয়ে এল।

এবার শেষবারের মতো থামতে হবে হোটেলে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিতে।

রবার্ট একই কাজ করলেন।

মেয়েটি এখন সব জেনে গেছে।

এই স্যুইটটা ভারী সুন্দর। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার তাকে মস্ত বড়ো বেডরুমটা দেখালেন। মাঝে একটা সুন্দর বেড আছে।

পিয়েরে ভাবল, কী বাজে খরচ হচ্ছে। একদিন এখানে ঢুকতে পারলে আমার ভাগ্যের চাকাটা একেবারে খুলে যাবে। এবারেও সে এনভেলাপটা দেখল। হ্যাঁ, মিয়ামি ফ্লোরিডার একটা টিকিট আছে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পিয়েরেকে লিভিংরুমে নিয়ে গেল। আমাদের কালার টিভি আছে। সে টেলিভিশন সেটটা চালিয়ে দিল।

কী আশ্চর্য? রবার্টের ছবি ভেসে উঠেছে টেলিভিশনের পর্দায়। সঞ্চালিকা ঘোষণা করছে ইন্টারপোল মনে করে, উনি এখন রোমে আছেন। তাকে আন্তর্জাতিক ড্রাগ চোরাচালানকারীদের অন্যতম বলা হচ্ছে। সি এন–এর তরফ থেকে খবর পড়ছি।

পিয়েরে অবাক হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে কে তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে।

ম্যানেজার সেটটা বন্ধ করে দিল। বলল চলবে তো?

পিয়েরে বুঝতে পারল, তার সহযাত্রী আর কেউ নয়, স্মাগলার, এক ভয়ংকর স্মাগলার।

পিয়েরে রবার্টের পাশে এসে বসল। রবার্টকে এখন সে অন্য চোখে দেখছে।

.

হোটেল ভিকটোরিয়া, কালো স্যুটপরা একজন গেস্ট রেজিস্টাররা দেখল। সে ক্লার্কের দিকে তাকাল। বলল– কমান্ডার বেলামি কখন এসেছেন?

-উনি এখনও আসেননি, স্যার। ওনার সেক্রেটারি একটা স্যুইট বুক করেছেন। উনি এক ঘণ্টার মধ্যে আসবেন।

কালো পোশাক পরা লোকটি তার সহকর্মীদের দিকে তাকিয়ে বলল- এ হোটেলটার চারপাশ ঘিরে ফেলতে হবে। আমি ওপরতলায় বসে আছি। সে বলল ক্লার্ককে ওর স্যুইটটা আমার জন্য খুলে দিন।

তিন মিনিট কেটে গেছে। ক্লার্ক স্যুটের দরজা খুলে দিল। কালো স্যুট পরা লোকটি ভেতরে চলে গেল। তার হাতে বন্দুক। না, স্যুটটা একেবারে ফাঁকা, সে টেবিলের ওপর একটা এনভেলাপ দেখতে পেল। লেখা আছে কমান্ডার রবার্ট বেলামি। এনভেলাপটা সে খুলে ফেলল। একটু বাদে সে হেডকোয়ার্টারে ফোন করল।

ফ্রানসেসকো সিজার একটা সভায় ব্যস্ত ছিলেন। কর্নেল ফ্রাঙ্ক জনসন এসে গেছেন। দুঘন্টা আগে।

সিজার প্রশ্ন করলেন– বেলামি এখনও রোমে আছে, এ বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।

–সবকটা জায়গা দেখা হয়েছে?

ফোনটা বেজে উঠল আমি ভিকি বলছি কর্নেল, লোকটাকে পাওয়া গেছে। আমি তার হোটেল স্যুইটে বসে আছি। হোটেল ভিকটোরিয়াতে। সে বেজিং-এ যাবে। শুক্রবার।

সিজারের কণ্ঠে উত্তেজনা ভালো। ওখানেই থাকুন। আমরা এক্ষুনি আসছি।

রিসিভারটা নামিয়ে কর্নেল জনসনের দিকে তাকিয়ে বললেন- কর্নেল, শেষ পর্যন্ত ওনাকে পাওয়া গেছে। উনি হোটেল ভিকটোরিয়াতে থাকবেন। এয়ার লাইন্স টিকিট পাওয়া গেছে। শুক্রবার বেজিং যাবেন।

কর্নেল অবাক বেলামি নিজের নামে হোটেল বুক করেছে?

-হ্যাঁ।

–প্লেনের টিকিটটাও তার নামে?

–হ্যাঁ, কর্নেল জনসন বললেন- এ ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

–কেন?

বেলামি কখনওই নিজের নাম ব্যবহার করবেন না!

আবার টেলিফোন বাজছে। সিজার ফোনটা ধরলেন।

কর্নেল আমি মারিও বলছি। আমরা বেলামিকে পেয়েছি। হোটেল ভালাডিয়ারে এক্ষুনি আসবেন। সোমবার ট্রেন ধরে উনি বুদাপেস্ট যাবেন। আমরা এখন কী করব?

–কিছুই করতে হবে না। কর্নেল সিজার বললেন, কর্নেল জনসনের দিকে তাকিয়ে বললেন, একটা প্লেনের টিকিট পাওয়া গেছে। বেলামির নামে।

আবার টেলিফোন বাজল।

-আমি ব্রুনো বলছি। আমরা বেলামিকে পেয়েছি। তিনি হোটেল লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির ঘর বুক করেছেন, তিনি রোববার মিয়ামি যাবেন।

সিজার বললেন- এখনই ফিরে এসো। আঃ এই খেলাটার শেষ কোথায় হবে।

কর্নেল জনসন হেসে বললেন– বন্ধু, বৃথা সময় নষ্ট করে কী লাভ?

–তা হলে আমরা কী করব?

–ওই বেজন্মাটাকে ফাঁদে ফেলতে হবে।

.

ভায়া ক্যাসিয়ার দিকে গাড়ি ছুটে চলেছে। ভেনিসের উত্তর প্রান্তের একটি অঞ্চল। পুলিশ সমস্ত জায়গা ঘিরে রেখেছে। যে কোনো সময়ে ধরা পড়তে হতে পারে। বিশেষ করে পশ্চিম সীমান্তে কড়া নজর রাখা হয়েছে। ফ্রান্স এবং সুইজারল্যান্ডের দিকে। রবার্ট ভাবছেন, কী করে পালাবেন। অস্ট্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেলে কেমন হয়?

পিয়েরে বলল আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।

কী?

–ব্রেকফাস্ট খাইনি, লাঞ্চও খাইনি।

রবার্ট বললেন– হ্যাঁ, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমরা রেস্টুরেন্টে গিয়ে থামব।

পিয়েরে দেখছে, রবার্ট গাড়ি চালাচ্ছেন। পিয়েরে খুব অবাক হয়ে গেছে। না, এমন খদ্দেরের সন্ধান সে কখনও পায়নি।

– একটা ছোটো রেস্টুরেন্ট, অনেক লোকের ভিড়। একটা টেবিল ফাঁকা পেল, দরজার সামনে। ওয়েটার এসে মেনুকার্ড হাতে দিয়েছে।

রবার্ট পড়তে থাকলেন। তারপর বললেন- আমি এক্ষুনি আসছি তিনি পাবলিক টেলিফোন বুথের কাছে চলে গেলেন। একটা টাকা শটে ফেললেন। বললেন- জিব্রাল্টারের মেরিন অপারেটরের সাথে কথা বলতে হবে।

–কে জিব্রাল্টারে কথা বলছ? পিয়েরে ভাবল, এইভাবে লোকটা কি পালিয়ে যাবে?

–অপারেটর, আমেরিকান ইয়াচ হ্যালিকনের খবর কী? ধন্যবাদ।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেছে। অপারেটররা কথা বলছে।

সুশানের কণ্ঠস্বর।

সুশান?

রবার্ট, তুমি ভালো আছো?

–হ্যাঁ, ভালো আছি। আমি তোমায় কয়েকটা কথা বলতে চাই।

–আমি সব জেনে গেছি। রেডিও টেলিভিশনে তোমার মুখ দেখানো হচ্ছে। ইন্টারপোল কেন তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে?

–এটা একটা মস্ত বড়ো গল্প।

বলো, আমি শুনব।

–এটা রাজনৈতিক চক্রান্ত, সুশান। আমি এমন কিছু তথ্য হাতে পেয়েছি, সরকার যেটা চেপে ফেলার চেষ্টা করছে। তাই ইন্টারপোল আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

পিয়েরে সবকিছু শোনার চেষ্টা করল।

–আমি তোমাকে কী করে সাহায্য করব?

-না, তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে বড়ো সাধ জেগেছিল। যদি এই ঝামেলা থেকে মুক্তি পাই, তাহলে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

এমন কথা বলো না, সুশানের কণ্ঠস্বরে ভয়ার্ত আর্তনাদ– তুমি কেন সবকথা গুছিয়ে বলছ না? বলো তো তুমি এখন কোথায় আছো?

–ইতালিতে।

–ঠিক আছে, আমরা বেশি দূরে নেই। আমরা জিব্রাল্টারের কিনারায় পৌঁছে গেছি। তোমাকে কি তুলে নিয়ে যাব?

না, আমিই পারব।

–শোনো, এটাই বোধহয় তোমার মুক্তি পাবার একমাত্র উপায়।

সুশান, আমি এইভাবে ভাবছি না। তোমাদের সমস্যা দেখা দেবে।

মন্টে সালুনে প্রবেশ করলেন। এই সংলাপের অংশবিশেষ শুনলেন। বললেন- এসো, আমি কথা বলছি।

–একমুহূর্ত রবার্ট, মন্টে তোমার সাথে কথা বলতে চাইছে।

সুশান, আমি কথা বলতে চাইছি না।

মন্টের কণ্ঠস্বর ভেসে এল রবার্ট, আমি জানি, আপনি খুব সমস্যায় পড়েছেন।

–হ্যাঁ, তা ঠিক হয়তো।

–আমরা আপনাকে সাহায্য করতে চাইছি। আপনার জন্য একটা প্রমোদ তরণী দেব কি? বা আপনি সেখানে আসতে পারবেন? পুলিশ এইসব দিকে নজর দেবে না।

-ধন্যবাদ মন্টে, কিন্তু আমি এখন যে উত্তরটা দেব, সেটা হল, না।

-আপনি কিন্তু ভুল করছেন। এখানে আপনি নিরাপদে থাকবেন।

ও কেন আমাকে সাহায্য করতে চাইছে? ধন্যবাদ। আমি দেখছি কী করা যায়। সুশানের সাথে আবার কথা বলব কেমন?

মন্টে বাঙ্কস ফোনটা সুশানের হাতে দিলেন। বললেন– ও কথা বলতে চাইছে।

সুশান বলছেন এমন করো না রবার্ট। নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করো না।

সুশান, তুমি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছ। তুমি আমার জীবনের সেরা মুহূর্তগুলো কেড়ে নিয়েছ। আমি সব সময় তোমাকেই ভালোবাসব। আমি সবসময় তোমার সাথেই থাকব।

তার মানে কী?

–হ্যাঁ, বেঁচে থাকলে আমি আবার তোমাকে ভালোবাসা জানাব।

রবার্ট রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। এই কথাগুলো বলা কি ঠিক হল? তিনি টেবিলের দিকে চলে গেলেন। খাওয়া যাক।

–আমি তোমার কথা শুনেছি। পুলিশ তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে, তাই না?

রবার্টের চোখে-মুখে আতঙ্ক। হ্যাঁ, একটা ভুল হয়ে গেছে।

–আমাকে বোকা ভেবো না। আমি তোমায় সাহায্য করতে চাই।

–কীভাবে?

পিয়েরে ঝুঁকে বসল।তুমি আমাকে ভারী সুন্দর একটা জিনিস দিয়েছ। আমি পুলিশকে ঘেন্না করি। তুমি জানো পুলিশ আমাদের ওপর কী ধরনের অত্যাচার করে। তারা আমাদের ধরে নিয়ে যায়। তারা ধর্ষণ করে। তারা কুকুরের জাত। আমি কিছুতেই তাদের কাছে তোমার নাম বলব না।

–পিয়েরে, এমন করছ কেন?

ভেনিসে পুলিশ তোমায় ধরে ফেলবে। তুমি হোটেলে থাকলেও তোমায় ধরে ফেলবে। জাহাজে থাকলেও তুমি বাঁচতে পারবে না। কিন্তু আমি তোমাকে একটা সুন্দর জায়গা দেব। আমার মা আর ভাই নেপলসে থাকে। আমরা যেখানে থাকতে পারব। পুলিশ কখনও সেখানে যাবে না।

রবার্ট ব্যাপারটা ভেবে দেখলেন- হ্যাঁ, এই প্রস্তাবটা তো মন্দ নয়। একটা ব্যক্তিগত বাড়ি। সেখানে থাকলে কোনো সমস্যা হবে না। নেপলস একটা মস্ত বড়ো বন্দর। একটুখানি ভেবে রবার্ট বললেন– পিয়েরে, যদি পুলিশ আমার সন্ধান পায়, তারা কিন্তু আমায় মেরে ফেলবে। তোমাদেরও অনেক অত্যাচারের সামনে দাঁড়াতে হবে। তোমরা কেন এই ঝামেলা নেবে?

–না, পিয়েরে হাসল, পুলিশ কখনও তোমাকে খুঁজে পাবে না।

রবার্ট হাসি ফিরিয়ে দিলেন। বললেন- ঠিক আছে, খাওয়াটা সেরে নাও। আমরা নেপলসেই যাব।

.

কর্নেল ফ্রাঙ্ক জনসন বললেন–কোথায় উনি যেতে পারেন, সে বিষয়ে কোনো ধারণা আছে?

ফ্রানসেসকো সিজার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন– না, কিছুই বুঝতে পারছি না।

প্রাক্তন স্ত্রী সম্পর্কে খবর নিতে হবে?

না, খবর নিয়ে কোনো লাভ নেই।

কর্নেল জনসন জবাব দিলেন ওই মেয়েটি এখন মন্টে বাঙ্কসকে বিয়ে করেছে। না, আবার সব কিছু নতুন করে শুরু করতে হবে।

.

৩৯.

প্রশস্ত বুলেভাদর দিয়ে মেয়েটি নেমে আসছে। কতদিন তাকে এই অবস্থার মধ্যে থাকতে হয়েছিল। না, এই জীবনটা তার মোটেই ভালো লাগছে না। জল দরকার, জল ছাড়া সে বাঁচবে না। পৃথিবীর দূষিত জল নয়, পরিষ্কার পবিত্র বৃষ্টির জল। কোথায় পাওয়া যায়?

www.bengaliebook.com

তার সঙ্গে এক মানুষের দেখা হয়ে গেল।

আমেরিকান ফোর্সম্যান তার দিকে তাকিয়ে বলল- আপনি কে? আপনি কি পুতুল নাকি?

–আমাকে তাই কি মনে হচ্ছে?

–আপনি কোথা থেকে এসেছেন?

–সাত নম্বর সূর্য থেকে।

বাঃ, আপনার মধ্যে তো কৌতুকবোধ আছে। আপনি কোথায় যাবেন?

–আমি কিছুই জানি না। এখানে আমি এক আগন্তুক।

ডিনার হয়েছে?

–আমি তোমাদের খাবার খেতে পারি না।

আপনি কোথায় আছেন?

–আমি কোথায় থাকি না।

–কোনো হোটেলে?

–হোটেল? না, ঘুমোবার একটা জায়গা চাই। আমি খুবই ক্লান্ত।

ফোর্সম্যানের চওড়া হাসি। চলুন, বাবার কাছে চলুন, কিংবা আমার হোটেল ঘরে। আমার একটা সুন্দর শয্যা আছে। আপনার তা পছন্দ হবে।

–হ্যাঁ, চলো।

ছেলেটি তার ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল। অসাধারণ।

মেয়েটি ছেলেটির দিকে তাকাল। বলল- তোমার শয্যা কী দিয়ে তৈরি? খড় দিয়ে কি?

ছেলেটি অবাক না-না, আপনি কি এখনও মজা করবেন।

মেয়েটির চোখ বড়ো বড়ো– এখনই কি আমরা ঘুমোতে পারব?

হ্যাঁ, এই তো কাছেই আমার হোটেলটা।

ছেলেটি চাবি নিয়ে এলিভেটরে উঠল। বলল- একটু ড্রিঙ্ক করবেন?

পুতুল পুতুল মেয়েটি বলছে না, পৃথিবীর কোনো তরল পদার্থ আমি গ্রহণ করতে পারব না। বিছানাটা কোথায়? আঃ, একটা ছোটোখাটো যৌন আবেদনি বালিকা এসো, এসো, এখানে ওটা আছে প্রিয়া। ছেলেটির বুঝি আর তর সইছে না। সে চট করে বেডরুমে ঢুকে গেল।

সে বলল তুমি মদ খাবে না কেন?

ভালো লাগছে না।

ছেলেটি জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। আঃ, তুমি পোশাক খুলবে কখন?

মেয়েটি মাথা নাড়ছে। সে পোশাকটা খুলে ফেলল। ভেতরে কিছুই পরেনি। শরীরটা ভারি সুন্দর।

ছেলেটি অবাক চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সে বলল- আঃ, এত সুন্দর তোমার চেহারা! মনে মনে বলল, আমি একটুবাদেই তোমার সবকিছু স্পর্শ করব। তোমাকে এত সুখ দেব, যা তুমি কখনও পাওনি।

সে তাড়াতাড়ি তার পোশাক খুলে ফেলল। বিছানাতে লাফিয়ে পড়ল।

সে বলল- এসো, আমি তোমাকে আসল খেলা দেখাব।

মেয়েটি এবার বলল- ঠিক আছে, আমার খেলা দেখবে না?

ছেলেটি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। হাত-পা, বরফ হচ্ছে। বিশাল ঘরের সর্বত্র ছড়িয়ে গেল তা। মনে হচ্ছে, অনেকগুলো আঁকশি যেন বেরিয়ে আসছে।

তারপর? তারপর শুধুই অন্ধকার। ভয়ের একটা আতঙ্ক এবং আর্তনাদ।

.

৪০.

গাড়ি এগিয়ে চলেছে নেপলসের দিকে। শেষ আধঘণ্টা দারুণ উত্তেজনায় কেটেছে। দুজনের মন দুধরনের চিন্তায় আচ্ছন্ন। পিয়েরে নীরবতা ভেঙে জিজ্ঞাসা করল- কতদিন তুমি আমার বাড়িতে থাকবে?

–তিন-চার দিন।

–ঠিক আছে।

রবার্ট তার বেশি কখনও থাকবেন না। অবশ্য মনে মনে তার ইচ্ছে, মাত্র একরাত থাকবেন। খুব বেশি হলে দু-রাত। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছকে নিয়েছেন। একটা জাহাজ পেলেই জীবনটা নিরাপদ হবে। ইতালির বাইরে যেতে পারবেন।

পিয়েরে বলল- কতদিন বাদে মায়ের সঙ্গে দেখা হবে।

–তোমার এক ভাই আছে না?

–হ্যাঁ, কারলো, সে আমার থেকে ছোটো।

–তোমার পরিবারের কথা বলল।

–কিছুই বলার নেই। আমার বাবা সারাজীবন ডকে কাজ করেছে। একটা ক্রেন তার মাথায় পড়ে গিয়েছিল, যখন আমার পনেরো বছর বয়স, তখন বাবার মৃত্যু হয়। আমার মা ছিল খুব অসুস্থ। আমাকে এবং কারলোকে সংসারের দায়িত্ব দেওয়া হল। স্টুডিওতে আমার এক বন্ধু ছিল। সে আমাকে এই ব্যাপারে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। আমার মনে হয়েছিল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে খদ্দের ধরলে বোধহয় বেশি টাকা আসবে।

–পিয়েরে, আমার মতো এক অচেনা আগন্তুককে তুমি বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে। মা-ভাই রাগ করবে না?

না, আমরা খুব ভালো সম্পর্ক বজায় রেখেছি। তোমাকে দেখলে মা খুশি হবে। তুমি কি ওকে খুব ভালোবাসবে?

রবার্ট অবাক হয়ে গেছে– কাকে? তোমার মাকে?

না, রেস্টুরেন্টের টেলিফোনে তুমি যার সঙ্গে কথা বলছিলে, সুশান?

–তোমার এই কথা মনে হওয়ার কী কারণ

?–তোমার কণ্ঠস্বর বলে দিচ্ছে। মেয়েটি কে?

–আমার বন্ধু।

–আহা, মেয়েটি খুব ভাগ্যবতী। রবার্ট বেলামি তোমার আসল নাম?

–হ্যাঁ।

–তুমি কমান্ডার?

–আমি ঠিক জানি না, পিয়েরে, একসময় আমি কমান্ডার ছিলাম।

–তুমি বলবে, কেন ইন্টারপোল তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে?

এ ব্যাপারে কোনো কথা তোমাকে বলা বোধহয় উচিত নয়। তাহলে তোমার অনেক সমস্যা হবে। কম জানলেই ভালো।

–ঠিক আছে রবার্ট।

অদ্ভুত একটা পরিস্থিতি। কী ঘটনা তাদের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।

–তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব, তুমি কি জানো, কিছু অচেনা অজানা মানুষ পৃথিবীতে লাফিয়ে পড়ছে। এই খবরটা শুনে তুমি কি ভয় পাবে।

পিয়েরে অবাক– তুমি সত্যি কথা বলছ?

-হ্যাঁ।

পিয়েরে মাথা নাড়ল– না, এটা খুব উত্তেজক ব্যবস্থা। এমন ঘটনা সত্যি ঘটবে?

–হ্যাঁ, সম্ভাবনা আছে।

আমি ভাবছি, তারা কি মানুষের মতো দেখতে?

–আমি ঠিক জানি না।

–এই ব্যাপারে পুলিশ তোমার পেছনে লেগেছে?

–না, আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না।

–আমি যদি কোনো প্রশ্ন করি, তুমি কি রাগ করবে?

–না, রাগ করব না।

কণ্ঠস্বর পাল্টে গেছে।

মেয়েটি বলল- আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। আমি বোকা, আমি একথা কাউকে বলিনি।

–পিয়েরে, এমন কথা বলো না।

–তুমি মিথ্যে কথা বলছ। চলো আমরা আরও ভালোভাবে দিনগুলো কাটাই।

পনেরো মিনিট বাদে তারা একটা সার্ভিস স্টেশনের কাছে এসে গেছে।

রবার্ট বললেন– ট্যাঙ্ক ভরতি করতে হবে।

পিয়েরে হাসল- ঠিক আছে। আমি আমার মাকে জানিয়ে দিই, আমি একটা সুন্দর যুবককে বাড়িতে আনছি।

রবার্ট গ্যাস পাম্পের দিকে এগিয়ে গেলেন।

পিয়েরে পাশে বসে আছে। রবার্টের ঠোঁটে একটা চুমুর চিহ্ন এঁকে সে বলল- আমি এক্ষুনি আসছি।

রবার্ট দেখতে পেলেন, পিয়েরে টেলিফোন বুথের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আঃ, মেয়েটি দেখতে খুবই সুন্দরী, এবং বুদ্ধিমতী, আমি তাকে দুঃখ দেব না।

পিয়েরে ডায়াল করছে। সে রবার্টের দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর অপারেটরকে বলল- ইন্টারপোলের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এখনই। আমার হাতে কিন্তু বেশি সময় নেই।

রবার্ট বেলামির মুখটা

৪১.

রবার্ট বেলামির মুখটা যখন টেলিভিশনের পর্দায় পিয়েরে দেখেছিল, সে জানতে পেরেছিল, সে কীভাবে আরও বেশি অর্থ হাতে পাবে। ইন্টারপোল রবার্টকে কুকুরের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে। নিশ্চয়ই তার জন্য অনেক টাকা ঘোষণা করা হয়েছে। পিয়েরে জানে, রবার্ট কোথায় আছে। আহা, পুরস্কারের টাকাটা এখন আমার। তাকে আমি নেপলসে নিয়ে যাব। তার ওপর কড়া নজর রাখব।

একজন মানুষের কণ্ঠস্বর- ইন্টারপোল, আমি কীভাবে সাহায্য করব?

পিয়েরের বুকে কাঁপন আপনারা কমান্ডার রবার্ট বেলামি নামে এক মানুষের সন্ধান করছেন?

-আপনি কে বলছেন?

তাতে কিছু এসে যায় না। বলুন, আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে?

–ঠিক আছে, অন্য এক জায়গায় কথা বলতে হবে। লাইনটা ধরবেন কি?

তিরিশ সেকেন্ড কেটে গেছে, একজন সিনিয়র অফিসারদের সঙ্গে পিয়েরে কথা বলছে- কীভাবে সাহায্য করব?

কমান্ডার রবার্ট বেলামি আমার সঙ্গে আছেন। তাকে কি আপনারা চাইছেন?

–হ্যাঁ, সিরিয়া, তাকে আমরা চাইছি। সত্যি কথা বলছেন?

–হ্যাঁ, উনি আমার পাশেই আছেন। কত টাকা পাব?

–পুরস্কার?

–হ্যাঁ, পুরস্কার।

ভদ্রলোক তার সহকারীর দিকে তাকালেন।

এখনও মাথার দাম ধার্য করা হয়নি।

–ঠিক আছে, আমার খুব তাড়া আছে কিন্তু।

কত টাকা আপনি চাইছেন?

–পঞ্চাশ হাজার ডলার?

–পঞ্চাশ হাজার ডলার! অনেক। কোথায় গিয়ে কথা বলা যায়?

–না, টাকাটার ব্যাপারে সব ঠিক না হলে আমি কিন্তু কথা বলব না।

পিয়েরে দেখল রবার্ট সেদিকে এগিয়ে আসছেন। সে বলল তাড়াতাড়ি বলুন। হা অথবা না।

-ঠিক আছে সিনরিয়া। হ্যাঁ, আমরা ওই টাকাটাই দেব।

রবার্ট দরজার কাছে এসে গেছেন। পিয়েরে টেলিফোনে বলল- আমরা ডিনারের আগেই পৌঁছে যাব। ওকে তোমার ভীষণ ভালো লাগবে। ও খুব ভালো। তোমার সঙ্গে দেখা হবে, কেমন?

পিয়েরে রিসিভারটা নামিয়ে রবার্টের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বলল- মা, তোমাকে দেখার জন্য মরে যাচ্ছে বোধহয়!

.

৪২.

ইন্টারপোল হেডকোয়ার্টার। একজন অফিসার বললেন- কোথা থেকে ফোনটা এসেছে ধরা গেল?

ওরা সোল থেকে ফোন করেছে। তার মানে বেলামি এখন নেপলসের দিকে এগিয়ে চলেছেন।

.

কর্নেল ফ্রানসেসকো সিজার এবং কর্নেল ফ্রাঙ্ক জনসন সিজারের অফিসের একটা ম্যাপের দিকে তাকিয়ে আছেন।

কর্নেল সিজার বললেন- নেপলস একটা মস্ত বড়ো শহর। এক হাজার জায়গায় মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে।

মেয়েটি কে?

এ ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা নেই।

–মেয়েটিকে খুঁজে বের করলে কেমন হয়?

সিজার অবাক কী করে?

-বেলামি যদি এক নারীসঙ্গ প্রার্থনা করেন তা হলে তিনি কোথায় যাবেন?

উনি এক বেশ্যাকে খুঁজবেন।

–তাহলে আমরা সেখান থেকেই শুরু করব।

–ঠিক বলেছেন, বেশ্যাপট্টিতে যাব।

তারা সঙ্গে সঙ্গে সেই অঞ্চলে চলে গেলেন। সঙ্গে ক্যাপটেন বেলানিকে নেওয়া হল। ওই অঞ্চলের পুলিশ সুপারভাইজার।

বেলানি বললেন, অত সহজে কথা বের করা যাবে না। তাদের মধ্যে খেয়োখেয়ির শেষ নেই। পুলিশ এলেই তারা এককাট্টা হয়ে যায়। তারা কথা বলতে চায় না।

এই সেই অঞ্চল। কুখ্যাত অঞ্চল। একটা মেয়ের দিকে তাকিয়ে পুলিশ অফিসার বললেন- শুভ সন্ধ্যা, মারিয়া, ব্যবসা কেমন চলছে।

–আপনি চলে গেলেই ব্যবসা ভালো চলবে।

–আমরা এখানে বেশিক্ষণ থাকতে আসিনি। আমরা এক আমেরিকান খদ্দেরের সন্ধানে এসেছি। যে একটা মেয়েকে কালরাতে তুলে নিয়ে গেছে। তারা বোধহয় এখন একসঙ্গে ভ্রমণ করছে। মেয়েটি কে? তুমি কিছু জানো?

রবার্টের একটা ছবি অফিসারের হাতে ছিল। উনি ছবিটা দেখালেন।

কয়েকটা বেশ্যা কথা বলতে শুরু করছে।

মারিয়া বলল- না, আমি কিছুই জানি না। তবে, আমি একজনের কথা জানি, যে এ বিষয়ে খবর দিতে পারে।

মারিয়া রাস্তার উল্টোদিকে তাকাল। লেখা আছে– জ্যোতিষী মাদাম লুসিয়া।

মেয়েরা হো-হো করে হেসে উঠেছে।

ক্যাপটেন বেলানি বললেন- ও, ঠাট্টা ইয়ারকি? ঠিক আছে পরে আবার দেখা হবে। এই আমেরিকান ভদ্রলোকের তল্লাশি করতেই হবে। সত্যি তুমি জানো না?

না, আমি কিছুই জানি না।

এক ঘণ্টা কেটে গেল। না, কোনো খবরই পাওয়া যায়নি। ছেলেরা খদ্দের ধরতে ব্যস্ত। মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

–এভাবে কথা বলছ কেন? আমি তো পুলিশের টাকা দিয়েছি।

–ঠিক আছে, আমি পাঁচ বছর ধরে এই কাজ করছি।

আরও অনেক কথা হল।

শেষ অব্দি সিজার এবং কর্নেল জনসন ক্যাপটেন বেলানির অফিসে ফিরে এলেন।

বেলানি বললেন- নাঃ, এই ব্যাবসাটা বন্ধ করা যায় না?

কখনওই সম্ভব নয়, তাহলে পর্যটকরা আসবে কেন?

কর্নেল জনসন বললেন- এত চিন্তা করে কী লাভ? মেয়েটা নিশ্চয়ই আবার ফোন করবে।

পরের দিন বিকেলবেলা, ক্যাপটেন বেলানি জানতে পারলেন মি. লরেঞ্জো নামে একটি লোক দেখা করতে এসেছে।

তাকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।

লরেঞ্জোর পরনে দামী পোশাক, হাতে হিরের আংটি। লরেঞ্জো এক দালাল।

বেলানি বললেন- কী করতে পারি?

-আমি ওই ভদ্রলোককে দেখেছি। আপনারা এক বেশ্যা মেয়ের খবর চাইছেন যে, এক আমেরিকানের সাথে পালিয়ে গেছে। তাই তো? আমি সবসময় আপনাকে সাহায্য করতে চাইছি। আমি তার নাম বলব?

কর্নেল জনসন বললেন– ও কে?

লরেঞ্জো বলল- তাহলে কী হবে? আমার বন্ধুদের ওপর কোনো অত্যাচার হবে না তো? তাদের ওপর আঘাত হবে না তো?

কর্নেল সিজার বললেন- আমরা কোনো মেয়েকেই আঘাত করব না। মেয়েটির নাম কী?

-বাঃ, খবরটা খুবই ভালো, আপনাদের মতো লোকেদের সাথে কথা বলতেই ভালো লাগে।

-নাম কী লরেঞ্জো?

–ওর নাম পিয়েরে, আমেরিকানটা পিয়েরের সাথে সারারাত কাটিয়েছে তার হোটেলে। আজ সকালে তারা চলে গেছে। সে আমার মেয়ে নয়, আমার মেয়ে হলে আমি কখনওই খবর দিতাম না।

বেলানি ফোনের কাছে পৌঁছে গেছেন পিয়েরের খোঁজ করো।

–ঠিক আছে, এবার আপনি আসতে পারেন।

বেলানির ডেস্কে পিয়েরের পুরো খবরটা চলে এল। পনেরো বছর বয়স থেকে সে রাস্তায় খদ্দের ধরছে। বার দশেক তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

–কোন জায়গা থেকে সে এসেছে? কর্নেল জনসন জানতে চাইলেন।

–নেপলস, মা আর ভাই আছে।

–আমরা সেখানে খবর পাঠাব?

–এখনই এটা করতে হবে।

.

৪৩.

নেপলসের প্রান্তসীমা। ছোটো ছোটো রাস্তা। প্রত্যেক জানলাতে কাপড় শুকোচ্ছে।

পিয়েরে জানতে চাইল- তুমি কখনও নেপলসে এসেছ?

–একবার, রবার্ট বললেন, সুশান তখন পাশে বসেছিল, হাসছিল। নেপলস সম্পর্কে আমার ধারণা মোটেই ভালো নয়। আমি শুনেছিলাম, এখানে অনেক দুষ্টু ঘটনা ঘটে থাকে।

পিয়েরের কথা মতো রবার্ট গাড়িটা থামালেন।

একদল তরুণী কন্যা হৈ-হৈ করতে করতে বেরিয়ে এসেছে। তাদের সকলের চোখে পিয়েরে এখন এক জলপরি। তারা সকলেই পিয়েরের মরকত অলংকারের প্রশংসা করতে লাগল। পিয়েরের চোখ টিপে রবার্টের দিকে তাকিয়ে আছে। আহা, রবার্ট এখন বুঝি এক দেবদূত।

রবার্ট ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠেছেন।

রবার্ট জানতে চাইলেন। এবার আমরা কোথায় যাব?

পিয়েরে বলল- আমার মায়ের বাড়িতে।

ছোটো একটা ফার্মহাউস। এখান থেকে আধ ঘন্টা যেতে লাগবে।

.

নেপলসের দক্ষিণ প্রান্তসীমায় এই ফার্ম হাউসটা অবস্থিত। একটা পুরোনো পাথরের বাড়ি। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। পিয়েরে বলল– এটা কি সুন্দর নয়?

-হ্যাঁ, সত্যিই সুন্দর। এখানে থাকলে কেউ আমাকে ধরতে পারবে না।

তারা সামনের দরজার দিয়ে এগিয়ে গেল। পিয়েরের মা দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে হাসি। মেয়ের মতোই তার চেহারা, চেহারটা অনেক পাতলা হয়ে এসেছে। মাথায় ধূসর চুল। মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

-তোমাকে কতদিন দেখিনি বলো তো?

–এই ভদ্রলোকের কথাই আমি বলছিলাম ফোনে।

–হ্যাঁ, এসো-এসো। তোমার নাম কী?

রবার্ট বললেন– আমি জোনস।

বিরাট লিভিংরুম। ভালো এবং আরামদায়ক। পুরোনো ফার্নিচারে ভরতি।

বছর কুড়ির একটা ছেলে বেরিয়ে এসেছে। রোগা এবং পাতলা, চোখের তারায় বিস্ময়, জিনস পরেছে। জ্যাকেট পরেছে। নাম লেখা আছে। বোনকে দেখে সে আনন্দিত– পিয়েরে?

হালো কারলো?

ওরা একে অন্যকে আদর করল।

–এখানে কেন এসেছ?

–আমরা কদিন থাকব। এ আমার ভাই কারলো। আর ইনি মি. জোনস।

–হ্যালো কারলো।

মা বললেন তোমরা দুজন ওই সুন্দর বেডরুমে থাকবে, কেমন?

রবার্ট বললেন– না, যদি একটা আলাদা বেডরুম থাকে, তা হলে ভালো হয়।

কিছুক্ষণের নীরবতা।

রবার্ট দাঁড়িয়ে আছেন।

মা বললেন কেন? পিয়েরে মাথা নাড়ল। কিন্তু পিয়েরে জানে, রবার্ট সমকামী নন।

মা রবার্টের দিকে তাকালেন- তোমার যা ইচ্ছে। তোমাকে দেখে ভালো লাগছে। এসো, কিচেনে এসো। কফি তৈরি করা যাক।

কিচেনে গিয়ে মা জিজ্ঞাসা করলেন হারে ছেলেটাকে কোথায় পেলি? মনে হচ্ছে খুব বড়োলোক। তোকে কী সুন্দর ব্রেসলেট দিয়েছে। আঃ, আমি আজ রাতে ভালো রান্না করব। পাড়াপড়শীকে ডাকব। তারা সকলে তোর ভাবী বরের সঙ্গে দেখা করবে।

মা, ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করছ কেন?

–সে কী রে? তোর সৌভাগ্যের কথা সকলকে বলবি না?

–মা, মি. জোনস, এখানে কদিন বিশ্রাম করবেন। পার্টি দিও না।

মা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন- যা তুই বলবি তাই হবে।

.

কারলো ব্রেসলটটা দেখল–এগুলো আসল মরকত? তুমি আমার বোনের জন্য কিনেছ?

রবার্ট বললেন- হা, জিজ্ঞাসা করো।

পিয়েরে এবং মা কিচেন থেকে বেরিয়ে গেছে। মা রবার্টের দিকে তাকালেন সত্যি তুমি পিয়েরের সাথে শোবে না?

পিয়েরের মুখে লজ্জা– না, পিয়েরে বলল– চলো, তোমার বেডরুমটা দেখিয়ে দিই।

তারা বাড়ির পেছন দিকে চলে গেল। মস্ত বড়ো একটা বেডরুম। দুটো খাট আছে।

রবার্ট, তুমি কেন চিন্তা করছ? আমরা একসঙ্গে শুতে পারি। আমি মাকে সব কথা বলেছি।

না, এখন এভাবে করা উচিত হবে না।

পিয়েরের কণ্ঠস্বরে শীতলতা- ঠিক আছে, তুমি যা বলবে তাই হবে।

দু-দুবার এই ঘটনা ঘটল- কেন বোঝা যাচ্ছে না। এমন এক মানুষকে আমি পুলিশের হাতে তুলে দেব? অনুশোচনা। পঞ্চাশ হাজার ডলার। টাকার অঙ্কটা খুব একটা কম নয়।

ডিনারের আসর। মা বড্ড বেশি কথা বলছেন। পিয়েরে, রবার্ট এবং কারলো শান্ত শ্রোতা।

রবার্ট ভাবছেন, কী করে এখান থেকে পালাবেন। আজ রাতে ওকে চলে যেতে হবে। একটা জাহাজ খুঁজতে হবে।

পিয়েরে ভাবছে, কখন ইন্টারপোলের লোকেরা আসবে। আবার তাদের ফোন করতে হবে। শহরে গিয়ে ফোন করব। পুলিশ তাহলে জায়গাটা খুঁজে পাবে না।

কারলো অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে এই অতিথির দিকে।

ডিনার শেষ হয়ে গেল। মা এবং মেয়ে কিচেনে চলে গেল। রবার্ট কারলোর সঙ্গে গল্প করছে।

কারলো বলল- তুমি ছাড়া আর কাউকে আমার বোন কিন্তু বাড়িতে আনেনি। ও নিশ্চয়ই তোমাকে খুব ভালোবাসে।

–আমিও ওকে ভালোবাসি।

–তুমি কি ওর দায়িত্ব নেবে?

–তোমার বোন নিজেই নিজের দায়িত্ব নিতে পারে।

কারলো হাসল, হ্যাঁ, আমি জানি।

এই মানুষটা নিশ্চয়ই খুব বড়োলোক। ও একটা হোটেলে থাকতে পারত। কেন এখানে এসেছে? মানুষটা বোধহয় লুকিয়ে থাকতে চাইছে। এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হবে। একটা ধনী মানুষ লুকোতে চাইছে কেন? তার মানে? নিশ্চয়ই টাকার আদান-প্রদান আছে।

কারলো জানতে চাইল- তুমি কোথা থেকে আসছ?

–সেভাবে বলতে পারব না। আমি নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াই।

কারলো এবার তার পরিকল্পনা ঠিক করছে। পিয়েরের সঙ্গে কথা বলতে হবে। বুঝতে পারা যাচ্ছে, এই লোকটাকে ধরতে পারলে অনেক টাকা পাওয়া যাবে। আমি আর পিয়েরে সেই টাকাটা ভাগ করব।

কারলো জানতে চাইল তুমি কী করো?

এখন আমি ব্যবসা থেকে ছুটি নিয়েছি।

এই লোকটার পেট থেকে কথা বার করা সহজ নয়– কারলো ভাবল। লুক্কার সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়?

-তুমি এখানে কতদিন থাকবে?

–এখনই ঠিক বলতে পারছি না। ছেলেটির কৌতূহল রবার্টকে অবাক করেছে।

পিয়েরে এবং তার মা কিচেন থেকে বেরিয়ে এল। মা জানতে চাইলেন- কফি খাবে?

না, মাসিমা, ডিনারটা সাংঘাতিক।

মার মুখে হাসি। এটা তো কিছুই নয়। আমি কাল সকালে তোমার জন্য নিজের হাতে রান্না করব। ঠিক আছে?

রবার্ট ভাবলেন, তারই মধ্যে তিনি চলে যাবেন।

–ঠিক আছে, এবার খুব ক্লান্তি লাগছে। আমি শুতে যাব কি?

মা বললেন– শুভ রাত্রি।

রবার্ট ধীরে ধীরে বেডরুমে পৌঁছে গেলেন।

কারলো হাসল। সে বলল- হারে, তোর সঙ্গে লোকটা শুতে চাইল না কেন বল তো?

কথাটা শুনে পিয়েরে অবাক হয়ে গেছে। পিয়েরে বুঝতে পেরেছে, কারলো এখন অনেক অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। রবার্ট কিন্তু সমকামী নয়, তাহলে সুশানকে এতখানি ভালোবাসতে পারত না।

রবার্ট বিছানাতে শুয়ে আছেন, পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে চিন্তা করছেন। না, এখানে আর থাকাটা উচিত হবে না। কীভাবে এই জাল কেটে বেরিয়ে আসবেন।

বেডরুমের দরজায় শব্দ হয়েছে।

–কে? এগিয়ে আসছে। সুন্দর প্রসাধনের গন্ধ। পিয়েরে, তুমি কেন এসেছ?

পিয়েরে সম্পূর্ণ নগ্ন– আমার ভীষণ ভয় করছে। পিয়েরে কাছে সরে এল।

–পিয়েরে, আমি তোমাকে ভালোবাসতে পারব না।

পিয়েরে অবাক কেন বলো তো?

–আমি এক ভবঘুরে। জানি না আমার জীবনটা কী হবে।

রবার্টের কণ্ঠে হতাশা।

রবার্ট, আমার শরীরটা ভালো নয়?

–হ্যাঁ, অবশ্যই।

পিয়েরে এগিয়ে এসে তার নগ্ন শরীরটা রবার্টের বুকের সাথে ঠেলে দিল। রবার্টের শরীরের এখানে সেখানে সে ধাক্কা দিতে থাকল। কখনও তার বুক, কখনও তার পুংদণ্ড।

রবার্ট এই খেলাটা বন্ধ করতে বললেন। তিনি বললেন– পিয়েরে আমি তোমাকে ভালোবাসতে পারছি না। অনেক দিন ধরে আমি কোনো মহিলার সংসর্গে আসিনি।

-রবার্ট, তোমায় কিছু করতে হবে না, আমি শুধু খেলা করব। তুমি কি আমার সাথে অসভ্য খেলা খেলবে না?

সুশানের কথা মনে পড়ে গেল। সুশান আমার সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। আমার পৌরুষের শেষ অহংকার।

পিয়েরে বলল- তুমি উল্টে শোও।

–পিয়েরে, এতে কোনো লাভ নেই।

পিয়েরে তার শরীরটা রবার্টের বুকের ওপর ঠেলে দিল। রবার্ট বুঝতে পারলেন, পিয়েরের মুখ এখন তার সর্বত্র খেলা করছে। ক্রমশ নীচে নেমে আসছে। আঃ, তার শরীরের সবখানে পিয়েরের আঙুলের কারুকাজ।

–পিয়েরে?

স-স-স?

রবার্ট বুঝতে পারলেন, ব্যাপারটা এখন শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। জিভটা ক্রমশ নীচে নামছে।

আঃ, জিভটা বড্ড ঠাণ্ডা এবং নরম। তিনি বুঝতে পারলেন, দুটি স্তন তার শরীরের সঙ্গে লেপটে রয়েছে। হৃৎস্পনের গতি দ্রুত হচ্ছে। ওঃ, আমি এখন কী করব? সেটা শক্ত হয়ে উঠেছে।

শেষ অব্দি রবার্ট ঘুরে দাঁড়ালেন। পিয়েরেকে বুকের ওপর নিলেন।

পিয়েরে বলল- হায় ঈশ্বর, তোমারটা মস্ত বড়ো। তুমি কি ওটা ঢোকাবে না?

রবার্ট শেষ পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিলেন। একবার নয়, দুবার নয়, অনেকবার। পিয়েরে বন্য ভালোবাসার সন্ধানী। তাদের দুজনের মধ্যে একটা অদ্ভুত খেলা শুরু হয়ে গেল। সেই রাতে তারা তিনবার মিলিত হয়েছিল। তারপর তারা ঘুমিয়ে পড়ল।

.

অষ্টাদশ দিবস, নেপলস, ইতালি।

সকাল হয়েছে। সূর্যের বিবর্ণ আলো জানলা দিয়ে ঢুকে পড়েছে। রবার্টের ঘুম ভেঙেছে। তখনও পিয়েরে তার সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ।

রবার্ট বললেন– তোমাকে ধন্যবাদ।

পিয়েরের চোখে দুষ্ট হাসি কেমন লাগল?

–অসাধারণ।

পিয়েরে আবার হাসছে- তুমি একটা বুনো জন্তু।

রবার্ট বললেন- তুমি আমার উন্মাদনা সামাল দিতে পারবে।

পিয়েরে এবার জানতে চাইল- সত্যি সত্যি তুমি ড্রাগ স্মাগলার?

না।

ইন্টারপোল তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তাই না?

–হ্যাঁ।

–আমি জানি, তুমি একজন স্পাই, তাই না?

পিয়েরের মুখে শিশুর সারল্য। রবার্টের মুখে হাসি হয়তো তাই হবে।

পিয়েরে বলল- সত্যিটা স্বীকার করো না বাবা। তুমি একজন স্পাই?

–হ্যাঁ, তুমি যখন বলছ।

–আমায় কতগুলো গল্প শোনাবে।

কী ধরনের গল্প?

–আমি বইতে পড়েছি, এগুলো বানানো গল্প। আমি এই প্রথম চোখের সামনে একটা জীবন্ত স্পাইকে দেখতে পেলাম।

–ঠিক আছে, তোমাকে শোনাব।

রবার্ট ভাবলেন, কোন্ গল্প বলবেন? সত্যি গল্পটা কেউ কি শুনতে চাইবে?

রবার্ট দুটো একটা গল্প বললেন। পিয়েরে অবাক হয়ে গেছে। ভাবতে পারা যাচ্ছে না, কীভাবে খবর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানো হয়।

শেষ পর্যন্ত রবার্ট বললেন– আর নয়, বেশি শুনলে তোমার মাথা ঝিমঝিম করবে।

পিয়েরে এগিয়ে এল। বলল- তোমাকে আরও অনেক ভালোবাসা দেব। বলল, তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না তো?

পিয়েরে আবার বলল- তুমি কি এখন চান করবে?

-হ্যাঁ, চান করতে পারলে ভালোই হত।

গরম জল। তারা একে অন্যকে আদর করছে। দুজনে এক সঙ্গে স্নান করছে।

সেই শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে তারা ভালোবাসা বিনিময় করল।

রবার্ট পোশাক পরে নিল। পিয়েরেও পোশাক পরে বলল ব্রেকফাস্টের পর আবার আমরা গল্প করতে বসব।

.

কারলো ডাইনিং রুমে অপেক্ষা করছে। সে বলল- দিদি, তোর বন্ধু সম্পর্কে সবকিছু গুছিয়ে বল দেখি।

কী জানতে চাইছিস?

–কোথায় তোদের দেখা হয়েছে?

–রোমে।

–লোকটা খুব বড়োলোক। তা না হলে তোকে এত দামী গয়না দেবে কেন?

কাঁধে ঝাঁকুনি ও আমাকে ভালোবাসে।

–মনে হচ্ছে, তোর বন্ধুটা কোনো ব্যাপারে ভয় পেয়েছে। ঠিক জায়গায় খবরটা পৌঁছে দেব? তা হলে অনেক টাকা পাওয়া যাবে।

পিয়েরে রেগে গিয়ে বলল– কারলো, তুই এ ব্যাপারে নাক গলাতে আসিস না।

-তা হলে আমার ধারণা ঠিক, তাই তো? লোকটা ভয়ে পালিয়ে এসেছে, তাই না?

–শোন কারলো, আমি শেষবারের মতো তোকে সাবধান করে দিচ্ছি, নিজের চরকায় তেল দে।

পিয়েরে তার প্রাপ্য টাকাটা অন্য কারও সাথে ভাগ করতে চাইছে না।

কারলো বলল– তাহলে ছোট্ট বোন আমার, সব টাকা তুই একাই মেরে দিবি?

কারলো, তুই কেন কথা বলছিস? পিয়েরে আরও বলল, তোকে আমি সত্যিটা বলব, মি. জোনস তার বউয়ের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে। বউটা এক গোয়েন্দাকে ভাড়া করেছে। এর মধ্যে আর কিছু নেই।

কারলো হাসছে ব্যাপারটা আমাকে আগে বলিসনি কেন? অনেক টাকার কারবার? তাই তো?

কারলো ভাবছে, সত্যিটা বার কাতেই হবে।

.

জানুস টেলিফোনে আর কোনো খবর আছে?

–আমরা শুনেছি কমান্ডার বেলামি এখন নেপলসে আছেন।

–আর কোনো সংবাদ?

-হ্যাঁ, আমরা চেষ্টা করছি। উনি একজন বেশ্যার সাথে ঘুরছিলেন। নেপলসে ওই মেয়েটার বাড়ি। আমরা যে করেই হোক সেখানে পৌঁছে যাব।

–আমাকে সর্বশেষ সংবাদ জানাবেন।

.

নেপলস, মিউনিসিপ্যাল হাউসিং, পিয়েরের মায়ের সম্পর্কে খবর নেওয়া হচ্ছে।

সিকিউরিটি এজেন্টরা পৌঁছে গেছে। নেপলসের পুলিশ ফোর্সকে জানানো হয়েছে।

কারলো তার নিজস্ব পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। পিয়েরে আবার ইন্টারপোলকে ফোন করবে।

.

৪৪.

বাতাসের মধ্যে বিপদের গন্ধ। রবার্ট বুঝতে পারছেন। জলের ধারে জাহাজগুলো দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে পালানো যাবে কি? চারপাশে পুলিশের গাড়ি। ইউনিফর্ম পরা পুলিশরা ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। তার মানে? পুলিশের কাছে খবর কী করে পৌঁছোল? আমি যে এখন নেপলস-এ আছি, এটা তো কেউ জানে না। একমাত্র কে জানে? বিদ্যুৎ চমকে মতো রবার্টের মনে হল, তা হলে? পিয়েরে কি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?

সুশানের কথা মনে পড়ল। সুশান বলেছিল, ওরা এখন জিব্রাল্টারের কাছাকাছি আছে। আমাকে তুলে নেবার কথাও বলেছে।

সুশানকে এই ঝামেলায় জড়িয়ে কী লাভ? কিন্তু এখন আর বিকল্প কী আছে? একটা ব্যক্তিগত প্রমোদ তরণীতে লুকিয়ে থাকা যাবে। একটা ফোন করলে কেমন হয়।

রবার্ট একটা ছোটো কাফের সামনে গাড়িটা দাঁড় করালেন। ভেতরে চলে গেলেন। পাঁচ মিনিট বাদে ওই প্রমোদ তরণীর সঙ্গে কথা হল।

–মিসেস বাঙ্কস আছেন কি?

–কে কথা বলছেন জানতে পারি কি?

বলুন আমি একজন বন্ধু।

এক মুহূর্তবাদে সুশানের কণ্ঠস্বর- রবার্ট? তুমি কেমন আছো?

–আমি ভালো নেই।

–তুমি সাবধানে আছে তো?

সুশান, তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?

কখন?

–আজ রাতে নেপলসে আসতে পারবে?

একটুখানি ধরো, আমি কথা বলছি।

রবার্ট রিসিভারটা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

সুশান বললেন- মন্টে বলছে ইনজিনে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু দুদিন লাগবে নেপলস-এ পৌঁছোতে।

সমস্যা বেড়ে যাবে। তবুও রবার্ট বললেন- ঠিক আছে, তা হলেও চলবে।

কীভাবে তোমায় যোগাযোগ করব?

–আমি জানিয়ে দেব।

রবার্ট, নিজের দেখাশোনা করো।

–চেষ্টা করছি।

–তোমাকে ওরা ধরতে পারবে না তো?

না, এ বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সুশান রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। তিনি তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন হা, অবশেষে ও আসছে।

.

এক ঘণ্টা কেটে গেছে। রোম শহর। ফ্রানসেসকো সিজার একটা টেলিগ্রাম কর্নেল জনসনের হাতে তুলে দিলেন। এটা এসেছে একটা প্রমোদ তরণী থেকে। লেখা আছে– বেলামি এখানে আসছেন, আমরা আবার জানাব।

তলায় কোনো সই নেই।

সিজার বললেন- বেলামি ওখানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে ফেলতে হবে।

.

৪৫.

কারলো ভ্যালি নানা বিষয়ে চিন্তা করেছে। কীভাবে আসল খবরটা পাওয়া যাবে। মি. জোনসকে কখনোই ছাড়া হবে না। অনেক টাকার কারবার। শেষ পর্যন্ত সে মারিও লুক্কার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। রাস্তার মস্তান।

সকালবেলা, কারলো তার মোটর স্কুটার নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। অতি দ্রুত ছুটে গেল। লুক্কার কাছে পৌঁছে গেল।

–কে? কারলো?

লুক্কা, তোমার সাথে কিছু কথা আছে।

–ভেতরে এসো।

মারিও লুক্কা নগ্ন হয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার বিছানার কাছে একটা মেয়েকে দেখা গেল।

-কী হয়েছে? এত সকালে কেন?

–মারিও, আমি ঘুমোতে পারছি না, উত্তেজনায় ছটফট করছি। বিরাট একটা মুরগি পাকড়েছি।

-সত্যি বন্ধু, ভেতরে এসো।

কারলো ওই ছোট্ট ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল।

–গতরাতে আমার বোন একটা শাঁসালো মক্কেল পাকড়েছে।

–কে? পিয়েরে? ওই বেশ্যাটা?

–হ্যাঁ, কিন্তু এই লোকটা সত্যিই বড়োলোক। সে লুকিয়ে আছে।

–কেন?

–আমি জানি না, ব্যাপারটা বের করতে হবে। মনে হচ্ছে, ভালো দাঁও মারা যাবে।

–বোনকে জিজ্ঞাসা করলে না কেন?

-না, পিয়েরে সব ব্যাপারটা নিজের মধ্যে রাখতে চাইছে। ওই লোকটা আমার বোনকে দামী ব্রেসলেট দিয়েছে।

কত দাম হবে?

জানি না। ওটা বেচতে হবে।

লুক্কা দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর বলল– কারলো, লোকটার সাথে কথা বললে কী হয়? তাকে ক্লাবে নিয়ে আসতে পারবে না?

ক্লাব মানে একটা ফাঁকা ওয়্যার হাউস। সেখানে এমন একটা ঘর অছে, যেখান থেকে শব্দ বাইরে বেরোয় না।

কারলো হাসল, আমি আনতে পারব।

লুক্কা বলল- ঠিক আছে, আমরা অপেক্ষা করছি। লোকটার সঙ্গে কথা বলতে হবে। মনে হয়, তার গলাটা ভালোই হবে। কারণ সে তো এবার আমাদের জন্য গান গাইবে।

.

কারলো বাড়িতে ফিরে এসেছে। মি. জোনস নেই। কারলোর মনে হয়।

সে পিয়েরেকে প্রশ্ন করল- বন্ধু কোথায় গেল।

–সে শহরে চলে গেছে, এক্ষুনি চলে আসবে। কেন?

না, এমনি আর কী। কারলো অপেক্ষা করছে। মা আর বোন কিচেনে রান্না করছে। লাঞ্চের প্রস্তুতি। সে পিয়েরের ঘরে ঢুকে পড়ল। দেখল, ব্রেসটেলটা একটা পোশাকের তলায় লুকোনো আছে। সে চট করে ব্রেসলেট পকেটে পুরে নিল। মায়ের কাছে ফিরে এল।

কারলো, লাঞ্চ খাবি না?

না, মা, আমি একটু পরে আসব।

আবার সে তার ভেসপোতে চড়ে বসল। এবার এটা বেচতে হবে। কিন্তু এটা কি নকল? মোটর বাইকটা একটা জুয়েলারি দোকানের সামনে রাখল। মালিক, গামবিনো, বুড়ো মানুষ, কালো পরচুল মাথায়। বাধানো দাঁত। উনি কারলোর দিকে তাকালেন।

কারলো, এত সকাল-সকাল? আজ আমার জন্য কী এনেছ?

কারলো ওই ব্রেসলেটটা কাউন্টারের কাঁচের ওপর রাখল। গামবিনো দেখলেন, আবাক হয়ে গেলেন কোথায় পেলে?

–আমার এক কাকিমা মারা গেছে। এটা আমাকে দিয়ে গেছে। কত দাম?

–অনেক হবে।

বাজে কথা বলার চেষ্টা করো না।

–আমি কি কখনও তোমায় ঠকিয়েছি।

সব সময় তুমি আমাকে ঠকাও।

–তোমরা, ওই ছেলেছোকরার দল, বড্ড ঝামেলা করো। কারলো, আমি জানি না, এটা অত্যন্ত দামী।

কারলোর মস্তিষ্ক আনন্দে ভরপুর। হৃৎস্পন্দন শুনতে পাচ্ছে সত্যি?

-হ্যাঁ, আমি আজ রাতে তোমাকে জানাব।

–ঠিক আছে। কারলো বলল। সে ব্রেসলেটটা নিয়ে নিল। এটা আমার কাছেই থাকবে। কারলো দোকান থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। ঠিক আছে, লোকটার হাতে অনেক পয়সা আছে।

গামবিনো কারলোকে যেতে দেখল। সে ভাবল, এ মালটা এল কোথা থেকে। সে একটা সারকুলার হাতে নিল। এই সারকুলারটা সব দোকানে পাঠানো হয়েছে। যে ব্রেসলেটটা আছে তার বর্ণনা দেওয়া আছে। হ্যাঁ, কোথায় ফোন করা হবে? বলা আছে, এই ব্রেসলেট দেখলে সঙ্গে সঙ্গে যেন পুলিশের সাথে যোগাযোগ করা হয়।

অন্য সময় হলে গামবিনো ওই সারকুলারটা দেখতেই পেত না। কিন্তু এখন সে ওটা দেখতে পেয়েছে। কিন্তু ফোন করাটা কি ঠিক হবে? তা হলে? দাঁওটা নষ্ট হয়ে যাবে। না, লাভ নেই। শেষ পর্যন্ত সে টেলিফোনটা তুলে নিল। সারকুলারে যে নাম্বারটা দেওয়াছিল সেখানে ফোন করল।

.

৪৬.

ভয়ের মুহূর্ত। অন্ধকারের আবরণ। রবার্টকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। একটা জঙ্গলে। তাকে থাকতে হয়েছিল। অক্টোবর মাস, আকাশ জোড়া বৃষ্টি। জঙ্গলের ভেতর প্রাণ

সংশয়। রবার্ট জানতেন না, শেষ পর্যন্ত ওই অন্ধকার থেকে আবার আলোর জগতে আসতে পারবেন কিনা।

শহরের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেছেন। শেষ পর্যন্ত দেখলেন, পুলিশ রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে।

কী হয়েছে? বুঝতে পারছেন না। চারপাশে এত মানুষজন কেন?

একটা বুদ্ধি তার মাথায় এল। যে সমস্ত জাহাজগুলো ইতালি ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে না, সেখানে লুকিয়ে থাকলে কেমন হয়? রবার্ট আবার বন্দরের দিকে যাত্রা শুরু করলেন।

.

জুয়েলারি দোকানের ছোট্ট ঘণ্টাটা বেজে উঠেছে। কালো পোশাক পরা দুজন মানুষ প্রবেশ করেছে। না, এরা কিন্তু খদ্দের নয়।

বলুন কী করব?

–মি. গামবিনো?

ফোকলা দাঁতে নকল হাসি-হা, একটা মরকত ব্রেসলেটের ব্যাপারে কথা বলতে চাই।

পুলিশ এসে গেছে তা হলে?

–ঠিক আছে, আমার এটা কর্তব্য, তাই আমি জানিয়েছি।

–কে নিয়ে এসেছে?

কারলো নামের একটা ছোটো ছেলে।

–ও কি ব্রেসলটটা রেখে গেছে?

–না, ও নিয়ে গেছে।

কারলোর পুরো নাম কী?

গামবিনোর চোখে অসহায়তা জানি না। রাস্তার ছেলে। লুক্কা নামে এক মস্তান দলটা চালায়।

লুক্কাকে কোথায় পাওয়া যাবে?

লুক্কার জায়গাটা বলা উচিত হবে কি? বলে দিলে হয়তো জীবন সংশয়। না বললেও সমস্যা। শেষ পর্যন্ত আমতা আমতা করে গামবিনো বলল- সে পিজার পাশে থাকে।

ধন্যবাদ, গামবিনো। আপনাকে আমরা মনে রাখব।

লোক দুজন চলে গেল।

.

লুক্কা তার মেয়ে বন্ধুর সঙ্গে খুনসুটি করছিল। দুজন লোক তার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে পড়েছে।

লুক্কা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল- তোমরা কে? অসময়ে বিরক্ত করছ কেন?

একজন তার পরিচয় পত্রটা দেখাল। পুলিশের লোক। লুক্কা ভয় পেয়ে গেছে।

-না, আমি একজন ভালো নাগরিক। আমি তো খারাপ কাজ করিনি।

-লুক্কা সে খবরটা আমাদের জানা আছে। আমরা কারলো নামে একটা ছেলের সন্ধান করছি।

কারলো? তাহলে; ওই ব্রেসলেট নিয়ে ঝঞ্ঝাট। কারলো কীভাবে এই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল? পুলিশ নিশ্চয়ই চোরাই মালের জন্য এত ব্যস্ত হবে না।

-ঠিক করে বলো, ও কোথায় থাকে?

কারলো, মানে কোন কারেলো? কারলো ভ্যালি?

হ্যাঁ, তার সঙ্গে এখনই কথা বলতে হবে।

কিন্তু এখানকার সকলে রক্ত দিয়ে শপথ নেয়। একে অন্যের জন্য জীবন দেবে। কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। এই ভাবেই দলটা এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তারা একসঙ্গে সব কাজ করে।

–ডাউন টাউন যেতে হবে।

–কেন?

লুক্কা হাসতে হাসতে বলল- এই হল কারলোর ঠিকানা।

.

তিরিশ মিনিট কেটে গেছে। পিয়েরে দরজাটা খুলে দিল। দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে।

সিরিয়া ভ্যালি?

–হ্যাঁ।

–আমরা কি ভেতরে আসব?

–আপনারা কে?

একজন ওয়ালেট খুলল। তার পরিচয় পত্রটা লেখা আছে।

আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবব?

বলুন। আমার লুকোবার কিছু নেই। পিয়েরে ভাবল, রবার্ট বেরিয়ে গেছে। আমি এখন দর কষাকষি করতে পারব।

–আপনি রোম থেকে গতকাল রাতে এসেছেন? তাই তো?

–হ্যাঁ, এটা কি আইন বিরুদ্ধ কাজ?

লোকটার মুখে হাসি। আপনার সাথে এক মানুষ ছিল?

-হ্যাঁ।

–সে কে?

রাস্তায় তার সাথে আমার দেখা হয়েছে। সে নেপলস পর্যন্ত আসতে চেয়েছিল। দ্বি

তীয় মানুষটি প্রশ্ন করল- সে কি এখানে আছে?

–আমি জানি না। আমি তাকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছি। সে কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে।

–এই লোকটার নাম কি রবার্ট বেলামি?

–বেলামি? আমি জানি না। ও আমাকে নাম দেয়নি।

–ঠিক আছে। আমরা আবার দেখছি। লোকটি আপনাকে তলডিয়েতে তুলেছিল। আপনারা সারারাত একটা হোটেলে ছিলেন। পরের দিন সকালে ও আপনাকে একটা দামী ব্রেসলেট কিনে দিয়েছিল। ও আপনাকে একটা হোটেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এয়ারলাইনস এবং প্লেনের টিকিট ছিল। আপনি একটা গাড়ি ভাড়া করেছিলেন। নেপলসে এসেছেন।

পিয়েরে অবাক হয়ে গেছে। তার চোখে এবার ভয়ের আবরণ। তার মানে এই লোক দুটো সব জানে।

লোকটা কি চলে গেছে? নাকি ফিরে আসবে?

পিয়েরে এবার ভাবছে, কী বলা যেতে পারে? যদি সে বলে, রবার্ট চলে গেছে, তাহলে এরা বিশ্বাস করবে না। ওরা এখানে বসে থাকবে। রবার্ট ফিরে এলে তাকে ধরে ফেলবে। বলবে, তুমি কেন এই লোকটাকে সাহায্য করেছ।

শেষ পর্যন্ত পিয়েরে বলল- হ্যাঁ, ও ফিরে আসবে।

-কখন?

–আমি ঠিক জানি না।

–আচ্ছা, আমরা অপেক্ষা করছি। আমরা কি চারপাশটা একটু ঘুরে দেখব?

তারা এবার বন্দুক বের করল। না, বন্দুকটা দেখা যাচ্ছে।

তারা বাড়ির চারদিকে গেল মা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কে রে?

মি. জোনস-এর বন্ধু। তারা জোনসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

মা বললেন– এত সুন্দর মানুষ। ওরাও কি আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খাবে নাকি?

একজন বলল হা মা, কী আছে আজকের খাবারের তালিকায়?

.

পিয়েরের মনে নানা প্রশ্ন– আমি কি ইন্টারপোলকে আবার ডাকব? ইন্টারপোল পঞ্চাশ হাজার ডলার দেবে। রবার্টকে এই বাড়ি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু কী ভাবে? হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সকালের কথাবার্তা। দুজন মানুষকে ডাইনিং রুমে বসানো হয়েছে। তারা খাবার খাচ্ছে।

পিয়েরে বলল- এখানে বড্ড গরম। সে লিভিং রুমের দিকে হেঁটে গেল। সকালবেলা কথায় কথায় রবার্টের সঙ্গে তার আলোচনা হয়েছিল।

রবার্ট বলেছিল– বিপদের সম্ভাবনা থাকলে যেন জানলাটা আধখোলা করে রাখা হয়।

পিয়েরে তাই করল। তারপর টেবিলের দিকে এল। না, সে জানে না, রবার্ট কি ওই সংকেতটা মনে রাখবে?

রবার্ট বাড়িটার দিকে এগিয়ে আসছেন। এবার পালাতে হবে। অন্য একটা পরিকল্পনা। শেষ পর্যন্ত সফল হবে তো?

রবার্ট দেখতে পেলেন, সবকিছু সাধারণ মনে হচ্ছে। পিয়েরে কি এখন বাড়িতে আছে? ঝড়ির সামনে এসে হঠাৎ রবার্টের মনে হল, হা, ওই তো জানলাটা আর্ধেক খোলা। তার মানে? একটা বিপদের সম্ভাবনা। সঙ্কেত চিহ্ন কি?

তার মানে এখানে আর থাকা উচিত নয়।

রবার্ট আবার গাড়িটা চালিয়ে দিলেন। কোনো সুযোগ দেওয়া উচিত হবে না।

তারা ডাইনিং রুমে বসে আছে।

টেলিফোনটা বেজে উঠল।

–বেলামি কি ফোন করতে পারেন?

পিয়েরে বলল- হ্যাঁ, করতে পারেন? কিন্তু কেন?

রবার্ট টেলিফোনের দিকে চলে গেলেন। বললেন– হ্যালো পিয়েরে? আমি দেখলাম জানলাটা আধখোলা আছে।

এখন পিয়েরে কী করে কথা বলবে? রবার্টের কথা তার মনে পড়ে গেল পুলিশ আমাকে পেলে মেরে ফেলবে।

দুজন মানুষ তার দিকে তাকিয়ে আছে। তারা সব কথা বোধহয় শুনতে পাচ্ছে। আহা, পঞ্চাশ হাজার ডলার, কত ভালো জামাকাপড় আমি কিনতে পারব। রোম শহরে একটা ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট। রবার্ট মরে যাবে তাতে কী হয়েছে? পুলিশকে সে ঘেন্না করে। পিয়েরে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখল। বলল- রং নাম্বার।

রবার্ট শব্দটা শুনতে পেলেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। বুঝতে পারলেন, হয়তো এভাবেই পিয়েরে আমার জীবন বাঁচিয়ে দিয়েছে।

রবার্ট আবার গাড়িতে চড়ে বসলেন। বাড়িটার থেকে আরও দূরে চলে যেতে হবে। কিন্তু কোথায়? প্রধান বন্দরে যাওয়া উচিত হবে না। তিনি অন্য দিকে চলে গেলেন। সানটা লুসিয়া থেকে আরও দূরে। এখানে একটা কিয়সকে লেখা আছে- কিছুটা সময় এখানে কাটানো যাবে।

জিজ্ঞাসা করলেন পরবর্তী জাহাজটা কখন ছাড়বে? যেটা ইসূচিয়া যাবে?

–তিরিশ মিনিট।

ক্যাপ্রির জাহাজটা?

–পাঁচ মিনিট।

আমাকে একটা টিকিট দেবেন? আপনারা কেন অন্যদের মতো ইংরাজি বলেন না?

এই লোকটার চোখে কেমন একটা ভাব।

রবার্ট টিকিট নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি ক্যাপ্রিতে পৌঁছে যাবেন।

নৌকোটা এবার যাত্রা শুরু করবে। জলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাবে। কেউ রবার্টের দিকে তাকিয়ে দেখছে না। কিন্তু ব্যাপারটা পাল্টে ফেলতে হবে। এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হবে, যাতে সকলে রবার্টকে চিনে রাখতে পারে।

রবার্ট বারটেনডারের সাথে অযথা ঝগড়া শুরু করে দিলেন। ওদের মান খুব খারাপ এই বলে গালাগাল দিলেন।

বিশ্রী শব্দ উচ্চারণ করতে থাকলেন। ম্যানেজার ছুটে এসে বললেন-কী করছেন?

এখানে অনেক মহিলা যাত্রী আছেন, তাদের কথা ভেবে অন্তত চুপ করে থাকুন।

রবার্ট আরও চিৎকার করে বললেন– আপনি কার সাথে কথা বলছেন জানেন? আমি কমান্ডার রবার্ট বেলামি।

নৌকোটা ঠিক জায়গাতে পৌঁছে গেছে। রবার্ট তড়াক করে নৌকো থেকে নামলেন। এবার হোটেলের দিকে হেঁটে চললেন। এখানে অনেক স্মৃতি ছড়ানো আছে। একদা সুশানের সঙ্গে এখানে এসেছিলেন। রেস্টুরেন্টে খেয়েছিলেন। পথে হেঁটেছিলেন- সে সব স্মৃতি কি ভোলা যায়?

স্যাঁতসেঁতে একটা হোটেল। রিসেপশনিস্ট প্রথমে কিছুতেই ঘর দেবে না।

রবার্ট ঘুষি মেরে বললেন আমি কমান্ডার রবার্ট বেলামি। একটা ঘর আমাকে দিতেই হবে।

–ঠিক আছে, আপনি কতদিন থাকবেন কমান্ডার?

–এক সপ্তাহ।

–আপনার পাশপোর্ট কোথায়?

–পাশপোর্ট আমার লাগেজে আছে। আমি কয়েক মিনিটের মধ্যে আসছি।

রবার্ট বাইরে বেরিয়ে এলেন। রাস্তায় চলে গেলেন। হা, উদ্দেশ্যটা শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছে হয়তো।

রবার্ট আবার একটা বারে এসে বসলেন। নিখুঁত ইতালিয় ভাষায় কথা বলছেন। রবার্ট জানেন, এবার ওদের অনুসন্ধান শুরু হবে। মদ খেতে খেতে তিনি ইউরোপের মানচিত্রটা মনে মনে ভেবে নিলেন। কোথায় যাওয়া যায়? ইংল্যান্ডে গেলে কেমন হয়? সেখান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র? না, ফ্রান্সে ফিরে আর লাভ নেই। রবার্ট ভাবলেন। ইতালি থেকে কীভাবে– বেরিয়ে পড়ব?

আবার সুশানের কথা মনে পড়ল। তিনি বারের মালিকের সাথে কথা বললেন। তার ফোনটা ব্যবহার করলেন। দশমিনিট সময় লাগল। সুশানকে পাওয়া গেল।

–তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। ব্যাপারটা খুবই ভালো লাগবে। ইনজিনটা তৈরি হয়েছে। আমরা নেপলসে পৌঁছে যাব সকালবেলা। কোথায় তোমাকে পাব?

-না, ওই প্রমোদ তরণী এখানে এলে বিপদের আশঙ্কা। রবার্ট বললেন, প্যালিংজুম জায়গাটা মনে আছে, যেখানে আমরা হনিমুন কাটাতে গিয়েছিলাম।

কী বললে?

–আমি ভুল করে বলে ফেলেছি।

অন্যদিক থেকে আবার শোনো গেল- হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

তোমার জাহাজটা কি ওখানে আসবে?

একটুখানি ধরো আমি বলছি।

রবার্ট অপেক্ষা করলেন, সুশান টেলিফোনে ফিরে এলেন। তিনি বললেন–হ্যাঁ, ওখানে আমরা পৌঁছে যাব।

রবার্ট বললেন– ঠিক আছে।

মনে পড়ে গেল, ওই নিষ্পাপ মানুষদের মুখগুলির কথা। আঃ, এত বড়ো সমস্যায় আমাকে জড়িয়ে পড়তে হল।

সুশান মন্টে বাঙ্কসের দিকে তাকিয়ে বললেন- অবশেষে রবার্ট আসছে।

.

রোম শহর, পুলিশের হেডকোয়ার্টার। অনেকগুলো সংকেত ভেসে আসছে। চারজন মানুষ বসে কথা বলছেন।

রেডিও অপারেটর বললেন- আমরা সব কটা কণ্ঠস্বর রেকর্ড করেছি। আবার বাজিয়ে শোনাব?

কর্নেল সিজার তাকিয়ে আছেন ফ্রাঙ্ক জনসনের দিকে।

হ্যাঁ, আমি সেই অংশটা আবার শুনব, যেখানে দেখা করার কথা বলা আছে। মনে হচ্ছে, রবার্ট বোধহয় প্যালিংজুমের কথা বলেছে। এই জায়গাটা কি ইতালিতে?

কর্নেল সিজার মাথা নাড়লেন না, আমি কখনও ওই নামটাই শুনিনি। দেখতে হবে। ম্যাপের দিকে তাকাতে হবে।

.

নেপলসের ফার্ম হাউস, ফোনটা বেজে চলেছে। পিয়েরে উঠে গেল। একজন লোক বলল- এটাকে ধরতে হবে। সে ফোনের কাছে গিয়ে বলল- হ্যালো।

কণ্ঠস্বরটা শোনার চেষ্টা করল। তারপর তার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল- বেলামি ক্যাপ্রির দিকে চলে গেছে। চলো, আমরা ক্যাপ্লিতে যাই।

পিয়েরে দেখল, দুজন অত্যন্ত দ্রুত দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। পিয়েরে ভাবল, না, ভগবান আমাকে কখনও এত টাকা দেবে না। আঃ, লোকটা বোধহয় পালিয়ে গেল।

ইস্টিয়া এসে গেছে, রবার্ট মানুষের মধ্যে মিশে গেলেন। কারও সাথে যোগাযোগ করা উচিত নয়। তিরিশ মিনিট কেটে গেছে। এবার আসল জায়গা। রবার্ট টিকিট বুথের কাছে। চলে গেলেন। বুথের গায়ে একটা কথা লেখা আছে।

রবার্ট বললেন আমি সারা দিন ঘুরে বেড়াব, টিকিট লাগবে।

এটা হল মেন লাইন। এবার?

কোথায় যাব আমি? ভাগ্যের সহায়তা পাব কি?

.

রাস্তাঘাটে অনেক মানুষের ভিড়। চাষীরা তাদের জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে। দুপাশে গোরুর মাংসের দোকান। রবার্ট একটা মোটা মানুষের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন– আমাকে ক্ষমা করবেন মঁসিয়ে। ফরাসি উচ্চারণে কথা বলছেন। আমি একটা জায়গায় যেতে চাইছি, সিটিভেসিয়াতে। কীভাবে যাব বলবেন কি?

লোকটা একটা ট্রাকের দিকে তাকিয়ে বলল– ওইখানে যান, উনি হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারেন।

রবার্ট পরর্বতী ট্রাকের কাছে গিয়ে বললেন- মঁসিয়ে, সিটিভেসিয়ায় যাবার কোনো উপায় আছে?

লোকটা বলল- হতে পারে। আমি কী সুযোগ পাব। কত টাকা দেবেন?

রবার্ট লোকটার হাতে এক হাজার লিরা তুলে দিলেন।

–এত টাকাতে আপনি নিজে একটা প্লেনের টিকিট কিনতে পারেন।

রবার্টের মনে পড়ল, হ্যাঁ, ভুল হয়ে গেছে। তিনি বললেন আমার কয়েকজন পাওনাদার আছে, এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে, আমি ট্রাকে চড়ে যাব।

-ঠিক আছে, আমি বুঝতে পেরেছি। আমরা এক্ষুনি ছাড়ব।

রবার্টের মনের উৎকণ্ঠা দূর হয়ে গেল।

কী ভাবব এখন আমি? রবার্ট বললেন আমি কি একটু শোবার জায়গা পাব?

–হ্যাঁ, যদি শুতে পারেন, আমার আপত্তি নেই।

বাক্সে পরিপূর্ণ, লোকটা রবার্টের দিকে তাকাল। তারপর ভেতরে চলে গেল। রবার্ট বাক্সের আড়ালে শরীরটাকে লুকিয়ে রাখলেন। বড্ড ক্লান্ত। কখন থেকে এই যাত্রা শুরু হয়েছে। ঘুমোবার সময় পাননি।

ট্রাক এগিয়ে চলেছে। ড্রাইভার তার এই নতুন প্যাসেঞ্জার সম্পর্কে অনেক কিছু ভাবছে। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, লোকটা মার্কিন দেশের বাসিন্দা। নিশ্চয়ই কেউ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ফরাসি উচ্চারণে কথা বলছে। কিন্তু, না, আমেরিকানের মতো তার পোশাক পরিচ্ছদ। তার ওপর নজর রাখলে কী হয়? ভালো একটা পুরস্কার পাওয়া যেতে পারে।

এক ঘন্টা কেটে গেছে। ট্রাকটা হাইওয়ে দিয়ে চলেছে। ড্রাইভার গ্যাস পাম্পের সামনে দাঁড়াল। বলল, পেট্রল ভরে দাও তো। সে পেছন দিকে চলে গেল। দেখল, হ্যাঁ, লোকটা ঘুমিয়ে আছে।

ড্রাইভার রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ল। পুলিশ স্টেশনে ফোন করল।

.

৪৭.

কর্নেল সিজার, ইয়েস, ড্রাইভারকে বললেন- হ্যাঁ, মনে হচ্ছে ও-ই বোধহয় হয় আমাদের হারানো মানিক। ভালো করে শোনো, লোকটা সাংঘাতিক। আমি কী বলছি, বুঝতে পারছ?

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

–হ্যাঁ, স্যার।

–তুমি এখন কোথায়?

–সিটিভেসিয়ার কাছে একটা পেট্রল পাম্পে। হাইওয়েতে।

–লোকটা কি এখনও তোমার ট্রাকে আছে?

–হ্যাঁ। কথাগুলো ড্রাইভারকে অবাক করে দিয়েছে।

আহা, আমি কেন আমার ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকলাম না।

–এমন কাজ করো না, যাতে লোকটা সন্দেহ করতে পারে। ট্রাকে চলে যাও। সিটি ভেসিয়ার দিকে এগিয়ে চলল। তোমার লাইসেন্স নম্বরটা আমাকে দাও। ট্রাকটা কেমন দেখতে।

ড্রাইভার সবকিছু বলল।

-ঠিক আছে, দেখা হবে।

কর্নেল সিজার কর্নেল জনসনের দিকে তাকিয়ে বললেন- অবশেষে পাওয়া গেছে। রাস্তা বন্ধ করে দাও। তিরিশ মিনিটের মধ্যে আমরা হেলিকপ্টারে করে সেখানে পৌঁছে যাব।

ড্রাইভার রিসিভারটা নামিয়ে রাখল। সে বুঝতে পারল, তার হাত ঘামে ভিজে গেছে। ট্রাকের কাছে এগিয়ে এল। সে ভাবল, লোকটা কি আমাকে গুলি করবে? না, তা কেন হবে? অনেক টাকা পুরস্কার পাব। ট্রাকটাকে সে এগিয়ে নিয়ে গেল।

পঁয়ত্রিশ মিনিট কেটে গেছে। হেলিকপ্টারের শব্দ শোনা গেছে। লোকটা ওপর দিকে তাকাল। হ্যাঁ, পুলিশের হেলিকপ্টার। হাইওয়ের ওপর উঠে আসছে। রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। একের পর এক গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। পুলিশের হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। হেলিকপ্টারটা রাস্তার একধারে থামল। সিজার এবং কর্নেল ফ্রাঙ্ক নেমে এলেন।

ড্রাইভার ট্রাকটার গতি আস্তে করে দিয়েছে। বলল– লোকটা ওখানে শুয়ে আছে।

সিজার চিৎকার করলেন– খুলে দাও।

ট্রাকটা খোলা হল।

কর্নেল জনসন বললেন- তোমরা কেউ গুলি করবে না। আমি নিজেই দেখব।

তিনি ট্রাকের পেছন দিকে চলে গেলেন।

রবার্ট বেরিয়ে আসুন। খেলাটা শেষ হয়ে গেছে।

না, কোনো উত্তর নেই।

রবার্ট, আমি পাঁচ সেকেন্ড সময় দেব।

নীরবতা, কোনো উত্তর নেই।

সিজার তার লোকদের দিকে তাকলেন।

কর্নেল জনসন বললেন– না, কিছু বুঝতে পারছি না।

অনেক দেরি হয়ে গেছে কি?

পুলিশ গুলি করতে শুরু করেছে। অটোমেটিক পিস্তলের শব্দ। স্পিংটা ছিটকে পড়ছে। দশ সেকেন্ড হয়ে গেছে। গুলি থেমে গেল, কর্নেল ফ্রাঙ্ক জনসন ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারপর? বাক্সগুলো সরিয়ে দিলেন।

সিজারের দিকে তাকিয়ে উনি বললেন- না, পাখি উড়ে গেছে।

.

উনিশতম দিন, সিভিটাভেচিয়া, ইতালি।

এটা একটা পুরোনো সমুদ্র বন্দর। রোমের জন্যই করা হয়েছিল। মাইকেল অ্যাঞ্জেলো এখানে একটা সুন্দর পোর্ট দেখেছিলেন, ১৫৩৭ সালে। একসময় এই শহরের বন্দর ছিল ইউরোপের ব্যস্ততম বন্দর। রোম থেকে সার্ডিনিয়া পর্যন্ত বিরাট অঞ্চলে ব্যবসা এর মাধ্যমেই হত।

প্রমোদ তরণী অপেক্ষা করছে। ঠিক জায়গাতে। আহা, হনিমুনের কথা মনে পড়ছে। এই হল সেই এলবা হোটেল। তিনদিন তিনরাত, সুশান ভাবলেন। সুশান বলেছিলেন, প্রিয়, তুমি কি সাঁতার কাটবে?

রবার্ট বলেছিলেন– না, আমি নড়তে চড়তে পারছি না।

আবার সুশানের মুখে হাসি। সেসব দিন কোথায় হারিয়ে গেছে।

এখন কী করতে হবে? এলবাতে পৌঁছোত হবে।

শেষ পর্যন্ত রবার্ট আমার হাতের মুঠোয়, ফেরিবোটের সাহায্য নিতে হবে।

সুশান ভাবছিলেন, রবার্ট ফেরিবোটের ল্যান্ডিং-এর দিকে এগিয়ে চলেছেন। মনে হল, একটা সেডান দাঁড়িয়ে আছে, কিছুটা দূরে। তিনি থেমে গেলেন। হ্যাঁ, তাতে লাইসেন্স প্লেট লাগানো আছে। তার মানে? অন্য দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। চারপাশে ট্যুরিস্টদের ভিড়। বুঝতে পারলেন, সাদা পোশাকের ডিটেকটিভরা তার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। এখন কী হবে? বিপদের গন্ধ পেয়েছেন। আমি কি ট্রাক ড্রাইভারকে বলেছিলাম, আমি কোথায় যাচ্ছি?

আঃ, ব্যাপারাটা না বললেই ভালো হত।

ট্রাকে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ট্রাকটা কেন থেমে গেল? দেখলাম, ড্রাইভারটা গ্যাস স্টেশনে ঢুকে পড়েছে। ফোন করছে। আমি বুঝতে পেরেছি, এখনই আমাকে পালাতে হবে। আমি আর একটা ট্রাকে চড়ে বসি। অবশেষে এই শহরে এসে পৌঁছেছি।

তার মানে? আমি নিজেই নিজের ফঁদে ধরা পড়তে চলেছি। ওরা আমাকে এখানেও ধাওয়া করেছে। হ্যাঁ, কোনো একটা নৌকোয় পা দিতে হবে।

আর দেরী করলে চলবে না।

রবার্ট সেখান থেকে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর? একটা বিরাট বাড়ির সামনে এসে পড়লেন। লেখা আছে- ফেয়ার গ্রাউন্ডে চলে আসুন, সবকিছু পাবেন। খাবার, আনন্দ, খেলাধুলো- সবকিছু।

রবার্ট বুঝতে পারলেন, এবার পালাবার পথ পাওয়া গেছে।

.

৪৮.

ফেয়ার গ্রাউন্ড শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে। বেলুন উড়ছে, মানুষজন আনন্দ করছে। আকাশে রামধনু রং।

রবার্ট একজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য সামনে এগিয়ে গেলেন।

-এবার কি রেস শুরু হবে?

–হ্যাঁ, কখনও বেলুনে চড়েছেন?

না।

আহা, লেক কোমোর ওপর দিয়ে সেই বেলুন চড়ে যাওয়ার দিন। বেলুনটা পড়ে গিয়েছিল। লেকের জল স্পর্শ করতে হয়েছিল।

সুশান চিৎকার করে বলেছিল– আমরা মরে যাব।

রবার্টের মুখে হাসি, আমরা কখনও মরব না।

লোকটা তখনও বলে চলেছে– এটা এক দারুণ খেলা।

কখন এই রেসটা শুরু হবে? এটা কোথায় শেষ হবে?

যুগোশ্লোভিয়া। আজ আবহাওয়াটা ভালোই আছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেলুনগুলো ছেড়ে দেবে। সকালবেলা বেলুনে চড়াটা ভালো। তখনই চড়তে ভালো লাগে।

রবার্ট শান্তভাবে বললেন- তাই নাকি? যুগোশ্লোভিয়াতে একবার তিনি গিয়েছিলেন।

রবার্ট দেখলেন আরও বেলুন এসে গেছে। আঃ, এমন লড়াই?

রবার্ট জানতে চাইলেন- আমি কি একটা বেলুন দেখতে পারি?

–হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেখুন?

রবার্ট একটা হলদে-লাল বেলুনের দিকে এগিয়ে গেলেন। এর ভেতর প্রোপেন গ্যাস পুরে দেওয়া হয়েছে। দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে।

যারা কাজ করছিলেন তাদের সাথে রবার্ট কথা বলার চেষ্টা করলেন। তিনি বাসকেটের ওপর হেঁটে গেলেন। বেলুনে ঢুকে পড়লেন। এক্ষুনি বেলুনটা যাত্রা করতে শুরু করবে কি? তিনি সব কিছু দেখলেন। আলটোমিটার, চার্ট, পাইরোমিটার, মনিটর- সব কিছু। হ্যাঁ, এখানে চড়লে কোনো অসুবিধা হবে না তার।

রবার্ট বললেন আমাকে নীচে নামিয়ে দেবে?

যে লোকটা বেলুন তৈরি করছিল, সে বলল, ভয় পাবেন না। এখানে আলটোমিটার আছে। আমরা এক হাজার ফুট উঁচুতে আসতে পারব। যুগোশ্লোভিয়ায় দেখা হবে। আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?

-শুনতে পাচ্ছি।

বেলুনটা ক্রমশ ওপর থেকে আরও ওপরে চলে যাচ্ছে। এলবাকে দূরে রেখে আরও পশ্চিমদিকে। রবার্ট এখানে তাকিয়ে দেখছেন না। যে কোনো সময় বাতাসের গতি

পরিবর্তন হতে পারে। অন্য বেলুনগুলো এখনও যাত্রা শুরু করোনি। কিন্তু রবার্টকে এখনই পালাতে হবে। কত দূরে? দুশো ফুট সাতশো ফুট- নশো ফুট এগারোশো ফুট...

পনেরো শ ফুট উচ্চতায় পৌঁছোবার পর বাতাস একটু শান্ত হয়েছে। বেলুনটা এখন শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রবার্ট আরও কতগুলো ব্যালাস নামিয়ে দিলেন। এবার বাতাসের গতিপথ পরীক্ষা করতে হবে।

দু-হাজার ফুট উঁচুতে গিয়ে রবার্ট বুঝতে পারলেন যে, বাতাস আবার এলোমেলো বইতে শুরু করেছে। ঝড় এলো বোধহয়।

অনেক দূরে রবার্ট অন্য বেলুনগুলো দেখতে পেলেন। সেগুলো যুগোশ্লোভিয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে। কোনো শব্দ নেই, বাতাসের সামান্য শব্দ ছাড়া। সবকিছু শান্ত। তা হলে? শেষ পর্যন্ত আমি কি পালাতে পারলাম?

বেলুনে বসে তুমি কখনও কাউকে ভালোবেসেছ? সুশান জানতে চেয়েছিল। রবার্টের মনে হল, এসো চেষ্টা করা যাক।

পৃথিবীর কেউ এভাবে ভালোবাসা দেয়নি ডার্লিং, আমি বলতে পারি। রবার্ট বলেছিলেন।

রবার্ট এখন সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছেন। তাসকানির দিকে পৌঁছে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। এটা কি এলবা?

নেপোলিয়ানকে একসময় এখানে আটকে রাখা হয়েছিল। রবার্ট ভাবলেন। আর আমি? এক নতুন নেপোলিয়ান?

অনেক দূরে দেখা গেল কালো মেঘের দল। রবার্ট বেলুনটার গতি পরিবর্তন করলেন। নীচে সবুজ ঘাস দেখা যাচ্ছে। তাসখন্দ বাড়িও দেখা যাচ্ছে। গ্রানাইটের তৈরি দু-একটা পাথর। তিনি আস্তে আস্তে বেলুনটাকে পাহাড়ের পাদদেশে নিয়ে এলেন। শহর থেকে একটু দূরে। না, কারও চোখে পড়ার সামান্য সম্ভাবনা নেই। এখান থেকে রাস্তা শহরের দিকে চলে গেছে।

রবার্ট বললেন- আমাকে শহরে নিয়ে যাবেন?

-হ্যাঁ, এক্ষুনি আসুন।

ড্রাইভারকে দেখে মনে হল, অনেক বয়স হয়েছে, আশির কোঠা পার হয়েছে। মুখে সময়ের ছাপ।

-একটু আগে একটা বেলুন দেখলাম। এর মধ্যে আপনি ছিলেন?

না, রবার্ট বললেন।

বেড়াতে এসেছেন?

না, আমি রোমে যাব। এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম।

আমি একবার রোমে গিয়েছিলাম।

কেউ কোনো কথা বলেননি।

শেষ পর্যন্ত তারা কোরভোফেরারিওতে পৌঁছে গেলেন। এবার একমাত্র শহর। রবার্ট গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন।

দিনটা ভালোভাবে কাটুক। ভদ্রলোক ইংরাজিতে বললেন।

হায় ঈশ্বর, ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দারা এখানে এসে গেছে।

রবার্ট এগিয়ে গেলেন। প্রধান রাস্তা ধরে। ট্যুরিস্টদের ভিড়। বেশির ভাগই পরিবার নিয়ে এসেছেন। কোনো কিছুই পরিবর্তন হয়নি। খালি আমি সুশানকে হারিয়ে ফেলেছি, আর ছটা দেশের সরকার আমার পেছনে গুপ্তচর লাগিয়ে দিয়েছে।

তিনি একটা বাইনোকুলার কিমলেন। জলের ধারে চলে গেলেন। মেরিনা রেস্টুরেন্টে বসলেন। বন্দরের পরিষ্কার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। না, এখানে পুলিশের কোনো বোট নেই। পুলিশের লোককে দেখা যাচ্ছে না। তার মানে, এখান থেকে আমি যদি ওই প্রমোদ তরণীতে যাই? যেখানে সুসান আমার জন্য অপেক্ষা করছে? তাহলে কেমন হয়?

.

সাদা মদ খেতে ব্যস্ত এখন তিনি। কখন হ্যালিকন আসবে, তারই অপেক্ষা করছেন। পরিকল্পনাটা আবার ভালোভাবে ভাবতে হবে। কোথায় যাওয়া যেতে পারে? মারসেইল?

সেখান থেকে প্যারিস? প্যারিসে আমার এক বন্ধু আছে- লিপো। লিপো আমাকে সাহায্য করতে পারবে।

ফ্রানসেসকো সিজারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল–আপনি কি চিনাদের সঙ্গে ব্যবসা করছেন?

–না, লিপো ছাড়া আর কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না।

লিপো, একসময় চিনাদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। গুপ্তচরবৃত্তির কাজ।

রবার্ট ভাবলেন, কীভাবে এই ফাঁদ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসব।

অপেক্ষার প্রহর ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে। হ্যালিকন কি এই পোর্টে আসবে? না, যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয়। নাকি আমিই সমুদ্রে চলে যাব।

.

ফরাসি সামুদ্রিক মন্ত্রক অফিস। কর্নেল সিজার এবং কর্নেল জনসন কথা বলছেন। তাঁরা মেন অপারেটরকে বললেন- তাইসিওয়ানের হ্যালিকনের সঙ্গে আর কথা বলা সম্ভব হয়েছে?

–না, স্যার। শেষ যা কথা সে রিপোর্ট তো আমি দিয়েছি।

কথা চালাতে থাকুন। কর্নেল সিজার কর্নেল জনসনের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন যে সময় কমান্ডার বেলামি হ্যাঁলিকনে উঠবেন, সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরা হবে।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

–আমি চাইছি আগেই ধরে ফেলতে।

না,

আমরা ঠিক জায়গায় ধরব।

কর্নেল সিজার এবং কর্নেল জনসন লিস্টের দিকে তাকালেন শব্দ হচ্ছে। একটির পর একটি নাম ভেসে আসছে। কিন্তু আসল লোকটা কোথায়? বুঝতে পারা যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত কে যেন বলল, তাকে শেষবারের মতো দেখা গেছে এলবাতে।

কর্নেল সিজার এবং কর্নেল জনসন অবাক হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। এলবা? হায় যিশু, এ জায়গাটা আবার কোথায়?

.

কুড়ি নম্বর দিন, এলবা দ্বীপ।

প্রথমে, মনে হয়েছিল, দূর আকাশে একটুকরো স্মৃতির ছবি। তারপর তা সকালের উজ্জ্বল আলোতে ভাস্বর হয়ে উঠল। বাইনোকুলার দিয়ে তাকিয়ে আছেন রবার্ট, দেখতে পাচ্ছেন, হ্যালিকন ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে আসছে। না, এবার আর কোনো ভুল নেই। কারণ এর মতো দেখতে আর একটা জাহাজও বোধহয় নেই।

রবার্ট অত্যন্ত দ্রুত সাগরসৈকতে চলে এলেন। একটা মোটরবোট ভাড়া করতে হবে।

-শুভ প্রভাত।

মোটরবোটের মালিক বললেন- আপনি কি এখনই যাবেন?

-হ্যাঁ।

কতক্ষণ সময় লাগবে?

দু-তিন ঘণ্টার বেশি লাগবে না।

রবার্ট টাকা তুলে দিলেন। বোটে গিয়ে বসলেন।

লোকটি বলল- সাবধানে চালাবেন কিন্তু।

রবার্ট বললেন- হ্যাঁ, কোনো চিন্তা নেই।

বোটটা এগিয়ে চলেছে। কিন্তু কিছুটা সময় লাগবে। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সুশান এবং মন্টে বাঙ্কস ডেকে দাঁড়িয়ে আছেন। সুশান হাত নাড়লেন। রবার্ট তার মুখে উদ্বিগ্নতার চিহ্ন দেখতে পেলেন। ছোট্ট বোটটা এবার প্রমোদ তরণীর কাছে এসে গেছে।

একটা মই নেমে এসেছে।

সত্যি এক অসাধারণ প্রমোদ তরণী। ২৮০ ফুট লম্বা, ভালো ভালো কেবিন আছে। অতিথিদের জন্য আটটা ডবল সেট। ষোলো জন ক্রু থাকার জন্য আলাদা কেবিন। ড্রয়িং রুম আছে, ডাইনিং রুম, অফিস, সেলুন, সুইমিং পুল।

ভারী সুন্দর আধুনিক ইনজিন।

সুশান বললেন- তোমাকে শেষ পর্যন্ত ধরতে পেরেছি।

রবার্টের চোখে মুখে হাসি। কিন্তু এখনও মনে দুর্ভাবনা।

আহা, সুশান আগের মতোই সুন্দরী, রবার্ট ভাবলেন। কিন্তু, সুশান এমন হল কী করে? এখন তো তার দুঃখ-দুঃখ মুখে দাঁড়িয়ে থাকার কথা।

রবার্ট মন্টের দিকে তাকালেন ভালো লাগল, শেষ পর্যন্ত আমি আসতে পেরেছি।

মন্টে হাসছেন- হ্যাঁ, আপনাকে সাহায্য করতে পারলাম। আহা, এই মানুষটি যেন এক সন্ন্যাসী? আপনার পরিকল্পনা কী?

মারসেইলের দিকে যেতে চাইছি। সেখানে আমায় ছেড়ে দিলেই হবে।

সাদা ইউনিফর্ম পরা একটা মানুষ এগিয়ে এসেছে। বছর পঞ্চাশ বয়স। ছোটো দাড়ি আছে।

–ইনি ক্যাপটেন সিমসন। আর ইনি.. মন্টে বাঙ্কস রবার্টের দিকে তাকালেন।

–স্মিথ, স্মিথ।

মন্টে বললেন আমরা মারসেইলের দিকে যাব, ক্যাপটেন।

–আমরা এলবার দিকে যাব না?

না।

ক্যাপটেন সিমসন বললেন- ঠিক আছে। কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণতা।

রবার্ট বুঝতে পারলেন, ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

মন্টে বাঙ্কস বললেন– আমরা নীচে যাব।

তারা সেলুনে এসে বসলেন।

মন্টে বললেন– কীভাবে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করা যায়?

রবার্ট বললেন–হ্যাঁ, এই ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছু না জানাই ভালো। আমি একটা কথাই বলতে পারি, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমি একটা রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার। আমি অনেক কিছু জেনে ফেলেছি। তাই আমাকে তাড়া করা হচ্ছে। যদি ওরা আমাকে খুঁজে পায়, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।

সুশান এবং মন্টে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

–কিন্তু ওরা নিশ্চয়ই এই প্রমোদ তরণীতে আসবে না, রবার্ট বললেন, আমাকে বিশ্বাস করুন মন্টে, যদি অন্য কোনো উপায় থাকত, আমি আপনাকে বিব্রত করতাম না।

রবার্ট সেই সব মানুষগুলোর কথা ভাবলেন। যাদের মৃত্যু হয়েছে, অথবা যাদের খুন করা হয়েছে। না, সুশানের ক্ষেত্রে এমন কোনো ঘটনা ঘটুক তা তিনি কখনও চাইছেন না। তিনি বললেন-হা, আপনারা যেভাবে আমায় সাহায্য করেছেন, আমি ভাবতেই পারছি না।

মন্টে বললেন– না-না, এত কিছু বলার দরকার নেই।

এবার প্রমোদ তরণী পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু করছে।

–আমি ক্যাপটেনের সাথে একটা কথা বলব, কেমন?

.

ডিনার শেষ হল। রবার্ট দুটো ব্যাপার বুঝতে পারছেন না, একটা টেনশন থাকা দরকার। কিন্তু তা নেই কেন? রবার্ট শেষ পর্যন্ত মনে করলেন, দুজনের মধ্যে একটা গোপন ষড়যন্ত্র হচ্ছে নাকি? এখান থেকে আমাকে অতি দ্রুত পালাতে হবে।

.

তারা দুজনে দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে ড্রিঙ্ক নিয়ে। ক্যাপ্টেন সিমসন এসেছেন।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

রবার্ট বললেন- আমরা কখন মাইসেইলে পৌঁছোব?

-কাল বিকেলের মধ্যে।

ক্যাপটেন সিমসনের কথার মধ্যে কিছু একটা ব্যাপার আছে, রবার্ট অবাক হয়েছেন। ক্যাপটেন কি ইচ্ছে করেই মিথ্যে কথা বলছেন? রবার্টের মনে হল।

রাত্রি এগারোটা। মন্টে ঘড়ির দিকে তাকালেন। সুশানকে বললেন– এবার যেতে হবে।

সুশান রবার্টের দিকে তাকিয়ে বললেন- হ্যাঁ।

তারা উঠলেন।

মন্টে বললেন- কেবিনে যান। সেখানে গিয়ে একটু বিশ্রাম করুন।

ধন্যবাদ।

–শুভরাত্রি রবার্ট।

শুভরাত্রি, সুশান।

রবার্ট দাঁড়িয়ে থাকলেন। কী আশ্চর্য, ভালোবাসার মেয়েটি এখন অন্য পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী। না, প্রতিদ্বন্দ্বী তো নয়, আমি হেরে গেছি। উনি জিতে নিয়েছেন গোটা বিশ্ব।

ঘুমের মধ্যে অদ্ভুত কতগুলি স্বপ্ন। রবার্ট বুঝতে পারছেন, দেওয়ালের ওধারে কী লেখা আছে। ভালোবাসার মেয়েটি এখন এক পুরুষের সাথে প্রেমের খেলায় মত্ত। সুশান সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে বিছানাতে শুয়ে আছে। সে কখনও নাইট গাউন পরতে ভালোবাসাত না। রবার্ট বুঝতে পারলেন, তার দণ্ড আজ শক্ত হতে শুরু করেছে। মন্টেকে এখন পাগলের মতো সুশান ভালোবাসছে। না, সুশান এখন একা আছে? সুশানের কথা বারবার মনে পড়ছে। কেন? না, এখন নতুনভাবে জীবনটা শুরু করতে হবে। আমি আর কখনও সুশানকে দেখতে পাব না।

সকাল হবার একটু আগে ঘুমের আশ্রয়ে রবার্ট পৌঁছে গেলেন।

.

পুলিশ হেডকোয়ার্টারের কমিনিউকেশন রুম। র‍্যাডারের শব্দ হচ্ছে। কর্নেল সিজার কর্নেল জ্যাকসনের দিকে তাকিয়ে বললেন- হ্যাঁ, এরপর আমরা এলবার দিকে এগিয়ে যাব। আর বেশিক্ষণ নয়, হ্যাঁলিকনে গেলেই তাকে পাওয়া যাবে।

.

একুশ নম্বর দিন।

সকালবেলা, রবার্ট ডেকে দাঁড়িয়ে আছেন। শান্ত সমুদ্র। ক্যাপ্টেন সিমসন বললেন শুভ সকাল। আবহাওয়া ভালোই আছে মি. স্মিথ। আমরা তিনটের মধ্যে মারসেইলে পৌঁছে যাব। সেখানে কি বেশিক্ষণ থাকব?

রবার্ট বললেন– আমি ঠিক জানি না। রবার্ট আবার সিমসনের দিকে তাকালেন। লোকটার মধ্যে এমন একটা আচরণ কেন? রবার্ট প্রমোদ তরণীর এককোণে চলে গেলেন। আকাশের দিকে তাকালেন। কিছু দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, এর আগে অনেকবার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি তার প্রাণ বাঁচিয়েছে। কিন্তু কোথাও একটা বিপদের ঘণ্টা বাজছে।

.

আকাশের সবকিছু হারিয়ে গেল। ইতালিয় নেভি এবার খুব কাছাকাছি এসে গেছে।

.

সুশান ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে আছেন। সমস্ত শরীরে বিবর্ণতা।

মন্টে জানতে চাইলেন- সুশান, তোমার ভালো ঘুম হয়নি?

তার মানে? ওঁরা এক কেবিনে শুয়ে থাকেননি কেন? রবার্টের মনে হল, এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো একটা সমস্যা আছে। আমি আর সুশান সবসময় এক জায়গায় শুতাম। তার নগ্ন দেহটা আমাকে জড়িয়ে থাকত। নাঃ, এ ব্যাপার নিয়ে ভাবনা করব না।

হ্যালিকনের পাশে একটা ফিশিং বোট এগিয়ে চলেছে। সেখানে টাটকা মাছ আছে।

সুশান জিজ্ঞাসা করলেন– লাঞ্চে ফিশ ভালো লাগবে?

দুজনেই মাথা নাড়লেন– হ্যাঁ।

তারা ফিশিং বোটের কাছে পৌঁছে গেলেন।

ক্যাপটেন সিমসন এগিয়ে এলেন।

রবার্ট জানতে চাইলেন- আমরা কখন পৌঁছোব?

দু-ঘন্টার মধ্যে মি. স্মিথ, মারসেইল খুব সুন্দর বন্দর। সেখানে আগে কখনও গেছেন?

রবার্ট জবাব দিলেন- হ্যাঁ, আমি শুনেছি বন্দরটা খুবই ভালো।

.

কমিউনিকেশন রুম, পুলিশ হেডকোয়ার্টার। দুজন কর্নেল, এবার শেষ মেসেজটা পড়ছেন হ্যালিকনে পৌঁছোত হবে।

কর্নেল সিজার জানতে চাইলেন হ্যালিকন এখন কোথায়?

মারসেইল থেকে দূরে, দুঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে।

–আমাদের জাহাজটাকে অর্ডার করো, এখনই যেন এগিয়ে যায়।

তিরিশ মিনিট কেটে গেছে। ইতালিয়ান নেভি জাহাজ স্টাম্বলি এগিয়ে চলেছে, হ্যালিকনের কাছে এসে গেছে। সুশান এবং মন্টে কেবিনে বসে আছেন। তারা দেখতে পাচ্ছেন ওই জাহাজটাকে।

লাউডস্পিকারে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল- হ্যালিকনে আমরা আসছি।

সুশান এবং মন্টে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

ক্যাপটেন সিমসন ছুটে এসেছেন মি. বাঙ্কস?

হা, ইনজিন বন্ধ করে দিন।

–ঠিক আছে।

এক মিনিট, ইনজিন বন্ধ হয়ে গেল। প্রমোদ তরণী এখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

সুশান এবং তার স্বামী তাকিয়ে আছেন আকাশের দিকে।

দশ মিনিট কেটে গেছে। হ্যালিকনের কাছে অনেক নাবিক পৌঁছে গেছেন।

নেভাল অফিসার সবার আগে আসছেন। তিনি এক লেফটেন্যান্ট কমান্ডার। তিনি বললেন- আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য দুঃখিত, মি. বাঙ্কস। ইতালিয় সরকার বিশ্বাস করে যে, আপনি এমন কিছু কাজ করেছেন, যার ভেতর সন্দেহ আছে। আপনার এই জাহাজটা একবার অনুসন্ধান করব।

সুশান দাঁড়িয়ে আছেন। নাবিকরা চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছেন। কেউ কেউ ডেকে চলে গেছেন। কেউ কেবিনের তলায়।

-কেউ কোনো কথা বলবেন না।

তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। বিশ মিনিট কেটে গেছে। আবার সকলে মেন গেটে এসেছেন।

একজন বললেন- কমান্ডার, তার কোনো চিহ্ন নেই।

–ঠিক বলছেন?

–এখানে কোনো প্যাসেঞ্জার নেই। আমরা সব ক্রু-কে পরীক্ষা করেছি।

কমান্ডার হতাশ এখন কীভাবে জবাবদিহি করবেন।

উনি মন্টে এবং সুশানের দিকে তাকালেন– ক্যাপটেন সিমসনও দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন, না, আপনাকে দুঃখ দিলাম, এর জন্য আমরা দুঃখিত।

কমান্ডার?

–হ্যাঁ?

–যে মানুষটিকে আপনারা খুঁজছেন, সে একটা ফিশিং বোটে চেপে চলে গেছে। মনে হয়, অতি সহজে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। সরকারী জাহাজ এখন মারসেইল-এর দিকে এগিয়ে চলেছে। লেফটেন্যান্ট কমান্ডার নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারছেন না। কীভাবে জবাব দিহি করবেন? কমান্ডার রবার্ট বেলামিকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

ব্রিজের ওপর থেকে নেভিগেশন অফিসার বললেন-কমান্ডার, আপনি এখানে আসবেন কি?

লেফটেন্যান্ট কমান্ডার অতি দ্রুত চলে গেলেন।

অনেক দূরে মারসেইলের বন্দর দেখা যাচ্ছে। অনেকগুলো মাছ ধরার জাহাজ এগিয়ে চলেছে। একই রকম, অন্তত একশোটা হবে। এর মধ্যে কমান্ডার বেলামি কোনটাতে আছেন!

.

৪৯.

একটা গাড়ি নেওয়া হল, মারসেইলে। তারপর? সামনের দিকে এগিয়ে চলা। শেষ পর্যন্ত রবার্ট কি সফল হতে পারবেন?

লিপোর সঙ্গে দেখা করত হবে। লিপোকে আগেই ফোন করা ছিল। কথাবার্তা বলতে হবে। রবার্ট জানেন, ফোনের লাইনটাকে ধরে ফেলা হয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে এই ফোন কলটা আসবে, লিপো এমনই সুনিশ্চিত।– রবার্ট হেঁটে চলে গেলেন। এর আগে এই পথে সুশানের সঙ্গে এসেছিলেন। সুশান একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। কিছু জিনিসপত্র কিনতে চেয়েছিলেন। পোশাক পরিচ্ছদ।

মনে পড়ে যাচ্ছে অনেক কথা।

অল্পবয়সী একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। বলল– পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক পেলে তোমার কেমন লাগে?

কী করতে হবে?

রবার্ট কাগজে কী যেন লিখলেন। ছেলেটির হাতে তুলে দিলেন, সঙ্গে পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক।

–এটা লা মার্টিনে নিয়ে যাও।

–আমি যাচ্ছি।

রবার্ট দেখলেন, ছেলেটি বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। একটা বিজ্ঞাপন দিতে হবে। কাল সকালের সংবাদপত্রে। বলা হবে, চিলি, বাবা খুব অসুস্থ, এসো মা।

এখন অপেক্ষা করতে হবে। কোনো হোটেলে থাকা উচিত হবে না। সব হোটেলকে, নিশ্চয়ই সতর্ক করা হয়েছে।

রবার্ট একটা ট্যুর বাসে উঠে বসলেন। একদম কোণে বসে থাকলেন চুপচাপ। অনেকে লাক্সেনবার্গ গার্ডেন বেড়াতে যাবে। লুভারেতে, নেপোলিয়ানের সমাধি। আরও কত কী? কত স্মারকচিহ্ন।

রবার্ট মাঝরাতে হোটেলে ঢুকে পড়লেন। আর একটা দলের সঙ্গে। রাত দুটোতে এক অনুষ্ঠান শুরু হবে। অনুষ্ঠানটা শেষ হল। রবার্ট বুঝতে পারলেন, এবার তাকে মনটি কালোতে আসতে হবে। একটা ছোোটা বারের ভেতর।

.

বাইশ নম্বর দিন, প্যারিস, ফ্রান্স।

সকালের কাগজেই সংবাদটা বেরিয়েছে। সকাল পাঁচটা কয়েক মিনিট আগে রবার্ট নিউজপেপার স্ট্যান্ডের কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেন। লাল রঙের একটা ট্রাক আসছে। একটা ছেলে একবাণ্ডিল কাগজ ফেলে দিয়েছে। রবার্ট কাগজটা তুললেন। হা, বিজ্ঞাপন আছে, কিন্তু এখনও অপেক্ষা করা।

দুপুর হয়েছে। রবার্ট একটা দোকানের ভেতর ঢুকে বসলেন। এখানে বোর্ডের ওপর ব্যক্তিগত খবর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। কতরকম সংবাদ।

লিপোকে পাওয়া গেল, মেসেজটা ওখানে ছিল। ..

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, সুমের অ্যাপার্টমেন্টে দেখা হবে, লীর গার্লফ্রেন্ড।

আধঘণ্টার মধ্যে রবার্ট সেখানে পৌঁছে যাবেন।

.

অ্যাপার্টমেন্টটা রুয়েতে অবস্থিত। প্যারিসের উপকণ্ঠে। রবার্ট যখন সেখানে পৌঁছোলেন, আকাশে বৃষ্টি ঝরা মেঘের চাউনি। বজ্রপাতের শব্দ শোনা গেল। উনি লবিতে ঢুকে পড়লেন। ডোরবেলে হাত দিলেন, লিপো দরজা খুলে দিয়েছেন।

লিপো বললেন তাড়াতাড়ি ভেতরে এসো।

দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। একই রকম আছেন ওই ভদ্রলোক। লম্বা এবং পাতলা। যার বয়স কখনও বাড়ে না।

দুজন হাতে হাত দিলেন- আপনি কি জানেন, আমার ভাগ্যে কী ঘটেছে?

বসো, বসো বাবা, এত চিন্তা করছ কেন?

রবার্ট বসলেন।

তিনি তাকালেন- অপারেশন ডুমস ডে-র নাম শুনেছ?

না, উড়ান চাকির সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?

উড়ন চাকির সঙ্গেই এর সম্পর্ক আছে। সারা পৃথিবী জুড়ে এখন এই অপারেশন ছড়িয়ে পড়েছে, রবার্ট।

লিপো বলতে শুরু করেছেন অন্য গ্রহের মানুষেরা পৃথিবী জয় করার জন্য মরিয়া। তিনবছর আগে বিশ্বের সমস্ত শিল্পকে কবজা করতে চেয়েছিল। এমন কি তারা বলেছিল যে, পরমাণু শক্তিকেন্দ্রগুলি উড়িয়ে দেবে। এমন কি তারা জ্বালানি ধ্বংস করতে দেবে না।

রবার্ট অবাক হয়ে শুনছেন, তিনি হাঁ, হয়ে গেছেন।

তারা পেট্রোল, কেমিক্যাল, রবার, প্ল্যাস্টিক সব কিছুর ওপর দখলদারি কায়েম করতে চেয়েছিল। সারা পৃথিবীতে অন্তত এক হাজার ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যেত। অটোমোবাইল আর তৈরি হত না। কী হত বলো তো? পৃথিবীর অর্থনীতি ভেঙে পড়ত।

–তারা এমন কেন করছে?

–তারা বলছে, আমরা নাকি গোটা বিশ্বকে দূষিত করে তুলেছি। পৃথিবীতে ধ্বংস করছি। সাগরকে বিষিয়ে দিচ্ছি। তারা এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেয়েছিল।

–লী?

-সেই জন্য অন্তত বারোটি দেশের শক্তিশালী মানুষেরা একসঙ্গে বৈঠকে বসে। এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, রাশিয়া, চিন সবদেশের শিল্পপতিরা ছিলেন। একজন মানুষের

ছদ্মনাম হল জানুস। তিনি বিভিন্ন দেশের ইনটেলিজেন্স সংস্থাগুলিকে এক করেছিলেন। শুরু হল অপারেশন ডুমস ডে। ওই ভিনগ্রহের বাসিন্দাদের আগ্রাসন বন্ধ করার জন্য।

উনি রবার্টের দিকে তাকিয়ে বললেন- তুমি এস. ডি. ও. আই. নাম শুনেছ?

-হ্যাঁ, স্টার ওয়ার, নক্ষত্র যুদ্ধ। সোভিয়েত ইন্টার কনটিনেন্টাল ব্যালাস্টিক মিশাইল। তাই তো?

লী মাথা নাড়লেন না, এটা ওপরে বলা হয়। এস ডি ওয়াইকে তৈরি করা হয়েছে। রাশিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য নয়। ইউ এফ ও দেখলেই গুলি করে নামাতে হবে। এভাবেই হয়তো ওদের আগ্রাসন বন্ধ করা যায়।

রবার্ট অবাক হয়ে গেছেন। সমস্ত শরীরে বিরাজ করছে একটা অদ্ভুত নিরাপত্তা সত্তা। লিপো যে কথাগুলো বলছেন, সেগুলো উপলব্ধি করার চেষ্টা করছেন। বাইরে বাজের শব্দ।

তার মানে, আপনি বলছেন, সরকার সাহায্য করছে?

-হ্যাঁ, প্রত্যেক সরকারের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। অপারেশন ডুমস ডে-কে যদিও ব্যক্তিগতভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে, কিন্তু এর অন্তরালে সরকারের মদত আছে, আশা করি তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

হায় ঈশ্বর, সরকার ব্যাপারটা সম্পর্কে অবহিত নয়? উনি লীর দিকে তাকালেন–আপনি কী করে এ ব্যাপার জানলেন?

লী হাসলেন। এর অর্থটা বুঝতে পারলে না? আমি হলাম ওই অপারেশনের চিনা প্রতিনিধি।

রবার্ট অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন লিপোর দিকে। লীর হাতে একটা ছোট্ট বন্দুক।

লী ট্রিগারটা টিপলেন। একটা শব্দ হল। বাজ পড়েছে বুঝি। দেখা গেল, এক টুকরো আগুন। জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছে।

.

৫০.

বৃষ্টি-বৃষ্টি- শুধু বৃষ্টি। তার ঘুম পেয়েছে। সে একটা পার্কের বেঞ্চের ওপর শুয়ে আছে। নড়তে চড়তে পারছে না। গত দু-দিন ধরে সে ভেবেছে, আমি আবার জীবনের মধ্যে ফিরে এসেছি। না, এই গ্রহে থাকলে আমি আর বাঁচব না। এটা বোধহয় আমার শেষ ঘুম। তারপর বৃষ্টি এল। সেই ঈশ্বরের আশীবাদপূর্ণ বৃষ্টি। সে বিশ্বাস করতে পারেনি, সে মাথা তুলল। আকাশের দিকে তাকাল। বৃষ্টিকণা শান্ত শীতল, তাকে আরও সিক্তা করছে। সে দাঁড়িয়ে থাকল, হাত দুটো আকাশের দিকে তুলে দিল। বৃষ্টি এসে আমার শরীরের প্রত্যেকটি কোশকে সিঞ্চিত করবে। আমাকে জীবনের উন্মাদনায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। সমস্ত শরীরে আমি জলকণা ভরে রাখব। আমি আমার অস্তিত্বকে আবার খুঁজে

পাব। আমার উদ্বিগ্নতা হারিয়ে যাবে। সে ভাবল, আমি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠব। হ্যাঁ, আমি এখন সবকিছু করতে পারি। সে একটা ছোট্ট ট্রানমিটার হাতে নিল। চোখ বন্ধ করল। এবার তাকে কাজ করতে হবে।

রবার্টের জীবন

৫১.

রবার্টের জীবন বেঁচে গেল। যে মুহূর্তে লিপো ট্রিগারে হাত দিয়েছিলেন, আলোর বিচ্ছুরণ, এক মুহূর্তের জন্য। রবার্ট সরে গেলেন। বুলেটটা তার ডান হাতে লাগল। না, মুখে লাগেনি।

লী আবার বন্দুকটা তুলেছেন, আবার আঘাত হানতে হবে। রবার্ট আঘাত করলেন, বন্দুকটা লী-র হাত থেকে ছিটকে পড়ল। লী, রবার্টের সঙ্গে লড়বার চেষ্টা করলেন। না, রবার্টের যন্ত্রণা হচ্ছে। তার জ্যাকেট রক্তে ভিজে গেছে। তিনি সামনের দিকে ঘুষি মারলেন। লীর মুখে যন্ত্রণার ছাপ। হ্যাঁ, এবার লোকটাকে মেরে ফেলতে হবে। রবার্ট বারবার ঘুষি মারতে থাকলেন। একে অন্যকে আঘাত করার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। কেউ ঠিকমতো সুযোগ পাচ্ছেন না।

না, কে এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জিতবেন?

সময় বোধহয় লী-কে সাহায্য করেছিল। রবার্ট ভাবলেন, তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে লীকে লাথি মারলেন। লীও বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। রবার্ট নিজেকে সরিয়ে দিলেন। জোর মারামারি শুরু হয়ে গেছে।

লী সামনের দিকে তেড়ে এসেছেন। তারপর? দুজন গ্লাস টেবিলের কাছে পৌঁছে গেছেন। রবার্ট মাটিতে পড়ে গেলেন। নড়তে চড়তে পারছেন না। রবার্ট ভাবলেন, ওরা

জিতে গেছে, আমি হেরে গেছি। চেতনা হারাচ্ছি। লী এবার খেলাটা শেষ করবেন। নাঃ, কিছু ঘটল না। রবার্ট মাথা তুললেন। লী পাশে শুয়ে আছেন। চোখ দুটো খোলা, সিলিং-এর দিকে তাকানো, কাঁচের টুকরো ঢুকে গেছে তার বুকের মধ্যে।

রবার্ট বসে থাকার চেষ্টা করলেন। অসম্ভব যন্ত্রণা। এক্ষুনি একজন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। একটা নাম মনে পড়ল এজেন্সি নামটার কথা বারবার বলত, আমেরিকান হসপিটাল, হিলসিনজার লিয়ন হিলসিনজার।

ডাঃ হিলসিনজার এবার বাড়ি যাবেন। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। নার্স চলে গেছে। উনি ফোনটা তুললেন- ডাঃ হিলসিনজার বলছি।

–আমি রবার্ট বেলামি, আপনার সাহায্য চাইছি। ভীষণ আঘাত পেয়েছি আমি। আপনি কি সাহায্য করবেন?

–আপনি কোথায়?

–আমি আধঘন্টার মধ্যে আমেরিকান হাসপাতালে আসছি।

–আমি পৌঁছে যাব, এমারজেনসি রুমে চলে যাবেন।

–ডাক্তার, এই ফোনের কথা কাউকে বলবেন না।

আমি কথা রাখার চেষ্টা করব।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

ডাক্তার হিলসিনজার একটা নাম্বারে ফোন করলেন।

কমান্ডার বেলামির কাছ থেকে একটা ফোন এসেছে। আমি আধঘন্টার মধ্যে আমেরিকান হাসপাতালে পৌঁছে যাব।

ধন্যবাদ ডাক্তার।

ডাক্তার হিলসিনজার রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। রিসেপশন দরজা খুলে গেল। রবার্ট বেলামি দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে একটা বন্দুক।

রবার্ট বললেন– ভাবলাম, এখানেই আমার চিকিৎসা হলে ভালো হয়।

ডাক্তার অবাক হয়ে গেছেন, উনি বললেন- আপনার তো হাসপাতালে যাবার দরকার ছিল। •

হা, হাসপাতালটা মর্গের খুব কাছাকাছি, তাই না?

ডাঃ হিলসিনজার বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। বললেন- ঠিক আছে, আমি আপনাকে ঘুমের ওষুধই দেব।

না, চালাকি করার চেষ্টা করবেন না। বাঁ হাতে বন্দুকটা ধরা। যদি আমি এখান থেকে বেঁচে বেরোতে না পারি, তাহলে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখব না।

...তাহলে এখনই কাজ শুরু করুন।

হিলসিনজার পাশের ঘরে রবার্টকে নিয়ে গেলেন। এখানে বিভিন্ন ওষুধপত্র আছে। রবার্ট জ্যাকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে রেখেছেন, বন্দুকটা এখন হাতে ধরা আছে। হিলসিনজার হাতে একটা যন্ত্র নিয়েছেন। রবার্টের আঙুল ট্রিগারে চাপা।

হিলসিনজার বললেন- আমি শার্টটা কেটে ফেলব।

-হ্যাঁ, আঘাতটা টাটকা। বুলেটটা এখনও ওখানে আছে।

হিলসিনজার বললেন আমি আপনাকে ঘুমের ওষুধ দেব।

-না, এক্ষুনি এটা বার করে দিন।

ডাক্তার পাশের ঘরে চলে গেলেন। একটা কাচি তিনি নিয়ে এসেছেন। রবার্ট ঘুমের সঙ্গে লড়াই করার চেষ্টা করছেন। চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। আঃ, ডাঃ হিলসিনজার দাঁড়িয়ে আছেন।

উনি ফরসেপটা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। রবার্ট চিৎকার করছেন। আলো জ্বলে উঠল চোখের সামনে। না, আর বোধহয় বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

-ওটা বেরিয়ে এসেছে। ডাক্তার হিলসিনজার বললেন।

রবার্ট দাঁড়িয়ে আছেন, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছেন।

ডাক্তার হিলসিনজার বললেন- আপনি ঠিক আছেন?

রবার্ট তার হারানো কণ্ঠস্বর ফিরে পেয়েছেন- হ্যাঁ, ব্যান্ডেজটা বেঁধে দিন।

ডাক্তার পার-অক্সাইড ঢুকিয়ে দিলেন। রবার্ট দাঁড়িয়ে আছেন। দাঁতে দাঁত চেপে। আঃ, ডাক্তার ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন।

–আমার জ্যাকেটটা ফেরত দিন।

–আপনি এখান থেকে যেতে পারবেন না।

–আমার জ্যাকেটটা ফেরত দিন। কণ্ঠস্বর ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে।

অনেকটা রক্ত পড়ে গেছে, এখান থেকে গেলে আপনি বাঁচবেন না।

রবার্ট জানেন, ওখানে থাকলে আরও ক্ষতি হবে। পা দুটো থরথর করে কাঁপছে। টেবিলের একধারে পড়ে গেলেন।

ডাক্তার হিলসিনজার আবার বললেন- ওঠার চেষ্টা করবেন না।

রবার্টের চোখের সামনে সব কিছু ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। আমাকে যেতেই হবে।

উনি জানেন, চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার হিলসিনজার আবার ফোন করবেন। রবার্টের চোখে একটা সার্জিক্যাল টেপ পড়ে গেল। হিলসিনজার এটা ব্যবহার করেছিলেন।

চেয়ারে বসুন।

–কেন?

রবার্ট তাঁর বন্দুকটা তুললেন, বসুন।

হিলসিনজার বসলেন। রবার্ট টেপটা খুললেন। আঃ, এখন এই অস্ত্রটাই হাতে আছে আমার। সেটা মস্ত বড়ো হয়ে গেছে। তিনি হিলসিনজারের কাছে গেলেন চুপচাপ বসে থাকুন। আমি কোনো ক্ষতি করব না।

টেপ দিয়ে ডাক্তারের হাত দুটো বাঁধলেন, চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে দিলেন।

–এটা কি সত্যি দরকার ছিল? আমি কিছুই করতাম না।

চুপ করে বসে থাকুন।

ডাক্তারের দিকে তাকালেন, মনে হল, এবার বোধহয় উনি অজ্ঞান হয়ে যাবেন।

.

মহাশূন্যে যেন ভেসে চলেছেন, মেঘের রাজত্বে। কে যেন বলল- জেগে ওঠো, জেগে ওঠো। কে বলল? জ্যাকেটের পকেটে কিছু একটা রয়েছে। চোখ দুটো বন্ধ, টিস্টাল, ঘুম থেকে আবার জাগরণ।

রবার্ট? এক মহিলার কণ্ঠস্বর। শান্ত এবং সৌন্দর্যে ভরা।

রবার্ট এখন একটা শান্ত সবুজ উদ্যানে একা। বাতাসে সংগীতের শব্দ। উজ্জ্বল আলোর নিশানা চারদিকে। এক মহিলা তার সঙ্গে উড়ে চলেছে। লম্বা এবং আকর্ষণীয়া। মুখখানা গোল। অপূর্ব গায়ের রং। তুষার সাদা গাউন তার পরনে। কণ্ঠস্বরে মাদকতা আছে।

-রবার্ট, তোমাকে আর কেউ কোনোদিন আঘাত করতে পারবে না। তুমি এসো, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি।

রবার্ট চোখ খুললেন। অনেকক্ষণ সেখানে বসে ছিলেন। হঠাৎ মনের ভেতর উত্তেজনা, হ্যাঁ, একাদশ প্রত্যক্ষদর্শী? বোঝা গেছে। কোথায় গেলে তার সঙ্গে দেখা হবে।

.

৫২.

তেইশ নম্বর দিন, প্যারিস, ফ্রান্স। অ্যা

ডমিরাল হুইট্যাকারকে ফোন করা হল। ডাক্তারের অফিস থেকে।

–অ্যাডমিরাল, আমি রবার্ট বলছি।

কী হচ্ছে, রবার্ট?

–আপনি কি জানুসের নাম শুনেছেন?

অ্যাডমিরাল হুইট্যাকার বললেন কেন? না, শুনিনি।

রবার্ট বললেন তিনি হলেন এক সিক্রেট সংস্থার প্রধান। সাধারণ মানুষকে হত্যা করাটাই তার কাজ। তিনি এখন আমাকে হত্যা করতে চাইছেন। তাকে থামাতেই হবে।

কীভাবে তোমাকে সাহায্য করব?

–প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বসতে হবে। আপনি কি একটা মিটিং-এর ব্যবস্থা করতে পারবেন?

কিছুক্ষণ নীরবতা।

–আমি ঠিক জানি না। চেষ্টা করতে পারি।

–জেনারেল হিলিয়াড এই ব্যাপারে যুক্ত আছেন।

–কীভাবে?

–আরও অনেকে যুক্ত আছেন। ইউরোপের প্রায় সব কটি দেশের ইনটেলিজেন্স সংস্থা একসঙ্গে হাত মিলিয়েছে। আমি বেশি কথা বলতে পারছি না। শুধু হিলিয়াডকে বলবেন, আমি এগারো নম্বর প্রত্যক্ষদর্শীর সন্ধান পেয়েছি।

কীসের এগারো নম্বর প্রত্যক্ষদর্শী?

–অ্যাডমিরাল, আর বেশি কিছু বলতে পারছি না। হিলিয়াড ব্যাপারটা জানেন। তিনি যেন আমার সঙ্গে সুইজারল্যান্ডে আসেন।

সুইজারল্যান্ড?

একমাত্র আমিই এগারো নম্বর প্রত্যক্ষদর্শীর সন্ধান পেয়েছি। উনি যদি কথা না শোনেন, তা হলে গোলমাল হয়ে যাবে। আমি জুরিখে যাচ্ছি, তার জন্য অপেক্ষা করব। বলবেন, জানুস যেন সুইজারল্যান্ডে আসেন। নিজে।

রবার্ট, তুমি কী করছ, বুঝতে পারছ তার পরিণতি কী হবে?

-হা, আমি দুটো বিষয়ে বলতে চাইছি, দুটো শর্ত, আমাকে সুইজারল্যান্ডে নিরাপদে পৌঁছোতে হবে। জেনারেল হিলিয়াড এবং জানুস যেন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আর একটা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলব।

রবার্ট, আমি সবরকমভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করব। কীভাবে তোমার সঙ্গে দেখা করব?

–আমি আপনাকে ফোন করব?

কতক্ষণ সময় লাগবে?

–এক ঘণ্টা, ঠিক আছে?

রবার্ট?

–হ্যাঁ, ঠিক আছে। মনে রাখবেন, আমি এখনও বেঁচে আছি। আমাকে আর দুঃখ দেবেন না!

.

এক ঘণ্টা কেটে গেছে। রবার্ট আবার অ্যাডমিরাল হুইট্যাকারের সঙ্গে কথা বললেন।

জেনারেল হিলিয়াডকে মনে হল, এই খবর শুনে খুব ভয় পেয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, তোমার কোনো ক্ষতি করা হবে না। তোমার শর্তগুলো মেনে নেওয়া হবে। তিনি জুরিখের দিকে উড়ে চলেছেন। কাল সকালে পৌঁছে যাবেন।

জানুস?

জানুস একই প্লেনে থাকবেন।

রবার্টের মনে শান্তি–ঠিক আছে, অ্যাডমিরাল। আর প্রেসিডেন্ট?

–আমি নিজে কথা বলেছি, তুমি কোথায় তার সঙ্গে কথা বলবে?

–হায় ঈশ্বর। ধন্যবাদ।

–জেনারেল হিলিয়াডের একটা প্লেন আছে সেটা তোমাকে উড়িয়ে আনবে?

না, আমি প্যারিসে আছি, আমার একটা গাড়ি চাই। আমি নিজেই চালাব। আমি হোটেল লিটারেতে আছি।

–আমি দেখছি, কী করা যায়?

.

রাস্তার ধারে রবার্ট হাঁটছেন। হোটেলের দিকে এগিয়ে গেলেন। একটা কালো মার্সিডেজ সেডান গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে কেউ নেই। সাদা কালো পুলিশ কার তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ইউনিফর্ম পরা পুলিশম্যান হুইলের ধারে বসে আছেন। দুজন সাদা পোশাক পরা পুলিশ। রবার্ট এলেন। ফরাসি সিক্রেট সার্ভিসের লোক। রবার্টের মনে হল, আবার কোনো সমস্যা দেখা দেবে নাকি? আমি কি আবার ফাঁদে পড়ে গেলাম? একটাই মাত্র বাঁচার রাস্তা আছে। এগারো নম্বর প্রত্যক্ষদর্শী, হিলিয়াড কি বিশ্বাস করবেন? এটাই কি যথেষ্ট।

উনি সেডানের দিকে এগিয়ে গেলেন। তার দিকে তাকিয়ে আছে সব কিছু।

রবার্ট ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসলেন। ভেতর দিকে তাকালেন– হ্যাঁ, চাবি আছে।

ড্রাইভারের সিটের দিকে তাকালেন কে? জেনারেল হিলিয়াড কি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন? নাকি অ্যাডমিরাল হুইট্যাকার? এখন একটা ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটবে।

উনি চাবিটা ঘোরালেন। ইনজিনটা প্রাণ পেয়েছে। হ্যাঁ, সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ওরা কেউ বাধা দিচ্ছে না। রবার্ট আরও সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। পুলিশের একটা গাড়ি সামনে এল। না, থামানো হল না। লাল আলো জ্বেলে গাড়িটা চলে গেল। মনে হচ্ছে সব ট্রাফিক বোধহয় গলে যাবে। না, শেষ পর্যন্ত ওরা আমায় বিশ্বাস করেছেন।

মাথায় হেলিকপ্টারের শব্দ। রবার্ট তাকিয়ে দেখলেন। লেখা আছে ফ্রেঞ্চ ন্যাশনাল পুলিশ। হিলিয়াডকে দেখা গেল। তিনি কি সুইজারল্যান্ডে এসে গেছেন? আমার শেষ প্রত্যক্ষদর্শী!

.

রবার্ট বিকেল চারটের সময় সুইজ সীমান্তে পৌঁছে গেলেন। ফরাসি পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। ওদিকে সুইজ পুলিশের গাড়ি। কোনো অসুবিধা হল না। রবার্ট এগিয়ে চলেছেন। ধন্যবাদ অ্যাডমিরাল হুইট্যাকার, শেষ অব্দি আমি বাঁচার একটা পথ পেয়েছি। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে হবে। জেনারেল হিলিয়াড বোধহয় এখন আর আমার ক্ষতি করতে পারবেন না। মনে পড়ল, সাদা পোশাক পরা ওই মেয়েটিকে। উনি ওই মেয়েটির কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন।

তাড়াতাড়ি রবার্ট, আমরা সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

আমরা সবাই তার মানে? আরও কেউ? সকলের সাথে যোগাযোগ করতে হবে, রবার্ট ভেবেছিলেন।

.

জুরিখ। রবার্ট ডলডার গ্র্যান্ড হোটেলের সামনে থামলেন। জেনারেলের জন্য একটা নোট লিখলেন।

-জেনারেল হিলিয়াড কি এসেছেন? তার হাতেই এই নোটটা তুলে দেবেন।

বাইরে চলে গেলেন। দুদিকে পুলিশ কার। তিনি ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বললেন, এখন থেকে আমি আমার নিজের ইচ্ছে মতো যাব।

. ড্রাইভার বলল- ঠিক আছে, কমান্ডার।

রবার্ট তাঁর গাড়িতে চড়ে বসলেন- উটেনডরফের দিকে এগিয়ে চলেছেন। ওই উড়ান চাকিটা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। গাড়ি এগিয়ে চলেছে। অনেক দুঃখজনক স্মৃতি মনে পড়ল। অনেকগুলো জীবন অকারণে চলে গেল।

আমি জানুসের মুখ দেখতে চাই। রবার্ট ভাবলেন এবং তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকব।

.

একই রকম সৌন্দর্য, আল্পসের গায়ে কি রক্তের ছিটে লেগেছে? গাড়িটা আরও সামনে দিকে এগিয়ে গেল। এখানেই বেকারম্যান ওই আবহাওয়া বেলুনটা দেখতে পেয়েছিলেন। তখন থেকেই দুঃস্বপ্নের সূত্রপাত হয়।

হাজার হাজার স্মৃতি, কোনটা ছেড়ে কোনটা রবার্ট মনে রাখবেন। বলা হয়েছিল, জেনারেল হিলিয়াডকে সব কথা বলতে হবে।

জেনারেল হিলিয়াডের কথা– সবকটা প্রত্যক্ষদর্শীর অনুসন্ধান করতে হবে। সকলের যাত্রা শুরু হয়েছিল জুরিখ থেকে। বার্ন, লন্ডন, মিউনিখ, রোম, অরভিয়েটো, ওয়াকো, ফোরথ স্মিথ, কিয়েভ, ওয়াশিংটন, বুদাপেস্ট- রক্তের মিছিল শুধু এগিয়ে চলেছে।

মেয়েটি অপেক্ষা করছিলেন। রবার্ট জানতেন, ওনার আসল পরিচয় কী।

রবার্ট, তুমি এসেছ, অনেক ধন্যবাদ, মেয়েটি মনে মনে বললেন।

আমি এসেছি, শেষ পর্যন্ত। কিন্তু, এ যেন অন্য জগত।

রবার্ট বললেন- কিছু লোক আমার ক্ষতি করতে চাইছে। যদি তুমি চলে যাও এখন, তাহলে ভালো হয়।

–আমি যেতে পারব না।

রবার্ট ভাবলেন, বাঁ হাত দিয়ে তার পকেট স্পর্শ করলেন। হ্যাঁ, একটা অদ্ভুত ধাতু, তার মধ্যে ওই ক্রিস্টালটা আছে।

মুখে আলো ধন্যবাদ রবার্ট।

রবার্ট হাতে করে ক্রিস্টালটা তুলে দিলেন।

রবার্ট জানতে চাইলেন– কী হল?

–আমি এখন আমার বন্ধুদের সাথে কথা বলতে পারব? তারা আমাকে সাহায্য করতে আসবেন।

জেনারেল হিলিয়াডের সেই শব্দগুলো মনে পড়ল ওরা এই গোটা গ্রহের ওপর ওদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করবে।

জেনারেল হিলিয়াড কি ঠিক কথা বলেছেন? যদি ভিনগ্রহের বাসিন্দারা সবকিছু দখল করে তা হলে কী হবে? রবার্ট ঘড়ির দিকে তাকালেন। এক্ষুনি জেনারেল হিলিয়াড এবং জানুস আসবেন। রবার্ট ভাবলেন। হ্যাঁ, হেলিকপ্টারের শব্দ শোনা গেল।

বন্ধুরা, তোমরা এসো, তোমরা সকল কিছু ধ্বংস করে দাও।

হেলিকপ্টারটা এসে গেছে।

জানুসের মুখের দিকে তাকাতে হবে একটা অদ্ভুত সম্ভাবনা।

দরজাটা খুলে গেল। সুশান বেরিয়ে আসছেন।

.

আকাশে উড়ছে এই যন্ত্রনটা। সমস্ত আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, এখন তাড়াতাড়ি করতে হবে। দূর থেকে আরও দূরে চলে যাচ্ছে স্বপ্নের পৃথিবী।

.

৫৩.

এক মুহূর্তের জন্য রবার্টের চিন্তাধারা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। হৃদয় হাজার ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। না, এই ঘটনাটা তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। সুশান? সুশান এক মুহূর্ত তাকালেন, রবার্টের দিকে এগিয়ে এলেন। কিন্তু মন্টে বাঙ্কস তার হাতে হাত রেখেছেন।

রবার্ট, চলে যাও, চলে যাও। ওরা তোমায় মেরে ফেলবে।

রবার্ট সামনের দিকে এগিয়ে এলেন–হ্যাঁ, জেনারেল হিলিয়াড আর কর্নেল ফ্রাঙ্ক জনসন হেলিকপ্টার থেকে নামছেন।

জেনারেল হিলিয়াড বললেন–কমান্ডার, আমি এসে গেছি। তিনি রবার্টের দিকে এগিয়ে গেলেন। সাদা পোশাক পরা মেয়েটি, হ্যাঁ, এই বোধহয় এগারো নম্বর প্রত্যক্ষদর্শীর, তাই তো? হ্যাঁ, খেলাটা শেষ হয়ে গেল।

না, বলেছিলেন জানুসকে সঙ্গে আনবেন?

হ্যাঁ, জানুস আপনাকে দেখার জন্য উদগ্রীব।

রবার্ট হেলিকপ্টারের দিকে তাকালেন। অ্যাডমিরাল হুইট্যাকার দাঁড়িয়ে আছেন।

-তুমি আমাকে দেখতে চাইছ, রবার্ট?

রবার্ট বিশ্বাস করতে পারছেন না, একটা লাল ছবি তার চোখের সামনে।

অ্যাডমিরাল সামনের দিকে এগিয়ে এলেন– আপনি কিছুই বুঝতে পারছেন না? আপনি কতগুলো জীবন নিয়ে চিন্তা করছেন। আমরা পৃথিবীকে বাঁচাতে চাইছি। এই পৃথিবীটা আমাদের, বুঝতে পারছেন?

সাদা পোশাক পরা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন- যদি আপনারা যুদ্ধ করতে চান, তৈরি হোন। আমরা আপনাদের হারিয়ে দেব।

উনি রবার্টের দিকে তাকালেন– তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। তোমাকে আমি সন্তানের মতো স্নেহ করতাম। আমি ভেবেছিলাম, তুমি এডওয়ার্ডের জায়গাটা নেবে। তুমি কেন একাজ করলে? তুমি বাড়িতে থাকতে পারতে, বউয়ের সাথে সুখের সংসার।

অনুশোচনার সুর- না, আমার কোনো প্রিয় নোক এই কাজ করবে না।

রবার্ট দাঁড়িয়ে আছেন। কথা বলতে পারছেন না।

–তোমাদের বিয়েটা আমি ভেঙে দিয়েছিলাম। কারণ তোমার ওপর আমার অগাধ আস্থা ছিল।

–আপনি ভেঙেছেন?

হ্যাঁ, মনে আছে? সি আই এ তোমাকে পাঠিয়েছিল ফক্সের অনুসন্ধান করতে। ফক্স বলে কিছু ছিল না। আমি এইভাবে তোমার মন ভাঙতে চেয়েছিলাম।

–এসব আপনার প্রচেষ্টা? আপনি এতগুলো মানুষকে হত্যা করলেন? আপনি কি পাগল?

না, তাদের কেন মেরে ফেলা হয়েছে বলে তো? যাতে তারা আর কোনো গুজব ছড়াতে না পারে। এখন আমরা সম্পূর্ণ তৈরি। আর একটু সময় লাগবে। সেই সময়টা তুমি আমাদের দিয়েছ।

সাদা পোশাক পরা মেয়েটি সবকিছু শুনছিলেন। তিনি কিছুই বললেন না। তার ভাবনা এখন অনেক দুরে বিস্তৃত হয়েছে। এক্ষুনি ওরা আসবে।

আকাশের দিকে সবাই তাকিয়ে দেখলেন। হ্যাঁ, একটা মস্ত বড়ো সাদা মেঘ। ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসছে। তারপর? সমুদ্রে ঝড়, লস এঞ্জেলস, নিউইয়র্ক, টোকিও- হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু। দেখা যাচ্ছে, উজ্জ্বল সূর্য, মৃত পশুর মিছিল।

চিন, দাঙ্গা বেঁধে গেছে, ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ, শুরু হয়েছে পারমাণবিক যুদ্ধ। তারপর মানুষ আবার তার আদিম অবস্থানে ফিরে গেছে।

এটা একটা কল্পনা। দৃশ্যটা হারিয়ে গেল। নীরবতা আর কিছু নেই।

অ্যাডমিরাল হুইট্যাকার বললেন- কী হল? গণ আতঙ্ক। এর কোনো অর্থ আছে কি?

উনি ওই গ্রহান্তরের মানুষের কাছে এগিয়ে এলেন। বললেন– আমি আপনাকে ওয়াশিংটনে নিয়ে যাব। আপনার সম্পর্কে কিছু খবর নিতে হবে। তারপর রবার্টের দিকে তাকালেন।-তুমি শেষ হয়ে গেছে। ফ্রাঙ্ক জনসনকে বললেন- হ্যাঁ, এবার আপনার দায়িত্ব।

কর্নেল জনসন পিস্তলটা বার করে নিলেন। সুশান মন্টের কাছ থেকে সরতে চাইছিলেন। রবার্টের কাছে তিনি যেতে চাইছিলেন। অ্যাডমিরাল চিৎকার করে বললেন- এক্ষুনি ওকে মেরে ফেলল।

কর্নেল জনসন বন্দুকটা তাক করলেন।

তারপর বললেন- অ্যাডমিরাল, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

অ্যাডমিরাল অবাক হয়ে গেছেন–আপনি কী বলছেন? আমি বলছি, ওকে মেরে ফেলতে।

না, আমি আপনার সংস্থায় কেন ঢুকেছি বলুন তো? আমি চেয়েছিলাম যাতে কমান্ডার বেলামিকে হত্যা না করা হয়। তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তিনি রবার্টের দিকে ফিরে বললেন, দুঃখিত, আমি আপনাকে ভুল বুঝেছি।

অ্যাডমিরাল হুইট্যাকারের মুখ লজ্জায় লাল। তা হলে? আপনি ক্ষতি করেছেন? আমাদের সংস্থায়।

–এই সংগঠনের কথা বলে আর লাভ নেই? খেলাটা শেষ হয়ে গেছে, অ্যাডমিরাল।

আকাশে আলো এবং শব্দ। মস্ত বড়ো আকাশ যানটা ধীরে ধীরে নেমে আসছে। তারা সকলে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন। একটির পর একটি। আকাশটা ঢেকে গেছে।

সাদা পোশাক পরা মানুষটি রবার্টের দিকে তাকালেন। হয়তো কিছু বলার ছিল- আমি চলে যাচ্ছি, মেয়েটি বলতে চেয়েছিলেন। উনি অ্যাডমিরাল হুইট্যাকারের দিকে তাকালেন। জেনারেল হিলিয়াড এবং মন্টে বাঙ্কস, আপনারা সবাই আমার সঙ্গে আসুন।

অ্যাডমিরাল হুইট্যাকার বললেন- না, আমি যাব না।

উনি হাত বাড়ালেন। এক মুহূর্ত, তারপর–তিনজন ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠে যচ্ছেন। কে যেন সম্মোহন করছে।

অ্যাডমিরাল চিৎকার করছেন না, আমি যাব না।

আর্তনাদের শব্দ। না, এবার কী হবে?

সুশান রবার্টের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। সত্যি, রবার্ট, তুমি ছাড়া আর কেউ এখানে নেই। হা, সকলে–সকলে চলে গেছে।

সাদা পোশাক পরা মেয়েটি ওই মহাকাশ যানে ঢুকে পড়লেন। আলো জ্বলে উঠেছে। তারপর? মহাকাশযান যাত্রা শুরু করল। তারপর ওই ছোটো জাহাজগুলো সকলের চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেল।

-রবার্ট! সুশান রবার্টের দিকে তাকিয়ে আছেন। সুশানের মুখে হাসি।

এভাবেই হয়তো একটা নতুন গল্প শুরু হল

লেখকের সংযোজনা— এই উপন্যাসটি লেখার সময় বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গে কথা বলেছি। অজানা উড়ন্ত চাকিকে অনেকে দেখেছেন। যাঁরা মহাশূন্যে গেছেন, তারাও দেখেছেন এই মহাকাশযানকে। বিজ্ঞান এখনও এই রহস্যের সমাধান করতে পারেনি। আমরা জানি না, সত্যি সত্যি একদিন গ্রহান্তরের জীব এসে পৃথিবীটা দখল করবে কিনা? অবশ্য এখন থেকে সেই কল্পিত দৃশ্যের কথা ভেবে ভীত সন্ত্রস্ত হবার কোনো কারণ নেই।